মাণিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস

ড. নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরী
প্রাক্তন রিডাব
বীববিক্রম সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়
আগবতলা

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - ৭৯৯০০১

Manikya Shasanadhin Tripurar Itihas
By : Nalini Ranjan Raychoudhury

প্রথম প্রকাশ : 28শে জানুয়ারি 1998
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, 2011
প্রকাশক : দেবানন্দ দাম
জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - 799001
প্রচ্ছদ : অপরেশ পাল
অক্ষর বিন্যাস : স্বপন আড্ডু
মুদ্রণ : এস ডি প্রিন্টার্স
32A পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা - 700 009
কলকাতা অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র
জ্ঞান বিচিত্রা
16 ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা - 700009
ফোন (033) 2360 4981
সার্বিক যোগাযোগ
জ্ঞান বিচিত্রা কার্যালয়
11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা- 799001, ত্রিপুরা
ফোন (0381) 232 3781 / 231 5121 / (033) 2360 4981

ISBN : 81-86792-64-3

একশো কুড়ি টাকা

যাঁরা ইতিহাস পড়েন, পড়ান, গবেষণা করেন,
ভালবাসেন ইতিহাসকে— তাঁদের উদ্দেশে

নিবেদন

'মাণিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস' আমার পূর্বলিখিত 'Tripura through the Ages' নামক ইংরাজিতে লেখা বইটির কিছুটা অনুবাদ ও কিছুটা বর্তমান ত্রিপুরার বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রি-বার্ষিক বি. এ. পাশ ও অনার্স-এর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধিত করে লেখা হয়েছে। অবশ্য পাঠ্যসূচীর ওপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের কথাও মনে রাখতে হয়েছে।....আমার লেখা ত্রিপুরার ইতিহাস বইটি ত্রিপুরায় আধুনিককালে প্রথম বলে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং অনেকেই গবেষণায় তাকে কাজে লাগিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন।....তাই আমি চাই একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও ছাত্রদের উপযোগী বই লিখতে যা আমার পরিচিতিকে আরো প্রকাশ করবে।.....

নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরী

সম্পাদকের নিকট লেখা ওপরের চিঠিটি আমার স্বামী স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরী। আমার স্বামীর অকালমৃত্যুর পর তাঁর একান্ত ইচ্ছা ও আমাদের শুভানুধ্যায়ীদের অনুপ্রেরণায় প্রায় সম্পূর্ণ 'মাণিক্য-শাসনাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস' বইটি প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই ইতিহাসের অধ্যাপক ও বর্তমানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. দীপককুমার চৌধুরীকে। তিনি মূল পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন এবং বইটির জন্য একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। ড. অমিতাভ দেবরায়, অধ্যাপক শঙ্কর বসু, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রকাশচিত্ত নন্দী, ড. তুষাকান্তি পাল, অধ্যাপিকা জয়শ্রী দেবরায়, অধ্যাপিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্য এবং ড. মণিকা নন্দীর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। এঁদের সুপরামর্শ, আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন এই বই প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ড. মণিকা নন্দী বইটির উপযোগী একটি ত্রিপুরার মানচিত্র এঁকে দিয়েছেন। অধ্যাপক শঙ্কর বসু এবং অধ্যাপিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্য প্রুফ সংশোধনের কাজে সাহায্য করেছেন। বইটি পাঠক ও ছাত্রছাত্রীদের উপকারে এলে আমার স্বামীর পরিশ্রম এবং আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস সার্থক হবে।

পরিশেষে, জ্ঞান বিচিত্রা-র কর্ণধার শ্রীদেবানন্দ দাম ও ঐ সংস্থার সকলকে বইটি প্রকাশের পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নিবেদিকা—

মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী

প্রাক্‌কথন

প্রয়াত নলিনীরঞ্জন রায় চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ১৯৬৮ সালে। ইতিহাস আমার বিষয় হওয়ায় আমি ওঁর বিভাগীয় সহকর্মী হই। প্রথম দর্শনেই এই সদালাপী মানুষটি আমাকে আকর্ষণ করেন। তারপর ধীরে ধীরে সেই আলাপ গাঢ়তর হয়েছে। বিষয়ের ওপর নলিনীবাবুর পাণ্ডিত্য, যুক্তি ও তথ্যনির্ভর বিস্তার এবং বিজ্ঞান মনস্ক আলাপচারিতা ও লেখালেখি আমাকে মুগ্ধ করেছে। গুরু গম্ভীর জটিল প্রাবন্ধিক হওয়ার চেয়ে সরস ও সহজবোধ্য ভঙ্গীতে ইতিহাসকে পরিবেশন করে তিনি শ্রোতা ও পাঠকের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পেরেছেন। ত্রিপুরার ইতিহাসের প্রতি তাঁর আগ্রহ বরাবরই লক্ষ করেছি। ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনায় তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিনির্ভর বক্তব্য সুধী সমাজের প্রশংসা পেয়েছে বারবার। ফলে ত্রিপুরার ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই তাঁর চিন্তা বলয়িত হয়েছে দীর্ঘকাল। এবং তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ত্রিপুরার ইতিহাসের ওপর লেখা তাঁর বহু প্রবন্ধ ও বেশ কিছু বই ছাত্র শিক্ষক গবেষকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর গবেষণার বিষয়ও ছিল ত্রিপুরার ইতিহাসের এক অগ্নিগর্ভ সময়ের ওপর আলোকপাত — "Tribal Uprisings in Tripura in the Second Half of the 19th Century"। ১৯৮১ সালে রবীন্দ্রভারতীবিশ্ব বিদ্যালয় থেকে তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

এর আগেই অবশ্য ত্রিপুরার ইতিহাসের ওপর তাঁর দুটি বই প্রকাশিত হয়েছিল ঃ- ১৯৭১ সালে "A Short History of Tripura" এবং ১৯৭৭ সালে "Tripura Through the Ages"। দ্বিতীয় বইটি ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী এবং গবেষকদের কাছে এত সমাদৃত হয়েছিল যে অচিরেই বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং ১৯৮৩ সালে এটির পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ত্রিপুরার ইতিহাস এই সময় থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের অভাব অনেকটাই দূর হয় "Tripura Through the Ages" প্রকাশিত হওয়ার পর।

তাঁর বর্তমান বই "মাণিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস", তাঁরই কথায় ঃ "Tripura Through the Ages" নামক ইংরেজিতে লেখা বইটির কিছুটা অনুবাদ ও কিছুটা বর্তমান ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রি-বার্ষিক বি. এ. পাশ ও অনার্সের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে লেখা....পাঠ্যসূচীর ওপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের কথাও মনে রাখা হয়েছে।....."

বইটি সম্পূর্ণ করার আগেই নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরীর আকস্মিক প্রয়াণ ঘটে। তাঁর পত্নী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দেবী যখন মূল পাণ্ডুলিপিটি দেখতে দেন তখন দুটি বিষয় বিশেষভাবে চোখে পড়েছিল। প্রথমত, এই বইটি তাঁর ইংরেজিতে লেখা বইটির হুবহু অনুবাদ নয়। বহু নতুন সংযোজন আছে, নতুন ব্যাখ্যাও আছে। অধ্যায়গুলিকেও নতুন করে সাজানো হয়েছে। গবেষকদের কথা মনে রেখে মূল পাণ্ডুলিপিতে পাদটীকাও সংযোজন করা হয়েছিল প্রথম দিকের কয়েকটি অধ্যায়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সব কটি অধ্যায়ে পাদটীকা সুসম্পূর্ণ না থাকায়, কোনোরূপ পাদটীকা ছাড়াই বইটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বইটির মূল সূচীপত্রে স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখ থাকলেও পাণ্ডুলিপিতে এটি পাওয়া যায় নি। এই কারণেই 'ত্রিপুরার প্রত্নতত্ত্ব' অধ্যায়টি থেকে স্থাপত্য শিল্প অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কাজে অগ্রসর হয়েও তিনি বইটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে, তা সত্ত্বেও দশটি অধ্যায় সম্বলিত এই বইটি বাংলা ভাষায় লিখিতত্রিপুরার এক সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় "comprehensive history"। প্রাচীন কাল থেকে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি পর্যন্ত ত্রিপুরার বিবর্তনের এক ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচিত হয়েছে বর্তমান বইটিতে। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের পাশাপাশি দেখানো হয়েছে ত্রিপুরার জন-জাতির সমাজ-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন যাত্রার ইতিহাস। ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে প্রাচীন ও সমকালীন সাহিত্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে মুদ্রা, লিপি প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এবং সরকারি ও বেসরকারি দলিল-পত্র। এরই ফলে নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরীর বর্তমান বইটি "মাণিক্য-শাসনাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস"—হয়ে উঠেছে তথ্য-নিষ্ঠ এক ইতিহাস। পাঠকদের সুবিধার জন্যে বইটিতে সংযোজন করা হয়েছে মাণিক্য বংশীয় রাজাদের একটি বংশ তালিকা, মাণিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরার মানচিত্র এবং গ্রন্থসূচী (যা মূল পাণ্ডুলিপিতেই পাওয়া গেছে)।

বইটির একটি সংক্ষিপ্তসার নলিনীবাবুই লিখে গেছেন। পাঠকদের সুবিধার জন্যে এটিও নীচে দেওয়া হল ঃ

"উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থিত ত্রিপুরা একটি ক্ষুদ্র প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ রাজ্য। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে মাণিক্যবংশীয় রাজারা ত্রিপুরায় সগৌরবে রাজত্ব করে গেছেন। এক সময় বর্তমান ত্রিপুরা ছাড়াও পূর্ববাংলার বেশ কিছুটা অংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরাণ বর্ণিত রাজা যযাতির পুত্র দ্রুহ্যুর বংশধর বলে দাবি করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ত্রিপুরার রাজারা তিপ্রা বা ত্রিপুরি উপজাতি ভুক্ত এবং ভাষাগত দিক থেকে তিব্বতি বর্মীয় বোড়ো

ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে মাণিক্যবংশের সূচনা এবং ভারত স্বাধীন হবার এক বৎসর পরে এর সমাপ্তি। রাজত্বের সূচনা থেকেই মাণিক্য রাজাদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল প্রতিবেশী শক্তিশালী বাংলার সুলতানদের সঙ্গে নিজ রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। বাংলার সুলতান হোসেন শাহের আক্রমণ বারংবার প্রতিহত করে ধন্যমাণিক্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। বিজয়মাণিক্য ঢাকা-বিক্রমপুর পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন। আকবরের সমসাময়িক ছিলেন তিনি। যশোধর মাণিক্যের সময় রাজধানী উদয়পুর মুঘলদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কল্যাণমাণিক্য রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর পুত্র গোবিন্দমাণিক্য স্মরণীয় হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটকে। দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরার সমতল অঞ্চল মুঘলরা স্থায়ী ভাবে জয় করে নেয়। সেই সময় থেকে ত্রিপুরার রাজারা পার্বত্য ত্রিপুরায় স্বাধীন হলেও সমতল ত্রিপুরায় (চাকলা-রোশনাবাদ) জমিদার হিসাবে পরিগণিত হন। এই সময় ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব ঘটেছিল সমসের গাজির। তাঁকে কেউ বলেন 'ডাকাইত', কেউবা বলেন কৃষক বিদ্রোহের নায়ক। কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সময় থেকে সমতল ত্রিপুরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে যায়। অবশ্য পূর্বের মতোই ত্রিপুরার রাজারা পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীন ও সমতল অঞ্চলে জমিদার হিসাবে পরিগণিত হতেন। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের সময় থেকে ত্রিপুরায় আধুনিক যুগের সূচনা হয়। বাংলা সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। ইংরেজদের অনুকরণে প্রশাসন, সমাজ সংস্কার প্রভৃতির যে সূচনা বীরচন্দ্র মাণিক্য করেছিলেন তা তাঁর পুত্র রাধাকিশোরমাণিক্যের আমলে আরো প্রসার লাভ করে। মাণিক্য রাজাদের আমলে বেশ কয়েকটি প্রজা বিদ্রোহও ঘটে গেছে। ১৮৫০ সালের তিপ্রা বিদ্রোহ, ১৮৬০-৬১ সালের কুকি হামলা, ১৮৬৩ সালের জমাতিয়া বিদ্রোহ, ১৯৪২-৪৩ সালের রিয়াং বিদ্রোহ অন্যতম। ত্রিপুরার রাজারা ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুরাগী। অবশ্য বিভিন্ন উপজাতিদের নিজস্ব ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা ছিল আলাদা তবে তা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত।"

আমাদের আশা ত্রিপুরা ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক এবং অন্যদের কাছে "মাণিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস" সমাদৃত হবে এবং বাংলা ভাষায় লেখা ত্রিপুরার ইতিহাস সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তকের যে অভাব এতদিন ছিল, তা অনেকটাই দূর হবে।

কলেজটিলা
আগরতলা
১২ জানুয়ারি, ১৯৯৮

দীপককুমার চৌধুরী
রেজিস্ট্রার
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পূর্বকথা

ত্রিপুরার ইতিহাস রচনার উপাদান

ত্রিপুরার ইতিহাস রচনার উপাদানগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ ও সমসাময়িক অন্যান্য বাংলা সাহিত্য, মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিবরণ, পর্যটক ও দূতদের বিবরণ, মুদ্রা, লেখ ও পুরাকীর্তি সমূহ। এছাড়াও পরবর্তী কালের ত্রিপুরার ইতিহাসের জন্য ইংরেজ লেখকদের রচনা ও সরকারি রিপোর্টগুলি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কিত ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস 'রাজমালা'। পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন সেনের মতে রাজমালা ছয়টি খণ্ডে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজাদের আমলে বাংলা ভাষায় পদ্যে লিখিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ড পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে চন্তাই বা রাজপুরোহিত দুর্লভেন্দ্র এবং পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামে দুজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা রচিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে সেনাপতি রণচতুর নারায়ণের সহায়তায় রচিত হয়। তৃতীয় খণ্ড সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে কোনো এক মন্ত্রীর দ্বারা রচিত হয়। চতুর্থ খণ্ড রচিত হয় জয়দেব উজিরের সহায়তায় বিশ্বাস নারায়ণ দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণমাণিক্যের সময়। কাশীচন্দ্রমাণিক্যের সময় (১৮২৬-২৯ খ্রিঃ) পঞ্চম খণ্ড দুর্গামণি উজির দ্বারা রচিত হয়। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮২৯-৪৯ খ্রিঃ) দুর্গামণি উজির ষষ্ঠ খণ্ডটি রচনা করেন। তিনি সমগ্র রাজমালাকে পরিবর্তিত ও সংশোধন করেন। রাধাকিশোরমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮৯৭-১৯০৯ খ্রিঃ) চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ বাংলায় ছয় খণ্ড রাজমালা রচনা করেন। কালীপ্রসন্ন সেন দুর্গামণি উজিরের ছয় খণ্ড রাজমালার চারখণ্ড সম্পাদনা করেন 'শ্রীরাজমালা' নাম দিয়ে। দুর্গামণি উজিরের সম্পাদিত রাজমালার পূর্বের রামনারায়ণ দেব সম্পাদিত একটি সংক্ষিপ্ত বাংলা রাজমালাও পাওয়া গেছে। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্র থেকে জানা যায় যে 'রাজরত্নাকর' নামে ত্রিপুরা রাজবংশের একটি ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস ধর্মমাণিক্যের রাজত্বের সময় থেকে সঙ্কলিত হতে আরম্ভ হয়। উক্ত 'রাজরত্নাকরে' আর-একটি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রাজমালার

উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই প্রাচীন রাজমালা এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না। ধর্মমাণিক্যের আমলে রচিত প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা রাজমালার পুঁথি কেউ দেখেছেন বলে জানা যায় না। রেভারেন্ড জেমস লং রাজমালার প্রশংসা করে বলেছেন যে রাজমালা চৈতন্যচরিতামৃতের ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের পূর্বে লেখা এবং ত্রিপুরার রাজপরিবারের যথার্থ ইতিহাস। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন রাজমালাকে কল্হনের রাজতরঙ্গিণীর চাইতেও অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই অবশ্য রাজমালার প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিক যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকারেব মতে রাজমালা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর অর্থাৎ সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। রচয়িতার সমসাময়িকালের জন্য গুরুত্ব থাকলেও তার পূর্বের ঘটনাবলী প্রধানত কিংবদন্তী ও কল্পনার উপর আশ্রয় করে রচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজমালা অন্যান্য উপাদান থেকেই যাচাই করে নিতে হবে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বের ইতিহাস সম্পর্কে রাজমালার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য নেই। তাছাড়া রাজমালা প্রধানত ত্রিপুবার রাজাদের কীর্তিকলাপের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। ত্রিপুরার জনসাধারণের আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ রেখাপাত করে নি। কৈলাসচন্দ্র সিংহ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে যে ত্রিপুরার ইতিহাস লিখেছেন তা গদ্যাকারে বাংলাভাষায় লিখিত। এই পুস্তকটিরও নামকরণ দিয়েছেন 'রাজমালা'। দ্বিজ বঙ্গচন্দ্রের 'ত্রিপুরবংশাবলী'তে ত্রিপুরার রাজাদের বংশ তালিকা দেওয়া আছে।

'চম্পক বিজয়' নামক কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা শেখ মহাদ্দি। এই কাব্যগ্রন্থে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বের প্রথমার্দিকের কাহিনী, নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহ ও চম্পকরায়ের কৃতিত্ব বর্ণিত হয়েছে। 'চম্পকবিজয়' গ্রন্থে কয়েকটি দুর্গের নাম পাওয়া যায় যেগুলি অন্যত্র শোনা যায় নি। গ্রন্থটি যেহেতু দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে রচিত হয়েছে সেইহেতু রত্নমাণিক্যের রাজত্বের প্রথম দিকের জন্য—বিশেষ মূল্যবান উপাদান। বাংলা পদ্যে রচিত 'চম্পকবিজয়ের' রচনাকাল ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে।

ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কিত আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'কৃষ্ণমালা' রাজধরমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৭৮৫-১৮০৪ খ্রিঃ) বাংলা পদ্যে রচনা করেন রামগঙ্গা বিশারদ। এই গ্রন্থে কৃষ্ণমাণিক্য (১৭৬০-১৭৮৩ খ্রি) সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। এই গ্রন্থে কৃষ্ণমাণিক্য সম্পর্কে এমন সব ঘটনার উল্লেখ আছে যেগুলি রাজমালায় পাওয়া যায় না।

মনোহর শেখ রচিত 'গাজিনামায়' বর্ণিত হয়েছে সমসের গাজির জীবনকাহিনি। গ্রন্থটির রচনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। মনোহর শেখ সমসের গাজির সমসাময়িক ছিলেন না। তিনি পিতামহের কাছ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এই কাহিনি কাব্যে লিপিবদ্ধ

করেন। বাংলা পদ্যে লিখিত এই গ্রন্থটি তাই ইতিহাসের চাইতে কাহিনী হিসাবেই অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। শ্রীকর নন্দীর মহাভারত ধন্যমাণিক্যের সঙ্গে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি ছুটিখানের সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। শ্রীকর নন্দী ধন্যমাণিক্যের সমসাময়িক কবি ছিলেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনন্দকিশোর শর্মা রচিত 'ববদামঙ্গল' কাব্যে উল্লেখ আছে যে বরদেশ্বরীর কৃপায় প্রতাপ রায় বরদাখাতের জমিদারি লাভ করেছিলেন। রাজমালা থেকে জানা যায় যে প্রতাপ রায় ধন্যমাণিক্যের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচনাগুলিও ত্রিপুরার ইতিহাস রচনায় বিশেষ সাহায্য করে। আকবরের সভাসদ ও ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে ত্রিপুরার সমসাময়িক রাজা বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরার অভিজাতদের উপাধি ছিল নারায়ণ এবং রাজার দুই লক্ষ সৈন্য ও এক সহস্র হস্তি ছিল। তবে অশ্বের সংখ্যা ছিল কম। জাহাঙ্গিরের সেনাপতি মির্জা নাথানের বাহার-ই-স্তান গায়েবি নামক গ্রন্থে জাহাঙ্গিরের সমসাময়িক ত্রিপুরার রাজা যশোধরমাণিক্যের সময়ে মুঘলবাহিনী কর্তৃক ত্রিপুরা অভিযান ও অধিকারের কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে। ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ খাঁ রচিত 'মুক্তুল হোসেন' কাব্যে দেবমাণিক্যের রাজত্বকালে বাংলা ও ত্রিপুরার মধ্যে সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা', 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' নামক দুটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে আজাদ-উল-হসাইনি রচিত 'নৌবহর-ই-মুবিশদকুলিখানি' গ্রন্থ থেকে দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে মুঘলবাহিনীর ত্রিপুরা অভিযানের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। বিদেশি পর্যটক ও দূতদের বিবরণ থেকেও ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কিত উপাদান সংগ্রহ করা যায়। টাভার্নিয়ে নামক এক ফরাসি পর্যটক শাহজাহানেব রাজত্বকালে বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং সেই সময় ত্রিপুরায় ছত্রমাণিক্য রাজত্ব কবছিলেন। তাঁর সঙ্গে ত্রিপুরার দুজন বণিক ঢাকায় এবং একজন বণিকের পাটনায় সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁদের বিবরণের উপর নির্ভর করে টাভার্নিয়ে ত্রিপুরা সম্পর্কে একটি বিবরণ তাঁর ভ্রমণমূলক গ্রন্থে লিখে গেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে সে সময় ত্রিপুরার রাজাদের একটি স্বর্ণখনি ও রেশমের কারখানা ছিল। রালফ ফিচ নামক অপর এক ইউরোপীয় পর্যটক চট্টগ্রাম যাত্রা পথে অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরা পরিদর্শন করেন। সেইসময় আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার যে প্রায় সংঘর্ষ হত তা তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়। আসামের রাজা রুদ্রসিংহ ত্রিপুরার রাজদরবারে ১৭০৯ এবং ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনবার রতনকন্দলী সার্মাকটকী ও অর্জুনদাস বৈরাগী কটকীকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁদের লেখা 'ত্রিপুরা দেশর কথা লেখ' নামক গ্রন্থে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের বিরুদ্ধে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের ষড়যন্ত্র ও হত্যা, ত্রিপুরার রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, ধর্মীয় রীতিনীতি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি অসমিয়া গদ্যভাযায় লিখিত তাঁদের সমসাময়িক ইতিহাসের জন্য গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান।

ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজাদের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির মধ্যে মুদ্রার গুরুত্ব অপরিসীম। ত্রিপুরার রাজারা সিংহাসন আরোহণ ও বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে মুদ্রা প্রচার করতেন। আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলির মধ্যে অধিকাংশই রৌপ্য নির্মিত। স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা কম। তাম্রমুদ্রা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। ত্রিপুরার মুদ্রায় বাংলালিপিতে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তারিখ হিসেবে শকাব্দ ব্যবহার করা হলেও বীরচন্দ্র-মাণিক্যের মুদ্রায় ত্রিপুরাব্দের উল্লেখ আছে। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলির মধ্যে রত্নমাণিক্যের মুদ্রাগুলিই প্রাচীনতম (তারিখযুক্ত মুদ্রা ১৩৮৬ শকাব্দ)। অধিকাংশ মুদ্রায় তারিখ দেওয়া থাকায় রাজাদের সময়কাল নির্ণয়ে মুদ্রাগুলি বিশেষ সাহায্য করে। রাজমালায় উল্লেখ নেই এমন অনেক রাজার নাম মুদ্রা থেকে জানা যায়। উত্তরপূর্ব ভারতের মধ্যযুগের মুদ্রাগুলির মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরার মুদ্রাই বহু নকশা সম্বলিত এবং এগুলিতে রাজার নামের সঙ্গে প্রায় নিয়মিতভাবেই রাজমহিষীর নামও থাকে। রাজ্যাভিষেক, রাজ্যজয়, তীর্থস্নান, তীর্থদর্শন প্রভৃতি উপলক্ষে ত্রিপুরার রাজারা যে সব মুদ্রা প্রচার করেন সেগুলি রাজমালা বর্ণিত রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ঘটনাবলীর সত্যতা নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করে। অনেকগুলি মুদ্রায় দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত থাকায় মুদ্রা প্রচারকারী রাজার ধর্মমত সম্পর্কেও ধারণ করা যায়। মুদ্রাগুলির নির্মাণকৌশলেও ত্রিপুরার রাজাদের শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজাদের ইতিহাস রচনায় মুদ্রার মতো লেখর গুরুত্বও অপরিসীম। বাংলা অক্ষরে সংস্কৃতভাষায় লেখা এই লেখগুলির সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। এগুলি তাম্রপত্র ও প্রস্তর ফলকে লিখিত। লেখগুলি সাধারণত দুই ধরনের— উৎসর্গ ও দানপত্র। উৎসর্গ সম্পর্কিত লেখগুলি প্রধানত মন্দিরগাত্রে ও প্রস্তরফলকে মন্দিরের নামে উৎসর্গ করে খোদিত হয়েছিল। এই লেখগুলিতে উৎসর্গকারী রাজার পরিচয় ও তারিখ দেওয়া থাকত। দানপত্রগুলি প্রধানত ভূমিদান সম্পর্কিত এবং তাম্রপত্রে লেখা। এই দানপত্রগুলি থেকে জানা যায় ত্রিপুরার রাজারা ব্রাহ্মণদের প্রচুর নিষ্কর ভূমিদান করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদেরও ভূমিদান করেছিলেন যা রাজাদের ধর্মসহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। রাজার পরিচয় ছাড়াও ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় জানার জন্যও এই দানপত্র-গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ত্রিপুরার প্রাচীন সভ্যতার মূল্যায়নে পুরাকীর্তির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ার পিলাক অঞ্চলে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে সেখানে একসময় বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। অবশ্য সূর্য ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিও সেখানে পাওয়া গেছে। উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর মহকুমার ঊনকোটি পাহাড়ে খোদিত অসংখ্য মূর্তি ও পৃথক পৃথক পাথরের মূর্তিগুলি সেখানকার ভাস্কর্যশিল্পের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। দেবতামুড়া পাহাড়ে খোদাই করা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি যেন বলতে চায় ত্রিপুরার

অতীত দিনের কথা। মাণিক্য রাজাদের তৈরি ত্রিপুরার বিভিন্ন মন্দিরগুলি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেই কেবল নয়, স্থানীয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ওপরেও অনেক তথ্য সরবরাহ করে।

ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে। 'শ্রীরাজমালা'র সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় বলেছেন "কিরাত দেশের অন্তর্নিবিষ্ট গোমতী নদীর তীরবর্তী ভূভাগ যে অজ্ঞাত কারণেই হউক, ইতিহাসের অগোচর কাল হইতে ত্রিপুরা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।" রাজমালার মতে পরাক্রমশালী রাজা ত্রিপুরের নাম অনুসারে কিরাতদেশের নাম হয় ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরের স্বজাতীয়রা ত্রিপুর নামে পরিচিত হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই ত্রিপুরকে কিংবদন্তীমূলক ও কাল্পনিক বলেছেন। সুতরাং এ যুক্তিটি খুব জোরালো বলে মনে হয় না। কোনো কোনো লেখকের মতে উদয়পুরে অবস্থিত পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর নাম অনুসারে এ রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হয়েছে। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরটি ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল এবং তার এগারো বৎসর পূর্বে ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ এক মুদ্রায় ধন্যমাণিক্য নিজেকে 'ত্রিপুরেন্দ্র' অর্থাৎ ত্রিপুররাজ বলে অভিহিত করেছিলেন। সুতরাং ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ত্রিপুর বা ত্রিপুরা নামটি পরিচিত ছিল এবং দেবীর নাম থেকে এ রাজ্যের নামকরণ ত্রিপুরা হয় নি তা নিশ্চিন্তভাবে বলা চলে। বরং ত্রিপুরা রাজ্যের নাম থেকে দেবীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী হওয়া অসম্ভব নয়। কোনো কোনো লেখকের মতে ত্রিপুরায় মহাদেবের মন্দির ছিল এবং মহাদেব ত্রিপুরেশ্বর বা ত্রিপুরারি নামে পরিচিত। এই ত্রিপুরেশ্বর বা ত্রিপুরারি নাম থেকে এ রাজ্য ত্রিপুরা নামে পরিচিত হয়েছে। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তির পেছনে এ রাজ্যের তিপ্রা ভাষার প্রভাব রয়েছে। তিনি বলেছেন "যে অনার্য কিরাতদিগকে আমরা তিপ্রা (ত্রিপুরা) আখ্যায় পরিচিত করিয়া থাকি তাহাদের জাতীয় ভাষায় জলকে তুই বলে। এই তুই শব্দের সহিত প্রা সংযুক্ত করিয়া তুইপ্রা শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই তুইপ্রা হইতে তিপ্রা এবং তিপ্রা হইতে ক্রমে তৃপুরা, ত্রীপুরা ও ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি।" ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে তিপ্রা বা ত্রিপুরা উপজাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ত্রিপুরা শব্দটি সম্ভবত তিপ্রা নামক উপজাতির সংস্কৃত রূপ। তিপ্রা বা ত্রিপুরা উপজাতির নাম থেকেই এ রাজ্য ত্রিপুরা নামে পরিচিত হয়েছে এই মতই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

প্রাক্‌মাণিক্য যুগে ত্রিপুরার ইতিহাস

মধ্যযুগে মাণিক্যবংশীয় রাজারা ত্রিপুরায় একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু প্রাক্‌মাণিক্য যুগে প্রাচীনকালে ত্রিপুরায় কোনো সুসংবদ্ধ স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল

কিনা জানা যায় না। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরার বেশ কিছুটা অংশ প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববাংলা ও সমতটের বিভিন্ন রাজবংশের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ত্রিপুরা জেলার গুনাইঘর গ্রামে সমতটের গুপ্তবংশীয় রাজা বৈন্যগুপ্তের (৫০৭/৮ খ্রিস্টাব্দ) ভূমিদান বিষয়ক যে তাম্রশাসন পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় এ অঞ্চল সে সময় সমতটের অধীনে ছিল। বৈন্যগুপ্তের পরবর্তী যে সমস্ত সমতটের রাজার নাম পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। এঁদের রাজত্বকাল মোটামুটিভাবে ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ধরা হয়। এঁদের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন পূর্ববাংলার রাজ্য চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মনের আক্রমণে দুর্বল হয়ে যায়। হিউয়েন চুয়াঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সমতটে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্র এই বংশের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর ত্রিপুরা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে সে সময় সুবঙ্গ বা ত্রিপুরা অঞ্চলে নাথ বংশীয় সামন্তরাজারা রাজত্ব করতেন। তাম্রশাসনে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই বংশের লোকনাথ নামে এক সামন্তরাজা অন্যান্য সামন্তদের পরাজিত করেন ও নিজ প্রভুর কর্তৃত্ব ও অস্বীকার করেন। এই তাম্রশাসনে লোকনাথ ছাড়াও জীবধারণ ও জয়তুঙ্গবর্ষ নামে আরো দুজন সামন্ত রাজের নাম পাওয়া যায়। এঁরা সম্ভবত খড়্গ ও রাত বংশীয় রাজা ছিলেন। এই সব রাজবংশ ত্রিপুরা ও তার আশেপাশে রাজত্ব করছিলেন। এঁরা পরমেশ্বর উপাধিধারী কোনো শক্তিশালী রাজার অধীনে থাকলেও কার্যত তাঁরা স্বাধীন ছিলেন। এই 'পরমেশ্বর' কামরূপের রাজা না সমতটের রাজা ছিলেন তা অবশ্য সঠিকভাবে জানা যায় না।

সপ্ত শতাব্দীর শেষার্ধের আশ্রফপুর লিপি থেকেও জানা যায় ত্রিপুরার একটি বড়ো অংশ খড়্গ বংশীয় রাজাদের অধীন ছিল। চারজন খড়্গ বংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ ও রাজরাজভট্ট। দেবখড়্গের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় এঁদের রাজধানী ছিল কর্মান্তবাসক যার সঙ্গে ত্রিপুরা জেলার বড়কামতা নামক স্থানটি অভিন্ন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। চৈনিক বিবরণ থেকে জানা যায় ত্রিপুরা ছাড়াও প্রায় সমগ্র পূর্ব এবং দক্ষিণ বঙ্গ এঁদের অধীনে ছিল। খড়্গ বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। খড়্গবংশ ছাড়াও সে সময় রাত বংশীয় জীবনধারণ ও তাঁর পুত্র শ্রীধারণ ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন। শ্রীধারণ নিজেকে সমতটের রাজা বলে প্রচার করেছেন। দেবপর্বতে এঁদের রাজধানী ছিল। এই দেবপর্বত ক্ষীরদা নদীর তীরে অবস্থিত। ক্ষীরাদ বা ক্ষীরানদী গোমতী নদীর শাখা এবং কুমিল্লার পশ্চিমে অবস্থিত। রাত বংশের পর ভবদেব ও কান্তিদেব নামে দুজন দেব বংশীয় রাজা এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন এঁদের কাছ থেকেই চন্দ্র বংশীয় রাজারা সমতট অধিকার করে নেন।

মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য

পূর্ব কথা

চন্দ্র বংশীয় রাজারা ৮২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এখন পর্যন্ত সাতজন চন্দ্র উপাধিযুক্ত রাজার নাম পাওয়া গেছে। এঁরা হলেন পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লাহায়াচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র ও সুবর্ণচন্দ্র বিশেষ কোনো রাজকীয় উপাধি ধারণ না করলেও ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সময় থেকে চন্দ্র বংশীয় রাজাদের প্রকৃত গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়। ত্রৈলোক্যচন্দ্র মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। চন্দ্র বংশীয় রাজাদের রাজ্য পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গব্যাপী হলেও প্রথম দিকে তাঁদের রাজধানী ছিল রোহিতগিরি অঞ্চলে। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই রোহিতগিরি ও কুমিল্লার লাল মাই অঞ্চল অভিন্ন বলে মনে করেন। পালবংশীয় রাজা প্রথম মহীপালের রাজত্বকালের বাঘউরা নামে বিষ্ণুমূর্তির উপর খোদিত লিপি থেকে জানা যায় ত্রিপুরার একটি অংশ সমতটের অধীন ছিল। প্রথম মহীপাল লাহায়াচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। সম্ভবত লাহায়াচন্দ্রের কাছ থেকে তিনি পূর্ববাংলার কিছুটা অংশ দখল করে নেন। কিন্তু এই অধিকার যে বেশি দিন স্থায়ী হয় নি তা ভারেল্লা গ্রামের মূর্তির লিপি থেকে জানা যায়। শ্রীচন্দ্রের শ্রীহট্ট জেলায় প্রদত্ত তাম্রলিপি থেকে মনে হয় যে শ্রীহট্ট জেলাও চন্দ্রবংশের রাজাদের অধীন ছিল। সুবর্ণচন্দ্রের সময় থেকে এই বংশের রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হন। গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে চোলরাজা রাজেন্দ্রচোল পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেন এবং গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। কালচুরিরাজ কর্ণ পূর্ববাংলা আক্রমণ করলে চন্দ্র বংশীয় রাজাদের পতন ঘটে।

চন্দ্র বংশের বিপর্যয়ের সুযোগে কর্ণের জামাতা ও বজ্রবর্মণের পুত্র জাতবর্মন পূর্ববাংলায় বর্মন বংশের রাজত্বের সূচনা করেন। চন্দ্র বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ হলেও বর্মন রাজারা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিক্রমপুরে এঁদের রাজধানী ছিল। জাতবর্মনের পর তাঁর দুই ভ্রাতা হরিবর্মন ও সমালবর্মন যথাক্রমে রাজত্ব করেন। সমালবর্মনের পুত্র ভোজবর্মন সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের সমসাময়িক ছিলেন। পরাক্রমশালী সেন রাজাদের আক্রমণে বর্মনরাজ্য দুর্বল হয়ে যায়।

বিভিন্ন গ্রন্থে পট্টিকেরা নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পট্টিকেরা ত্রিপুরা জেলার ময়নমতী অঞ্চলে অবস্থিত টিলা ছিল। ব্রহ্মদেশীয় ইতিহাস থেকে জানা যায় ব্রহ্মরাজ অনিরুদ্ধ (১০৪৪-১০৭৭ খ্রিস্টাব্দ) আরাকান আক্রমণ ও জয় করেন। আরাকানের চন্দ্র বংশীয় রাজারা সেখান থেকে বিতাড়িত হলে তাদেরই এক শাখা সম্ভবত পট্টিকেরায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ব্রহ্মদেশের কাব্যে পট্টিকেরা রাজপুত্রের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের রাজকন্যার প্রণয় কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই পট্টিকেরা রাজাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত ছিল। ময়নামতী লিপিতে রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকেল দেব (১২০৩/০৪ খ্রিস্টাব্দ) নামে একজন পট্টিকেরা রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনি পট্টিকেরা রাজবংশীয় না দেব বংশীয় তা অবশ্য বলা সম্ভব নয়। তবে এখানে

উল্লেখযোগ্য এই যে সেন রাজবংশের দুর্বলতার সুযোগে পূর্ববাংলায় দেব বংশীয় রাজারা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং পট্টিকেরা অঞ্চলও এঁদের রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়।

মুসলিম আক্রমণে বিপর্যস্ত সেন রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেব বংশ পূর্ববাংলায় একটি স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তাম্রলিপিগুলি থেকে জানা যায় এঁদের প্রথম রাজা হলেন পুরুষোত্তম এবং এঁর পরবর্তী রাজারা হলেন যথাক্রমে মধুমথনদেব, বাসুদেব, দামোদরদেব ও দশরথ দেব। এঁরা নিজেদের চন্দ্র বংশীয় বলে উল্লেখ করেছেন। এঁদের মদ্যে দামোদরদেব বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। দামদরদেবের তাম্রলিপি থেকে জানা যায় ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম জেলা তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল এবং তাঁর রাজত্বকাল ছিল সম্ভবত ১২৩১-১২৪৩ খ্রিস্টাব্দ। দামোদরদেবের পুত্র দশরথদেব অবিরাজ দনুজমাধব উপাধি গ্রহণ করেন। ত্রিপুরা জেলার পাকামোড়া অঞ্চলে তাঁর একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। ইনিই জিয়াউদ্দিন বারনি বর্ণিত সোনারগাঁও এর রাজা দনুজরায় বলে অনেকে মনে করেন। এই দেববংশীয় রাজারা হিন্দুধর্মাবলমম্বী ও বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।

সুতরাং দেখা যায় যে প্রাচীনকালে ত্রিপুরার একটি বড়ো অংশ পূর্ববাংলা ও সমতটের বিভিন্ন পরাক্রমশালী রাজবংশের অধীন ছিল। এই সব রাজবংশের অনেকেরই রাজধানী ছিল ত্রিপুরা অঞ্চলে। এদের অনেকেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং সেই সময় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ত্রিপুরাতেও পরিলক্ষিত হয়। পিলাক সহ দক্ষিণ ত্রিপুরার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে বৌদ্ধসংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল তা সেখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে জানা যায়। ঐ সময়কার কোনো লিপি বা মুদ্রাতে ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীনকালে ত্রিপুরা নামে কোনো রাজ্য বর্তমান ত্রিপুরা অঞ্চলে গড়ে ওঠে নি বলেই মনে হয়। রাজমালাতেও উল্লেখ আছে যে প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থান ছিল বর্তমান কাছাড় সংলগ্ন অঞ্চলে। দেববংশীয় রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে ফা উপাধিধারী ত্রিপুরা উপজাতির দলপতি বা রাজা ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সমতল অঞ্চলেও তারা আধিপত্য বিস্তার করে একটি সুসংবদ্ধ রাজ্য গড়ে তোলে। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা ফা উপাধির পরিবর্তে মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করে এবং তাদের উপজাতির নাম অনুসারে এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য নামে পরিচিত হয়।

ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজাদের আদি পরিচয়

ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচিত ছিলেন। রাজমালায় বলা হয়েছে যে এঁদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন পুরাণ বর্ণিত উত্তর ভারতের বিখ্যাত চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির পুত্র দ্রুহ্যুর বংশধর। দ্রুহ্যু পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে ভারতের পুর্বদিকে

ত্রিবেগে একটি রাজপাট স্থাপন করেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত 'শ্রীরাজমালায়' এই ত্রিবেগের অবস্থান সাগর দ্বীপে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্রুহ্যুর বংশধর দৈত্য কিরাতভূমি অধিকার করে কপিল নদীর তীরে (বর্তমান আসামের নওগাঁও) এক নতুন রাজপাট স্থাপন করেন এবং এই রাজ্যের নামও ত্রিবেগ রাখা হয় শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে দ্রুহ্যুই কপিল নদীর তীবে ত্রিবেগে রাজপাট স্থাপন করেছিলেন। রাজমালায় এই ত্রিবেগ রাজ্যের সীমা এইভাবে দেওয়া আছে। ত্রিবেগ রাজ্যের পূর্বে মেখলী দেশ, উত্তরে তৈড়ঙ্গ নদী, পশ্চিমে বঙ্গদেশ ও দক্ষিণে আচরংনামক রাজ্য। এই বর্ণনা অনুযায়ী দৈত্যের (মতান্তরে দ্রুহ্যুর) ত্রিবেগরাজ্য ছিল কাছাড়া সংলগ্ন কোনো অঞ্চল। দৈত্যের (মতান্তরে দ্রুহ্যুর) পুত্র ত্রিপুর ছিলেন পরাক্রমশালী ও অত্যাচারী রাজা। তিনি নিজ নাম অনুসারে রাজ্যের নাম ত্রিপুরা রাখেন এবং তাঁব স্বজাতীয়রা ত্রিপুরা জাতি হিসাবে পরিচিত হয়। ত্রিপুর শিবের হাতে নিহত হন। ত্রিপুরের মহিষী হীরাবতী শিবের বরে ত্রিলোচন নামে এক পুত্র প্রাপ্ত হন। শিবভক্ত ত্রিলোচন চতুর্দশ দেবতার পূজার প্রচলন করেন। ত্রিলোচন হেড়ম্ব দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। সেই সুবাদে ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দৃক্‌পতি অপুত্রক অবস্থায় মাতামহের মৃত্যু হলে হেড়ম্ব রাজ্যের (বর্তমান কাছাড়) অধিপতি হন। কনিষ্ঠ পুত্র দক্ষিণ পিতৃরাজ্য ত্রিবেগ প্রাপ্ত হন। কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা দৃক্‌পতিদ্বাবা বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ কপিল নদীর তীর থেকে বরবক্র নদীর (বরাক নদী) তীরে রাজপাট স্থানান্তরিত করেন। দক্ষিণের পুত্র ৩য় দক্ষিণ মেখলী (মণিপুর) দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ কবেছিলেন। ৩য় দক্ষিণের এক বংশধব কুমার শিবভক্ত ছিলেন। তিনি মনুনদী তীরস্থ শ্যাম্বল নগবে শিবলিঙ্গ দর্শন করে সেখানেই বাসস্থান নির্মাণ করেন। কুমারের এক বংশধর প্রতীত হেড়ম্বরাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জুরি নদীর তীরস্থ ধর্মনগরে রাজপাট স্থাপন করেন। প্রতীতের এক বংশধর জুঝারুফা লিকারাজাকে পরাজিত করে রাঙ্গামাটি (বর্তমান উদয়পুর) অধিকার করে সেখানেই রাজপাট স্থাপন করেন। বিশালগড়ও তাঁর অধিকারে আসে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনের মতে জুঝারুফা ৫৯০ খ্রিস্টাব্দের ত্রিপুবাব্দের প্রচলন করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর রাজত্বকাল ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হযেছিল। জুঝারুফার পঞ্চম বংশধর ধর্মফা বা দানকুরুফা প্রথমে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে তিনি মিথিলা থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনেন এবং তাঁদের শ্রীহট্ট জেলায় ভূমিদান করেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ হলেন শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি এবং পুরুষোত্তম। কথিত আছে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয ৫১ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে এবং ধর্মফা মিথিলা রাজ বলভদ্রের সমসাময়িক ছিলেন। ছেংথুমফা বা কীর্তিধরের রাজত্বকালে হীরাবন্তখান নামে গৌড়েশ্বরের এক কর্মচারী ত্রিপুরা রাজ্যে লুণ্ঠিত হলে ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর ত্রিপুরারাজের বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ভীতসন্ত্রস্ত ত্রিপুরার রাজা যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক হলে রানি স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে

যেতে সাহস যোগান এবং ত্রিপুরার সৈন্যদের মদ্যমাংস ভোজন করিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে অনুপ্রাণিত করেন। রানি নিজেও হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে ত্রিপুরার সেনাদল জয়লাভ করে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে এই যুদ্ধ ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয় এবং "ইহাই সম্ভবত বাংলার তুর্কীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ইন্দোমোঙ্গলীয়দের প্রথম বিজয়" বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য কোনো আধুনিক ঐতিহাসিক ছেংথুমফা ও মহামাণিক্য একই ব্যক্তি বলে মনে করেন এবং মহামাণিক্যের রাজত্বকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালের (১৫৩১-১৫৬২ খ্রিঃ) পূর্বে বলে মন্তব্য করেছেন।

অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে মাণিক্যবংশীয় রাজারা তিপ্রা বা ত্রিপুরা জাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরার রাজবংশকে তিপ্রা জাতির জ্ঞাতি বলে উল্লেখ করেছেন। হান্টার সাহেবের মতে ত্রিপুরার রাজারা হচ্ছেন তিব্বতি বর্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তিপ্রা জাতিকে ভাষাগত দিক থেকে বোড়ো জাতিভুক্ত বলেছেন। প্রাচীনকালে এই বোড়ো জাতি ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চল জুড়ে বাস করতো। এদেরই বলা হত কিরাত। জাতিতত্ত্বের দিক থেকে তিপ্রা, কাছাড়ি, মেচ, কোচ, গারো প্রভৃতি হল সমগোত্রীয়। এদের মধ্যে তিপ্রা ও কাছাড়ি জাতিদ্বয়ের ভাষা, অবয়ব, আচার আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে মেজর ফিশার তিপ্রা ও কাছাড়িদের একই বংশোদ্ভব বলে মনে করেন। কালক্রমে তিপ্রা ও কাছাড়িরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন স্থানে ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন পার্বত্য জাতির সঙ্গে একত্রে বসবাসের ফলে তিপ্রারা একটি ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়। তিপ্রা ও কাছাড়িরা যে একই বংশসম্ভূত তা রাজমালার বিবরণ থেকেও অনুমান করা যায়। রাজমালাতে বলা হয়েছে যে মাণিক্য রাজাদের পূর্বপুরুষ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র হেড়ম্ব ফা কাছাড়ের রাজা হন এবং কনিষ্ঠপুত্রের বংশধররা বর্তমান ত্রিপুরার রাজা হন। মাণিক্যবংশীয় ত্রিপুরার রাজাদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে শ্রীঅলীন্দ্রলাল ত্রিপুরা তাঁর 'ত্রৈপুর সংহিতা' কাব্যে বলেছেন যে ত্রিপুরিরা আরাকানের স্রুহুং অঞ্চল থেকে এসেছে এবং সেজন্য ত্রিপুরিদের আরাকানবাসীরা স্রুহুং বলে থাকে এবং তাদের রাজাকে বলে স্রুহুং মুংগ। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগের শ্যানবংশীয় রাজাদের একটি শাখা কামরূপের পূর্বাংশে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই রাজবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র হেড়ম্ব ফা বর্তমান কাছাড় রাজ্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র কাছাড়ের উত্তরাংশে দ্বিতীয় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই দ্বিতীয় রাজ্যটিই প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্য। অর্থাৎ ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষরা ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগের শ্যানবংশীয়দের উত্তর পুরুষ এবং কাছাড়ের রাজারা একই বংশসম্ভূত।

মাণিক্য বংশীয় রাজারা ইন্দোমঙ্গোলীয় বা কিরাত ও ভাষাগত দিক থেকে বোড়ো
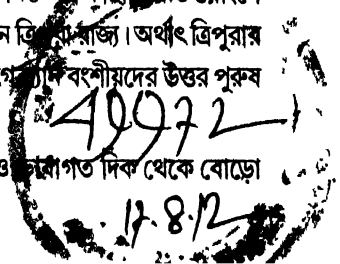
জাতিভুক্ত তিপ্রা বা ত্রিপুরা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁরা চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। ভারতে প্রাচীনকালে শক্তিশালী রাজারা ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও তা সগৌরবে ঘোষণা করতে দ্বিধা করতেন না। রাজপুতানার বহু খ্যাতনামা রাজবংশকে হুন প্রভৃতি বিদেশাগত জাতিভুক্ত হলেও ক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত হয়েছিলেন এবং চন্দ্র ও সূর্য বংশীয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বিদেশাগত গুর্জর প্রতিহাররা নিজেদের অযোধ্যার সূর্য বংশীয় বলে দাবি করতেন এবং দ্রাবিড় চালুক্যরা কখনো সূর্য কখনো চন্দ্রও বংশীয় বলে পরিচিত হতেন। সেদিক থেকে বিচার করলে ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজারাও ছিলেন ক্ষত্রিয় ও চন্দ্র বংশীয়। তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্য ও হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনে বিভিন্ন উপাদান সমূহ

রাজমালা থেকে জানা যায় যে মাণিক্যবংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষরা আসামের মধ্য দিয়ে প্রথমে কাছাড় সন্নিহিত অঞ্চলে ও পরে কৈলাসহর ও ধর্মনগরে রাজপাট স্থাপন করেন। এর পর তাঁরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন এবং ত্রিপুরাতেই স্থিতিশীল হন। ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য উপজাতিদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। মাণিক্যবংশীয় রাজাদের সেই সময় উপাধি ছিল 'ফা'। ত্রিপুরা উপজাতির ফা উপাধিকারী দলপতি বা রাজা পার্বত্য ত্রিপুরার একটি রাজ্য গড়ে তোলার পর ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলে রাজ্য প্রসারিত করতে থাকেন। চতুর্দশ শতকের মধ্যেই প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ তুর্কি মুসলিমদের করতলগত হওয়ায় বহু প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের পতন ঘটেছিল। এই অবস্থায় যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল দেখা দেয় সেই সুযোগে 'ফা' উপাধিকারী ত্রিপুরা উপজাতির দলপতি বা রাজারা পার্বত্যে ত্রিপুরা ছাড়াও সমতল অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। এরফলে তাঁরা সমতল অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পান। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। তাঁরা 'ফা' উপাধির পরিবর্তে 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করেন। ত্রিপুরারাজ্য ব্রহ্মণ্য হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির প্রদান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এক শক্তিশালী রাজতন্ত্রের অধীনে ত্রিপুরা রাজ্য হিন্দুদের এক আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিগণিত হয়।

মাণিক্যবংশীয় রাজাদের নেতৃত্বের ত্রিপুরায় একটি স্থায়ী সুসংবদ্ধ রাজ্য গড়ে ওঠার পশ্চাতে কতগুলি বিশেষ উপাদানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, রাজমালার বিবরণ থেকে জানা যায় ত্রিপুরায় স্থায়ী ভাবে রাজ্য সংগঠনের পূর্বে বিভিন্ন স্থানে মাণিক্যবংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষেরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থাৎ পূর্ব থেকেই তাঁদের রাজ্য স্থাপনের একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। রাজমালার এই বিবরণ কতটা সত্য

তা জানার উপায় নেই। তবে ফা উপাধিধারী দলপতির নেতৃত্বে ত্রিপুরি উপজাতি বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে একটি রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। এর ফলে ত্রিপুরি উপজাতি সুসংবদ্ধ হতে পেরেছিল এবং তাদের দলপতির প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছিল যা দলপতির পক্ষে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য উপজাতির তুলনায় ত্রিপুরি উপজাতি অধিক সুসংবদ্ধ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় অন্যান্য উপজাতিদের তারা নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিল। তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপষমূলক মনোভাব দেখিয়েছিল। শক্তিশালী জমাতিয়াদের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করে এবং দুর্ধষ হালাম উপজাতিকে বিশেষ সামাজিক মর্যাদা দিয়ে তাদের অনুগত প্রজায় পরিণত করেছিল। এর ফলে ত্রিপুরিদের পক্ষে নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রসংগঠন সহজ হয়।

তৃতীয়ত, ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি যেখানে ছিল পর্বতমুখী সেখানে ত্রিপুরি উপজাতি ছিল সমতলমুখী। এর ফলে ত্রিপুরি উপজাতি অন্যান্য উপজাতির তুলনায় সমতলবাসীর সঙ্গে অধিক পরিচিত হবার সুযোগ পায়। সমতলবাসীর আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার সদ্ব্যবহার করেছিল।

চতুর্থত, ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনে অর্থনীতির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। অন্যান্য উপজাতির মত ত্রিপুরি উপজাতিও জুম চাষে অভ্যস্ত ছিল বলে কৃষি উৎপাদনে উন্নত ছিল না। কিন্তু প্রচুর বনজ সম্পদের তারা অধিকারী ছিল এবং সমতলবাসীর সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে তারা এগুলির সদ্‌ব্যবহার করেছিল। বনজ সম্পদ বিক্রয়ের ফলে তারা আর্থিক দিক থেকে লাভবান হয়েছিল যা রাজ্যসংগঠনের সহায়ক হয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্য তাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। টেভার্নিয়ে নামক এক বিদেশি পর্যটক শাহজাহানের রাজত্বকালে বাংলাদেশে এসেছিলেন। ঢাকায় দুজন এবং পাটনায় একজন ত্রিপুরি বণিকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ত্রিপুরার রাজাদের একটি রেশম শিল্পের কারখানাও ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চমত, কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ ত্রিপুরার একটি স্থায়ী রাষ্ট্রগঠনে অর্থনীতির ভূমিকার উল্লেখ করতে গিয়ে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ত্রিপুরার রাজারা সমগ্র রাজ্যের জমির ওপর রাজার ব্যক্তিগত মালিকানা কেবল প্রতিষ্ঠা করেন নি, তাঁরা সমতল অঞ্চলের প্রজাদের জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানাও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্রতিবেশী রাজ্য থেকে বাঙ্গালিদের ত্রিপুরায় বসবাসের সুযোগ করে দিয়ে তাদের জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রদান করেন। সমতল অঞ্চলের অধিবাসীরা হলকর্ষণের দ্বারা জমি চাষ করত বলে জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে

রাজার রাজস্বের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পার্বত্য অঞ্চলের জুমিয়া প্রজাদের কাছ থেকে বনজ সম্পদ কর হিসাবে গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন বনজ সম্পদের বাণিজ্য শুল্ক আদায় করে রাজারা যে সম্পদের অধিকারী হন তার দ্বারা একটি স্থায়ী সংগঠন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং একটি সামরিক বাহিনী গঠন করা সম্ভব হয়েছিল।

ষষ্ঠত, কোনো কোনো ঐতিহাসিক ত্রিপুরার রাজাদের নেতৃত্বে রাষ্ট্র সংগঠনে হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের একটি বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরার রাজারা সমতল অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে সমতল অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাদের আনুগত্য লাভ করা রাজাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তাঁরা সাদরে গ্রহণ এবং পৃষ্ঠপোষকতা করায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তাঁদের রাজ্য সংগঠনে বিশেষ সহায়তা করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ত্রিপুরার রাজাদের পুরাণ বর্ণিত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত করে ত্রিপুরার রাজাদের বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর ফলে অন্যান্য উপজাতি ও হিন্দু প্রজাদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় রাজারা সক্ষম হন।

সপ্তমত, নতুন গড়ে ওঠা রাজ্যের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্যে প্রতিবেশী শক্তিশালী রাজ্যের সহায়তা প্রয়োজন ছিল। প্রথম দিকে সাময়িকভাবে ত্রিপুরার রাজারা হস্তিপ্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী বাংলার সুলতানদের কিছুটা আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। এর বিনিময়ে তাঁরা সুলতানদের কাছ থেকে নতুন রাজ্যের স্বীকৃতি ও সহায়তা লাভ করেছিলেন। বাংলার সুলতানদের সামরিক বাহিনীতে ত্রিপুরার হস্তির প্রয়োজন ছিল। হস্তির বিনিময়ে সুলতানরা ত্রিপুরা রাজাকে করদ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ফলে ত্রিপুরার নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়। রাজমালা থেকে জানা যায় ধর্মমাণিক্য তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রত্নফাকে গৌড়ের সুলতানের দরবারে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিভূ হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। রত্নফা গৌড়ের সুলতানের সৈন্যের সহায়তায় ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করতে সক্ষম হন। সুলতানি সৈন্যের সাহায্যে পার্বত্য ত্রিপুরার বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে সুসংবদ্ধ করেন। সুলতানকে হস্তী ও একটি মূল্যবান রত্ন উপহার দিয়ে তিনি মাণিক্য উপাধিপ্রাপ্ত হন। সাময়িকভাবে সুলতান বা গৌড়েশ্বরের কিছুটা আনুগত্য স্বীকার করে রত্নমাণিক্য লাভ করেছিলেন রাজ্যের নিরাপত্তা। ধন্যমাণিক্যের সময় থেকেই ত্রিপুরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় এবং রাজ্যের আরো বিস্তৃতি ঘটে।

সর্বশেষে বলা যায়, মুসলিম শাসন ও সামরিক পদ্ধতির অনুকরণ করে ত্রিপুরার রাজারা নিজেদের রাজ্যকে আরও সুগঠিত ও শক্তিশালী করে তোলেন। এইভাবেই গড়ে ওঠে ত্রিপুরায় মাণিক্যবংশীয় রাজাদের নেতৃত্বাধীনে এক শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাণিক্য রাজবংশের সূচনা—উপজাতিভিত্তিক গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে উত্তরণ

মাণিক্যবংশীয় রাজারা ত্রিপুরায় এক স্বাধীন সুসংবদ্ধ রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন যার স্থায়িত্বকাল ছিল ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত। কিন্তু এই রাজ্যের সূচনাকাল এবং কীভাবে একটি উপজাতি ভিত্তিক গোষ্ঠীতন্ত্র রাজতন্ত্রে উত্তরণ হয়েছিল তা বর্তমানে সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে রাজমালা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আনুমানিক একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় মাত্র।

রাজমালা থেকে জানা যায় যে মাণিক্যবংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষরা আসামের মধ্য দিয়ে প্রথমে কাছাড় সন্নিহিত অঞ্চলে ও পরে ধর্মনগরে ও কৈলাসহরে রাজপাট স্থাপন করেন। এর পর তাঁরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন ও ত্রিপুরাতেই স্থিতিশীল হন। ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য উপজাতিদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে—আপসমূলক নীতির মাধ্যমে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। মাণিক্যবংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষদের সেই সময় উপাধি ছিল 'ফা'। ত্রিপুরি উপজাতির 'ফা' উপাধিধারী দলপতি বা রাজা পার্বত্য ত্রিপুরায় একটি রাজ্য গড়ে তোলার পর ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলে রাজ্য প্রসারিত করতে থাকেন। চতুর্দশ শতকের মধ্যেই প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ তুর্কি মুসলিমদের করতলগত হওয়ায় বহু প্রাচীন হিন্দু রাজবংশগুলির পতন ঘটে ছিল। এই অবস্থায় যে রাজনৈতিক বিশঙ্খলা দেখা দেয় সেই সুযোগে 'ফা' উপাধিধারী ত্রিপুরা উপজাতির দলপতি বা রাজা শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চল সহ পূর্ববাংলার এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। এর ফলে তাঁরা সমতল অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পান। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে ত্রিপুরার রাজারা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। তাঁরা 'ফা' উপাধির পরিবর্তে 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় ত্রিপুরা রাজ্য ব্রহ্মণ্য হিন্দুধর্মের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং হিন্দুদের ঐক আশ্রয়স্থল হিসাবে পরিগণিত হয়।

ত্রিপুরার কোনো রাজা প্রথম মাণিক্য উপাধি ধারণ করেছিলেন তা স্থির ভাবে বলা

যায় না। তবে রাজমালায় উল্লেখিত একটি তাম্রলেখর উপর ভিত্তি করে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন প্রথম মাণিক্য উপাধিধারী রাজা মহামাণিক্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূভাগ জয় করে নতুন এক রাজ্যের পত্তন করেন। তাঁর পূর্বনাম সম্ভবত ছিল ছেত্তংফা বা ছেংথুমফা। সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে এই ঘটনা ঘটে থাকবে। কারণ মহামাণিক্যের পুত্র ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকাল ত্রিপুরবংশাবলী মতে ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রাজমালা থেকে জানা যায় যে ছেংথুমফা গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে ত্রিপুরার স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য সাময়িকভাবে তাঁরা হস্তি উপঢৌকনের মাধ্যমে বাংলার সুলতানদের কিছুটা আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন বলে মনে হয়। এর বিনিময়ে তাঁরা সুলতানদের কাছ থেকে নতুন রাজ্যের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বাংলার সুলতানদের সামরিক বাহিনীতে ত্রিপুরার হস্তির প্রয়োজন ছিল। রাজমালা থেকে জানা যায় ধর্মমাণিক্য তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রত্নফাকে গৌড়ের সুলতানের দরবারে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিভূ হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। রত্নফা পরবর্তী কালে বাংলার সুলতানের সৈন্যের সহায়তায় পিতার রাজ্য অধিকার করেন এবং সুলতানি সৈন্যের সাহায্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ করেন। সুলতানকে হস্তি ও একটি মূল্যবান রত্ন উপহার দেন। বিনিময়ে সুলতান তাঁকে মাণিক্য উপাধি দেন। এর থেকে মনে হয় রত্নমাণিক্য সাময়িকভাবে সুলতানের কিছুটা আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। ধন্যমাণিক্যের সময় থেকেই ত্রিপুরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় এবং রাজ্যের আরও বিস্তৃতি ঘটে। ত্রিপুরার গৌরবময় যুগের সূচনাও হয় এইসময় থেকে।

অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরায় ত্রিপুরি উপজাতি একটি সুসংবদ্ধ রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছিল, তার কতগুলি কারণ ছিল। প্রথমত, ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতির মধ্যে ত্রিপুরি উপজাতি ছিল অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'ফা' উপাধিধারী দলপতি বা রাজার নেতৃত্বে তারা ছিল অধিক সুসংবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য উপজাতিরা যেখানে ছিল পর্বতমুখী সেখানে ত্রিপুরিরা ছিল সমতলমুখী। এর ফলে ত্রিপুরিরা সমতলবাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায়। সমতল এর আর্থসামাজিক ও রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়। তৃতীয়ত, রাজ্যসংগঠনে অর্থনীতির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। অন্যান্য উপজাতির মতো ত্রিপুরি উপজাতিও জুমচাষে অভ্যস্ত ছিল বলে কৃষি উৎপাদনে উন্নত ছিল না বটে কিন্তু প্রচুর বনজ সম্পদের তারা অধিকারী ছিল এবং সমতলবাসীর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা এগুলির সদ্ব্যবহার করেছিল। বনজ সম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে তাদের যে আর্থিক লাভ হয়েছিল তার দ্বারা তারা একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ও সুসংবদ্ধ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সমতলবাসীরাও তাদের কাছ থেকে বনজ সম্পদ

লাভ করে লাভবান হয়েছিল এবং এর ফলে সমতলবাসীর কাছে ত্রিপুরার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। চতুর্থত, ত্রিপুরি উপজাতির দলপতি বা রাজাও তাঁর পরিবার ব্রহ্মণ্য হিন্দুধর্ম গ্রহণ করায় এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সাদরে গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা করায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তাঁদের আশ্রয়দাতার রাজ্য সংগঠনে বিশেষ সহায়তা করেন। ত্রিপুরার রাজাদের পুরাণবর্ণিত চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত করে ত্রিপুরার রাজাদের বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর ফলে অন্যান্য হিন্দুপ্রভাবিত উপজাতিও প্রজাদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় ত্রিপুরার রাজারা সক্ষম হন। পঞ্চমত, সমতল অঞ্চল অধিকার ভুক্ত হওয়ায় রাজস্বও তাঁদের বৃদ্ধি পায়। ষষ্ঠত, মুসলিম শাসন ও সামরিক পদ্ধতির অনুকরণ করে তাঁরা নিজেদের রাজ্যকে আরও সুগঠিত ও শক্তিশালী করে তোলেন। এইভাবেই ত্রিপুরায় গড়ে উঠল মাণিক্যবংশীয় রাজাদের নেতৃত্বাধীনে এক শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য।

এই নতুন ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কারণ বিভিন্ন রাজাদের আমলে এই রাজ্য সংকুচিত ও বর্ধিত হয়েছে। রাজমালা ও অন্যান্য উপাদান থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মধ্যযুগে মাণিক্য বংশীয় রাজাদের রাজ্যের সীমানা এরূপ ছিল—পার্বত্য ত্রিপুরার ছাড়াও বিস্তীর্ণ এক সমতল অঞ্চল যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ময়মনসিংহ জেলার চতুর্থাংশ, শ্রীহট্টের অর্ধাংশ, নোয়াখালির তৃতীয়াংশ এবং ঢাকা জিলার কিযদংশ। এছাড়াও কোনো কোনো সময়ে চট্টগ্রামও ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এর ফলে পূর্বদিকে ত্রিপুরা রাজ্য ব্রহ্মদেশের সীমানা বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

মহামাণিক্য

সম্ভবত মহামাণিক্যই ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় প্রথম ঐতিহাসিক রাজা যিনি ত্রিপুরা রাজ্যকে একটি সুসংবদ্ধ রূপ দেন। রাজামালায় ধর্মমাণিক্যের ১৩৮০ শকের (১৪৫৮ খ্রিঃ) একটি তাম্রলিপির উল্লেখ আছে। এই তাম্রলিপিতে মহামাণিক্যকে ধর্মমাণিক্যের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ত্রিপুর বংশাবলীর মতে ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৩১ থেকে ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং মহামাণিক্য ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই রাজত্ব করেছিলেন ধরা যেতে পারে এবং এখন পর্যন্ত জানা মতে তিনি ত্রিপুরার প্রাচীনতম রাজা যিনি মাণিক্য উপাধী ধারণ করেন। রাজমালায় মহামাণিক্যকে মুকুটমাণিক্যের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য অনুসারে মুকুটমাণিক্য ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব করেছিলেন এবং মহামাণিক্যের পুত্র ধর্মমাণিক্য মুকুটমাণিক্যেব পূর্বেই রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং মহামাণিক্য মুকুটমাণিক্যের পুত্র হতে পারেন না। মহামাণিক্যের প্রকৃত নাম সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে রাজমালায় ছেত্তংফা বা ছেংথুমফা নামে এক রাজার উল্লেখ আছে যিনি গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই ছেংথুমফাকে মহামাণিক্য বলে মনে করেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে ধর্মমাণিক্য বা ডাঙ্গরফার সিংহাসনারোহণের কিছু পূর্বে গৌড়ের কোনো দুর্বল সুলতানের আমলে ছেংথুমফা বা মহামাণিক্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূভাগ জয় করে নতুন একটি রাজ্যের পত্তন করেন। মহামাণিক্য সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। মহামাণিক্যর কোনো লিপি বা মুদ্রাও পাওয়া যায় নি। তবে রাজমালায় বর্ণিত আছে যে ছেত্তংফা বা ছেংথুমফা (মহামাণিক্য) কোনো এক গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেছিলেন এবং এই গৌড়েশ্বর সমসাময়িক কোনো বাংলার সুলতান হবেন। রাজমালায় বর্ণিত আছে যে ছেংথুমফা মেহেরকুল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করলে গৌড়ের সুলতানর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষে ত্রিপুরার রানি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি ত্রিপুরার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দেন এবং নিজে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধেঅবতীর্ণ হন। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে ত্রিপুরার সেনাবাহিনী গৌড়ের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। এই কাহিনি ঐতিহাসিক দিক থেকে কতদূর সত্য তা জানার উপায় নেই। কারণ সমসাময়িক কোনো লিপি বা অন্য কোনো গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। মনে হয় মহামাণিক্যের (ছেংথুমফা) সঙ্গে কোনো এক সংঘর্ষে ত্রিপুরার রানি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে সাফল্য লাভ করেছিলেন। এই ঘটনায় ত্রিপুরার এক বীরাঙ্গনা নারীর পরিচয় পাওয়া গেলেও এই রানির প্রকৃত নাম কি ছিল তা জানা যায় না। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখেছেন, 'ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে রাজমালার লেখক বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়া এহেন রমণীরত্নের নাম স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নাই।'' পরবর্তী লেখকরা এই রানিকে মহাদেবী বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে এই সংঘর্ষে রাজার জামাতা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় রাজা তাঁকে সর্বপ্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ উল্লেখ করেছেন যে সেই সময় থেকে রাজার জামাতা সেনাপতি পদে নিযুক্ত হবার প্রথা ত্রিপুরায় প্রচলিত হয়।

ধর্মমাণিক্য

মহামাণিক্যের পুত্র ধর্মমাণিক্য একজন শক্তিশালী ও ধর্মপ্রবণ রাজা ছিলেন। ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ধর্মমাণিক্যের তারিখই সঠিকভাবে জানা যায়। তাঁর ব্রহ্মোত্তর দান উপলক্ষে দেওয়া তেরোশো আশি শকের (১৪৫৮ খ্রিঃ) তাম্রলেখটির বিবরণ রাজমালায় দেওয়া আছে। ত্রিপুর বংশাবলীর মতে ধর্মমাণিক্য ১৪৩১ থেকে ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজমালাতেও ধর্মমাণিক্য বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজমালা থেকে জানা যায় যে মহামাণিক্যের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র ধর্মমাণিক্য ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিদর্শন করে বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন। মহামাণিক্যের

মৃত্যু হলে ত্রিপুরা রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ত্রিপুরার নেতৃবর্গ বারাণসী থেকে ধর্মমাণিক্যকে ত্রিপুরার নিয়ে আসেন এবং তাঁদের অনুরোধে ধর্মমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে যে তিনি পিতার মৃত্যুর পর ত্রিপুরায় বিশৃঙ্খলার সুযোগে বাংলার সুলতানরা ত্রিপুরায় যে অংশগুলি জয় করেছিলেন সেগুলি পুনরুদ্ধার করেন। সুবর্ণগ্রামেও তিনি সাফল্যজনক ভাবে অভিযান ও লুণ্ঠন করেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালাতে উল্লেখ আছে যে ধর্মমাণিক্যের শাসনকালে আরাকানপতি মেং-সো-মোয়ান ব্রহ্মরাজ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়ে ত্রিপুরাজাতির আশ্রয় নেন। ত্রিপুরার সৈন্যের সাহায্যে মগরাজ নিজসিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

কথিত আছে ধর্মমাণিক্য বারাণসী থেকে কান্যকুব্জ দেশীয় কৌতুক নামে এক ব্রাহ্মণকে সপরিবারে নিয়ে আসেন এবং পুরোহিত হিসাবে তাঁকে বরণ করেন। ধর্মমাণিক্য ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেন। এ ধরনের একটি তেরশ আশি শকের (১৪৫৮ খ্রিঃ) তাম্রলেখর বিবরণ রাজমালায় দেওয়া আছে। তেরশ আশি শকের এই তাম্রলেখটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই মূল্যবান। কারণ এই তাম্রলেখ থেকে ধর্মমাণিক্যেব সময়কাল এবং তাঁর পিতা যে মহামাণিক্য ছিলেন তা জানা যায়। তাছাড়া ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজাদের প্রথম দিকের ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের কথাও এই তাম্রলেখ থেকে জানা যায়। রাজমালা গ্রন্থে আছে যে তিনি ধর্মসাগর নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করেছিলেন। এই দির্ঘিকার খননকার্য দুই বৎসরে শেষ হয়েছিল। এই দীর্ঘিকা উৎসর্গকালে ধর্মমাণিক্য তেরশ আশি শকাব্দে (১৪৫৮ খ্রিঃ) তাম্রশাসন দ্বারা কৌতুক ও অন্যান্য সাতজন ব্রাহ্মণকে "২৯ দ্রোণ" শস্যপূর্ণ ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করেছিলেন। এই সব তাম্রশাসনে তিনি লিখেছিলেন "আমার বংশ বিলুপ্ত হলে যদি এই রাজা অন্য কোনো নরপতির হস্তগত হয়, তাহলে আমি তাঁর দাসানুদাস হব, তিনি যেন ব্রহ্মবৃত্তিলোপ না করেন।" কুমিল্লায় অবস্থিত এই দিঘিটি ছাড়াও কৈলাসগড়েও ধর্মসাগর নামে আর একটি দিঘি আছে। এই দিঘিটিও হয়তো ধর্মমাণিক্য খনন করে থাকতে পারেন।

ধর্মমাণিক্যের অক্ষয়কীর্তি রাজমালা নামক ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস গ্রন্থ রচনার ব্যবস্থা করা। তিনি নিজ পিতৃপুরুষের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পাদনার জন্য বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামে দুজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁরা দুর্লভেন্দ্র নামক চন্তাই বা রাজপুরোহিতের সহায়তায় রাজমালা গ্রন্থটি রচনা করেন। সংস্কৃতে লেখা এই গ্রন্থটি ছাড়াও সাধারণের সুবিধার জন্য বাংলা পয়ার ছন্দেও বাংলা রাজমালা রচনা করেন। মূল সংস্কৃত ও বাংলা রাজমালা পাওয়া যায় না। তবে বাংলা রাজমালা গ্রন্থটি পরবর্তী কালে বিভিন্ন রাজাদের আমলে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে বর্তমান বাংলা রাজমালার আকার ধারণ করেছে।

রত্নমাণিক্য

ধর্মমাণিক্যের পর তাঁর পুত্র রত্নমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন। রাজমালায় রত্নমাণিক্যের পিতার নাম ডাঙ্গরফা বলা হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে ডাঙ্গরফা ও ধর্মমাণিক্য একই ব্যক্তি। রত্নমাণিক্যই ত্রিপুরার প্রথম রাজা যিনি ত্রিপুরার নিজস্ব মুদ্রা মির্মাণ করেন। এখন পর্যন্ত তাঁর ১৩৮৬ শক (১৪৬৪ খ্রিঃ) থেকে ১৩৮৯ শক (১৪৬৭ খ্রিঃ) পর্যন্ত কতগুলি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এর পূর্ববর্তী রত্নমাণিক্যের মুদ্রাগুলির কোনো তারিখ দেওয়া নেই। তাই রত্নমাণিক্য যে ১৪৬৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেছিলেন সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। ধর্মমাণিক্য ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে থাকলে রত্নমাণিক্য ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ বা তার পরেই রাজা হন এবং মুদ্রার সাক্ষ্য অনুযায়ী অন্তত ১৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর ১৪৬৪ খ্রিস্টাব্দের মুদ্রায় টাঁকশাল রত্নপুরের নাম থাকায় রত্নপুর যে তাঁর রাজধানী ছিল তা জানা যায়। রত্নপুর বর্তমান উদয়পুরের অন্তর্গত। মুদ্রায় রত্নমাণিক্যের মহিষীর নাম লক্ষ্মী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজমালায় বলা হয়েছে যে রাজা ডাঙ্গর ফা তাঁর আঠারো জন পুত্রের মধ্যে সতেরো জন পুত্রকে তার রাজ্য সতেরো ভাগে ভাগ করে দেন। সর্বকনিষ্ঠ রত্নফা গৌড়ের রাজদরবারে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে অবস্থান করতে থাকেন। রত্নফা গৌড়েশ্বরের সহায়তায় নিজ ভ্রাতাদের পরাজিত করে ত্রিপুরা অধিকার করেন এবং সমগ্র ত্রিপুরাকে ঐক্যবদ্ধ করে ত্রিপুরার রাজা হন। তিনি গৌড়েশ্বরের এই সহায়তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কতগুলি হস্তি ও একটি বহুমূল্য মাণিক বা রত্ন গৌড়েশ্বরকে উপহার দেন। বিনিময়ে গৌড়েশ্বর রত্নফাকে মাণিক্য উপাধি প্রদান করেন। সেই থেকে ত্রিপুরার রাজারা মাণিক্য উপাধি ধারণ করে আসছেন। অর্থাৎ রাজমালার বর্ণনা মতে রত্নমাণিক্যই প্রথম মাণিক্য উপাধি নেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অহোমরাজের যে দুজন দূত ত্রিপুরায় এসেছিলেন তাঁরাও তাদের বিবরণীতে রত্নমাণিক্যকে প্রথম মাণিক্য উপাধিধারী রাজা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুদ্রা ও তাম্রলেখর সাক্ষ্য অনুযায়ী ধর্মমাণিক্য রত্নমাণিক্যের পূর্ববর্তী ছিলেন এবং ধর্মমাণিক্যের পিতা ছিলেন মহামাণিক্য। সুতরাং রত্নমাণিক্যই প্রথম মাণিক্য উপাধি নেন নি, তাঁর পিতা ও পিতামহ ইতিপূর্বেই মাণিক্য উপাধি ধারণ করেছিলেন। অবশ্য গৌড়ের সুলতান রত্নমাণিক্যকে প্রথম মাণিক্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকতে পারেন। তাঁর সমসাময়িক গৌড়েশ্বর ছিলেন বাংলার সুলতান রুকনউদ্দীন বারবকশাহ (১৪৫৫ খ্রিঃ—১৪৭৬ খ্রিঃ) এবং সম্ভবত তাঁরই সহায়তায় রত্নমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। এর ফলে রত্নমাণিক্যকে সাময়িকভাবে বাংলার সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিল এবং আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ সুলতানকে কর হিসাবে হস্তি প্রদান করতে হয়েছিল। ত্রিপুরার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে নিজ অনুগত রাজাকে সিংহাসনে স্থাপন করে ও তার নিরাপত্তা

বিধান করে বাংলার সুলতান ত্রিপুরা থেকে নিজ সামরিক বাহিনীর জন্য হস্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন। ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতায় বাংলার সুলতানরা হস্তক্ষেপ করেন নি। রত্নমাণিক্যের মুদ্রা নির্মাণের অধিকার এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রত্নমাণিক্যের আমলে ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ত্রিপুরায় এসে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেন। রাজমালার বর্ণনা মতে গৌড়েশ্বরের অনুমতিক্রমে তিনি দশ হাজার বাঙালিকে ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম কৃষক ত্রিপুরায় চাষবাসের অধিকার পাওয়ায় ত্রিপুরার রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। রত্নমাণিক্য বাংলার সুলতানি শাসনের অনুকরণে ত্রিপুরার শাসন পদ্ধতির সংস্কার করেন। প্রশাসনে বাংলা ও পার্সি ভাষার প্রচলন শুরু হয়। তাঁর মুদ্রায় বাংলা অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছিল। তাঁর আমলেই বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং উপজাতি ভিত্তিক ত্রিপুরা একটি সুসংগঠিত রাজ্যরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর মুদ্রায় চতুর্দ্দশ দেবতার উল্লেখ থাকায় চতুর্দশ দেবতা যে প্রাচীন কাল থেকেই ত্রিপুরায় পূজিত হয়ে আসছেন তা প্রমাণিত হয়। তাঁর মুদ্রায় নারায়ণ ও দুর্গার উল্লেখ থাকায় তিনি যে বিষ্ণু ও দুর্গার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা জানা যায়। এখন পর্যন্ত তাঁর সর্বশেষ প্রাপ্ত ১৮৮৯ শকের (১৪৬৭ খ্রিঃ) মুদ্রা থেকে মনে হয় রত্নমাণিক্য অন্তত ১৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

প্রথম প্রতাপমাণিক্য

রত্নমাণিক্যের মৃত্যু পর তাঁর পুত্র প্রতাপমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন। রাজমালার মতে প্রতাপমাণিক্যের জনপ্রিয়তা ছিল না এবং তিনি একজন অত্যাচারী শাসক ছিলেন। রত্নমাণিক্যের মৃত্যুর পর সেনানায়করা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল এবং তারাই প্রতাপমাণিক্যকে হত্যা করে। তাঁর কোনো মুদ্রা বা লিপি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দের একটি তাম্রলেখতে বিজয়মাণিক্য নামে এক রাজার উল্লেখ আছে। এই বিজয়মাণিক্যের সঙ্গে প্রথম প্রতাপমাণিক্যের প্রকৃত সম্পর্ক কী ছিল জানা যায় না। হয়তো এই বিজয়মাণিক্য প্রতাপমাণিক্যের পুত্র ছিলেন। এই তাম্রলেখ অনুসারে রাজা বিজয়মাণিক্যের মাতুল দৈত্যনারায়ণের মহিষী পুণ্যবতী রাজার আদেশ ছাড়াই নিজ নামে ১৪১০ সকে (১৪৮৮ খ্রিঃ) এক ব্রাহ্মণকে কয়েকটি গ্রাম দান করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে রাজা বিজয়মাণিক্য তখন নাবালক ছিলেন এবং দৈত্যনারায়ণই ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসক। সম্ভবত বিজয়মাণিক্য খুব স্বল্পকাল রাজত্ব করেন।

মুকুটমাণিক্য

প্রথম প্রতাপমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুটমাণিক্য ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা

হন। ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচারিত তাঁর একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। রাজমালার মতে মুকুটমাণিক্য একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন এবং দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। কিন্তু ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দের বিজয়মাণিক্যের আমলের তাম্রলেখ এবং ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের ধন্যমাণিক্যের মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে মুকুটমাণিক্য খুবই অল্পকাল রাজত্ব করেন এবং ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই তাঁর রাজত্বের সমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় প্রতাপমাণিক্য

মুকুটমাণিক্যের পুত্র দ্বিতীয় প্রতাপমাণিক্য ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে ত্রিপুরার রাজা হন। ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের (১৪২২ শক) তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। তিনি শক্তিশালী হয়ে ওঠায় সেনানায়করা গোপনে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করেন। সুতরাং মুকুটমাণিক্যের মতো তিনিও খুব স্বল্পকাল রাজত্ব করেন। বস্তুত রত্নমাণিক্যের পর থেকে ধন্যমাণিক্যের সিংহাসনারোহণের (১৪৯০ খ্রিঃ) পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে ত্রিপুরার রাজাদের বংশ তালিকা ও ধারাবাহিকতা সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই দুরূহ। বিশেষত এই সময়ের প্রাপ্ত তাম্রলেখ ও মুদ্রার সঙ্গে রাজমালা বর্ণিত বংশ তালিকার ধারাবাহিকতার সামঞ্জস্যবিধান করা কঠিন ব্যাপার। এ সময়ের আরো অধিক মুদ্রা বা লিপি পাওয়া না যাওয়া পর্যন্ত এই সময়ের রাজাদের ধারাবাহিকতা অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

ধন্যমাণিক্য

ধন্যমাণিক্য ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ঐ বৎসর নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। রাজমালায় ধন্যমাণিক্যকে মুকুটমাণিক্যের প্রপৌত্র বলা হয়েছে। কিন্তু বংশানুক্রমিক দিক থেকে তা সম্ভব নয় কারণ মুকুটমাণিক্য ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন এবং তার এক বৎসর পর ধন্যমাণিক্য মুদ্রা প্রচার করেন। সুতরাং ধন্যমাণিক্য মুকুটমাণিক্যের পুত্র হতে পারেন কিন্তু প্রপৌত্র নন।

ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে ধন্যমাণিক্যের মুদ্রাতেই প্রথম ত্রিপুরার উল্লেখ দেখা যায়। তাঁর ১৪১২ শকের মুদ্রা 'ত্রিপুরেন্দ্র' অর্থাৎ ত্রিপুর রাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সমসাময়িক বাংলা কাব্যগুলিতেও ত্রিপুরা বা ত্রিপুর জাতির স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।

মধ্যযুগে ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে ধন্যমাণিক্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলা যায়। রত্নমাণিক্যের মৃত্যুর পর থেকে ত্রিপুরার সামন্ত ও সেনানায়করা বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ইচ্ছামতো রাজাদের হত্যা করতেন ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতেন। সেনাপতিদের ভয়ে শৈশবে ধন্যমাণিক্য আত্মগোপন করেছিলেন। রাজা হয়েও প্রথম দিকে ধন্যমাণিক্য

চক্রান্তকারী সেনাপতিদের সম্পর্কে সন্ত্রস্ত থাকতেন এবং নিজেকে অসহায় বোধ করতেন। শেষ পর্যন্ত ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাদের হত্যা করে নিজেকে বিপদমুক্ত করেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রধান সেনাপতির কন্যা কমলাদেবীকে বিবাহ করে নিজেকে নিরাপদ রেখেছিলেন। তিনি সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠন করেন। পূর্বে নারায়ণ উপাধিধারী সেনাপতিদের কেবলমাত্র ত্রিপুর সম্প্রদায় থেকেই নির্বাচিত করা হত। এই সব সেনা নায়কদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তিনি অন্যান্য সম্প্রদায় থেকেও সেনানায়ক নির্বাচিত করেন। রায়কচাক ও রায়কাছাম নামক তাঁর দুই বিখ্যাত সেনানায়ক সম্ভবত রিয়াং সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

ধন্যমাণিক্য ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ অধিকার করে তাঁর জয়যাত্রা শুরু করেন। বাংলার সুলতান হুসেনশাহের সিংহাসনারোহণের প্রাক্কালে বাংলায় যে বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়েছিল সেই সুযোগে ধন্যমাণিক্য পট্টিকেরা, গঙ্গামণ্ডল, মেহেরকুল, খণ্ডল প্রভৃতি বাংলার অংশগুলি ত্রিপুরারাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। বরদাখাতের জমিদার প্রতাপ রায় ধন্যমাণিক্যের আনুগত্য স্বীকার করেন। ধন্যমাণিক্য পূর্বদিকের কুকিদের দমন করে কুকিদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। এইসব সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে 'বিজয়েন্দ্র' উপাধি গ্রহণ করে এক মুদ্রা প্রচার করেন।

ধন্যমাণিক্যের সঙ্গে বাংলার সুলতান হুসেন শাহের বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের বিবরণ রাজমালায় বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। তাছাড়া পরাগল খানের সভা কবি পরমেশ্বর দাস ও ছুটি খানের সভাকবি শ্রীকর নন্দীর লেখাতেও এই সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। সম্ভবত তিনটি কারণে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। প্রথমত, ধন্যমাণিক্য আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করে বাংলার বেশ কিছু অংশ ত্রিপুরার রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এগুলি পুনরুদ্ধার করা হুসেন শাহের ইচ্ছা ছিল। দ্বিতীয়ত, ধন্যমাণিক্যের নেতৃত্বে স্বাধীন ও শক্তিশালী ত্রিপুরা রাজ্যের উত্থান বাংলার সুলতানের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং তাঁকে দমন করা বাংলার সুলতানের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তৃতীয়ত, চট্টগ্রামের অধিকারকে কেন্দ্র করে সেই সময় ত্রিপুরা, বাংলা ও আরাকানের মধ্যে ত্রিমুখী সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। রাজমালার বিবরণ থেকে জানা যায় যে হুসেন শাহের প্রথম ত্রিপুরা আক্রমণ ধন্যমাণিক্য সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেন। হুসেন শাহের সেনাবাহিনী প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এর পর হুসেন শাহ গৌড়াই মল্লিককে সেনাপতি নিযুক্ত করে দ্বিতীয় বার ত্রিপুরা অভিযানে প্রেরণ করেন। গৌড়াই মল্লিক ত্রিপুরার বেশ কিছু অঞ্চল জয় করেন এবং গোমতী নদীর উপর দিক দখল করে ছিল নামে এক খোজার পরামর্শমত গোমতী নদীর জল প্রথমে অবরুদ্ধ রেখে ও পরে তা মুক্ত করে ত্রিপুরা রাজ্যের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটান। ধন্যমাণিক্য শেষ পর্যন্ত অভিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলার সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। ধন্যমাণিক্য

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ

ত্রিপুবাব বাজ আমলেব প্রাচীন মুদ্রার কয়েকটি নিদর্শন

পূর্বাধিকৃত অঞ্চলগুলি অধিকার করলে হুসেন শাহ্ সেনাপতি হৈতন খাঁ ও করব খাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনী তৃতীয় বার ত্রিপুরা অভিযানে প্রেরণ করেন। হৈতন খাঁ সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যর দুর্গের পর দুর্গ জয় করতে থাকেন এবং গোমতী নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হন। এইবার ত্রিপুরারাজ গোমতীর জল প্রথমে অবরুদ্ধ করে ও পরে মুক্ত করে হৈতন খাঁর সেনাবাহিনীর বিপর্যয় ঘটান। হৈতন খাঁ পিছু হটে ছয়কড়িয়ায় চলে আসেন। ধন্যমাণিক্য ছয়কড়িয়ার পূর্ব পর্যন্ত হৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চল হুসেন শাহের দখলেই থেকে যায়। ১৪৩৫ শকে অর্থাৎ ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করে স্মারকমুদ্রা নির্মাণ করেন। কিন্তু হুসেন শাহ্ চট্টগ্রাম অধিকার করলে ধন্যমাণিক্য পুনরায় ১৪৩৬ শকাব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করে স্মারক মুদ্রা প্রচার করেন। ধন্যমাণিক্যের এক সেনাপতি আরাকানের রামু অঞ্চল জয় করে ধন্যমাণিক্য কর্তৃক 'রসাঙ্গ মর্দন' অর্থাৎ আরাকানের রাজধানী 'রসাঙ্গ' বিজেতা উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজমালায় ১৪৩৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে ধন্যমাণিক্যের পুনরায় চট্টগ্রাম জয়ের উল্লেখ আছে।

রাজমালা ছাড়াও হুসেন শাহের সঙ্গে ধন্যমাণিক্যের সংঘর্ষের বিবরণ অন্যত্র পাওয়া যায়। সোনারগাঁও অঞ্চলে ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ হুসেন শাহের এক শিলালিপি পাওয়া গেছে। ঐ শিলালিপিতে খওয়াম খান নামে হুসেন শাহের এক কর্মচারীকে ত্রিপুরার সর-এ-লস্কর—বলা হয়েছে। এর থেকে মনে হয় ঐ সময় ত্রিপুরার কিছু অংশ হুসেন শাহ অধিকার করে নিয়েছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে লিখেছেন যে হুসেন শাহ ত্রিপুরা জয় করেছিলেন। শ্রীকর নন্দী তাঁর মহাভারতে লিখেছেন যে হুসেন শাহ ত্রিপুরা জয় করেছিলেন। শ্রীকর নন্দী তাঁর মহাভারতে লিখেছেন যে তাঁর পৃষ্ঠপোষক, হুসেন শাহের অন্যতম সেনাপতি ছুটি খান ত্রিপুরার দুর্গ আক্রমণ করলে ত্রিপুরারাজ দেশত্যাগ করে 'পর্বতগহ্বরে' 'মহাবনমধ্যে' বাস করতে থাকেন। ছুটি খানকে তিনি হাতি ও ঘোড়া দিয়ে সম্মানিত করেন। ছুটি খান তাঁকে অভয় দান করা সত্ত্বেও তিনি আতঙ্কে থাকেন। এ ধরনের বর্ণনায় কিছুটা অতিরঞ্জন আছে সন্দেহ নেই। তবে কোনো একসময়ে বাংলার সেনাবাহিনী ছুটি খানের নেতৃত্বে ত্রিপুরা অভিযানে সাফল্য লাভ করেছিল বলে মনে হয়।

ধন্যমাণিক্য শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। কথিত আছে তিনি হিন্দু পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থ 'উৎকল-খণ্ড পাঁচালী' ও 'প্রেতচতুর্দশী' বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। ধন্যমাণিক্যের অক্ষয়কীর্তি ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির নির্মাণ। তিনি উদয়পুরে মহাদেবের মন্দিরে এবং রত্নপুরে চৌদ্দদেবতার মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি মহিষী কমলা দেবীর নামে কসবা অঞ্চলে কমলাসাগর দিঘি খনন করেন। পূর্বে চৌদ্দ দেবতার মন্দিরে নরবলি

দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ধন্যমাণিক্য এই নরবলি প্রথা নিষিদ্ধ করেন। কেবলমাত্র অপরাধী ও যুদ্ধবন্দি শত্রুদের বলি দেওয়া হত।

রাজমালা থেকে জানা যায় ধন্যমাণিক্যের বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়েছিল। 'ত্রিপুর-বংশাবলীর' মতে ধন্যমাণিক্যের ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু ঘটে এবং মুদ্রার সাক্ষ্য অনুসারে ধন্যমাণিক্য অন্তত পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। সম্ভবত মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল তি প্পান্ন বৎসর। বাংলার সুলতানের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি মন্দির নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই সব উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে তাঁর রাজত্বকালে ত্রিপুরা বেশ সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

ধ্বজমাণিক্য

ধন্যমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন। তিনি অল্পকাল রাজত্ব করে পরলোক গমন করেন। তাঁর কোনো মুদ্রা বা লিপি এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। 'ত্রিপুরা বংশাবলী' ও কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালায় ধ্বজমাণিক্যের নাম থাকলেও পুরাতন রাজমালায় তাঁর কোনো উল্লেখ নেই। তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

দেবমাণিক্য

ধ্বজমাণিক্যের ভ্রাতা দেবমাণিক্য অন্তত পক্ষে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা হন কারণ দেবমাণিক্যের ১৫২০ খ্রিস্টাব্দের মুদ্রা পাওয়া গেছে। কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে দেবমাণিক্য ধ্বজমাণিক্যের নাবালক পুত্র ইন্দ্রের দাবি অগ্রাহ্য করে ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। ধন্যমাণিক্য ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ মৃত্যুর কিছুপূর্বে চট্টগ্রাম অধিকার করেছিলেন। কিন্তু এর অল্প কিছুদিন পরেই আরাকানরাজ চট্টগ্রাম অধিকার করে নেন। ১৪৩৯ শকাব্দে (১৫১৭ খ্রিঃ) পর্তুগিজ ভ্রমণকারী জন ডি. সেলবেরা চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেন এবং সেই সময় চট্টগ্রাম আরাকান রাজের হাতে ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। রাজমালায় বলা হয়েছে দেবমাণিক্য চট্টগ্রামে থানা বা সেনাশিবির স্থাপন করেছিলেন। এর থেকে মনে হয় দেবমাণিক্য আরাকানরাজের কাছ থেকে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম সাক্ষ্য ও পর্তুগিজ বণিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে চট্টগ্রাম দেবমাণিক্যের সমসাময়িক সুলতান নসরৎ শাহের অধীনে ছিল। অর্থাৎ দেবমাণিক্যের চট্টগ্রাম অধিকার স্থায়ী হয় নি। সুলতান নসরৎ শাহের সঙ্গে যে দেবমাণিক্যের সংঘর্ষ হয়েছিল তা মুহম্মদ খান রচিত "মুক্তুল হোসেন" কাব্য থেকে জানা যায়। মুহম্মদ খান লিখেছেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ হামজা খান ত্রিপুরার সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। হামজা খান বাংলার

সুলতান নসরৎ শাহের অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। দেবমাণিক্য ১৪৫০ শক ও ১৪৫২ শকে যে স্মারক মুদ্রা প্রচার করেন তাতে দেবমাণিক্যকে 'সুবর্ণগ্রামে বিজয়ী' বলা হয়েছে। এই মুদ্রাগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে দেবমাণিক্য অন্তত সাময়িকভাবে বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের কাছ থেকে সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও জয় করেছিলেন। নসরৎ শাহ সেই সময়ে মুঘল সম্রাট বাবরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন এবং সেই সুযোগে সম্ভবত দেবমাণিক্য সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ ও জয় করেছিলেন। রাজমালায় অবশ্য দেবমাণিক্যের সুবর্ণ গ্রাম বিজয়ের কোনো উল্লেখ নেই। রাজমালায় বলা হয়েছে যে দেবমাণিক্য ভুলুয়া বা নোয়াখালি জয় করে দুরাশায় স্নান তর্পণ করেন এবং চন্দ্রনাথ তীর্থে গিয়ে মুদ্রা নির্মাণ করেন। তিনি যে ভুলুয়া বা নোয়াখালি জয় করে দুরাশার সাগরতীর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন তা তাঁর ১৪৪২ শকের (১৫০২ খ্রিঃ) স্মারক মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয়। এই মুদ্রায় তাঁকে "দুরাশার স্নায়ী" বলা হয়েছে। ১৪৪২ শকের ভুলুয়া অভিযানের মুদ্রা থেকে অনুমিত হয় যে দেবমাণিক্য ১৫২০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই ত্রিপুরার রাজা হয়েছিলেন।

রাজমালায় বর্ণিত আছে যে দেবমাণিক্য মিথিলা নিবাসী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী লক্ষ্মীনারায়ণের প্রভাবাধীন হন। লক্ষ্মীনারায়ণ ক্রমশ ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠেন। তিনি শ্মশান ক্ষেত্রে দেবমাণিক্যকে হত্যা করেন। তাঁর চিতায় তাঁর প্রধানা মহিষী ও চন্তাইকন্যা আত্মোৎসর্গ করেন। তিনি দেবমাণিক্যের অপর মহিষীর সহায়তায় দেবমাণিক্যের নাবালক পুত্র ইন্দ্রের অভিভাবক হিসাবে দেশ শাসন করলে সেনানায়করা ক্ষিপ্ত হয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ, দেবমাণিক্যের মহিষী ও তাঁর পুত্র ইন্দ্রকে হত্যা করে। কৈলাসচন্দ্র সিংহ অবশ্য তাঁর রাজমালায় লক্ষ্মীনারায়ণের স্থলে চন্তাই পুরোহিতের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি ইন্দ্রকে ধ্বজমাণিক্যের পুত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইন্দ্রের মাতা দেবমাণিক্যের নয় ধ্বজমাণিক্যের মহিষী ছিলেন। সম্ভবত দেবমাণিক্য ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

বিজয়মাণিক্য

ধ্বজমাণিক্যের পুত্র ইন্দ্রমাণিক্যকে হত্যা করার পর সেনানায়করা দেবমাণিক্যের পুত্র বিজয়মাণিক্যকে ত্রিপুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিপূর্বে দেবমাণিক্য নিহত হলে ইন্দ্রের সমর্থকরা বিজয়মাণিক্যকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত বিজয়মাণিক্যের সর্বপ্রাচীন ১৪৫৪ শকের মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয়ে যে বিজয়মাণিক্য ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে বা তার কিছু পূর্বে রাজা হন। তাঁর সর্বশেষ মুদ্রা ১৪৮৫ শকাব্দ (১৫৬৩ খ্রিঃ) এবং তাঁর পুত্র অনন্তমাণিক্যের মুদ্রা ১৪৮৬ শকাব্দ (১৫৬৪ খ্রিঃ) পাওয়া গেছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় বিজয়মাণিক্য ত্রিশ বৎসরের অধিক রাজত্ব করেছেন। বিজয়মাণিক্য

কেবল দীর্ঘকাল রাজত্বই করেন নি, তিনি দক্ষতার সঙ্গে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যার সঙ্গে বিজয়মাণিক্যের বিবাহ হয়েছিল। রাজার শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি হওয়ায় দৈত্যনারায়ণ অসীম ক্ষমতার অধিকারী হন। বিজয়মাণিক্য দৈত্যনারায়ণের প্রভাব প্রতিপত্তিতে ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন। তিনি মাধব নামে এক ব্যক্তিকে দিয়ে দৈত্যনারায়ণকে হত্যা করেন। দৈত্যনারায়ণের কন্যা ও বিজয়মাণিক্যের মহিষী লক্ষ্মী এই বৃত্তান্ত জানতে পেরে পিতৃহন্তা মাধবকে সুকৌশলে হত্যা করান। এতে বিজয়মাণিক্য ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মীকে নির্বাসন দেন ও অন্য একজনকে বিবাহ কবেন। পাত্রমিত্রদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি আবার লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেন। বিজয়মাণিক্যের ১৪৫৪ ও ১৪৫৬ শকের প্রাথমিক দুই প্রকার মুদ্রায় যে বিজযার নাম পাওয়া যায় সম্ভবত তিনি ও রানি লক্ষ্মী অভিন্ন। ভবিষ্যতে দৈত্যনারাযণ বা প্রধান সেনাপতি যাতে অধিক ক্ষমতাশালী হতে না পারেন সেজন্য তাঁর ক্ষমতা বিভাজন করে উজির, নাজির ও অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেন। তিনি আফগানদের নিয়ে একদল অশ্বারোহী সেনা গঠন করেন। সেনাবাহিনীকেও তিনি সুসংগঠিত করেন। সুর্যখাঁড়া নামে খড়্গধারী শারীরিক দিক থেকে বলশালী এক বিশেষ সৈন্যদলও তিনি গঠন করেন।

সেনাবাহিনী সুগঠিত করে বিজয়মাণিক্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। তিনি পাশ্ববর্তী শ্রীহট্ট আক্রমণ করে অধিকার করেন। খাসিয়া জয়ন্তিয়া রাজ্যের সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হয়। খাসিয়া জয়ন্তিযার রাজা পরাজিত হলে হেড়ম্বরাজের মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

বিজয়মাণিক্যের আফগান অশ্বারোহী সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে উজির প্রচণ্ডনারায়ণকে হত্যা করে। বিজয়মাণিক্য কঠোর হস্তে তাদের দমন করেন এবং রাজমালার বিবরণ অনুসারে বন্দি বিদ্রোহী আফগান সেনাদের চৌদ্দদেবতার মন্দিরে বলি দেওয়া হয়।

চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে বিজয়মাণিক্যের সঙ্গে বাংলার সুলতানের তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে বিজয়মাণিক্য পরাজিত হন এবং তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি কালানাজির যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিজয়মাণিক্য বিজয়ী হন। আফগান সেনাপতি মমারক খান বিজয়মাণিক্যের হাতে বন্দি হলে চন্তাই বা রাজপুরোহিতের পরামর্শক্রমে তাকে চৌদ্দদেবতার মন্দিরে বলি দেওয়া হয়। বাংলার সুলতান সেই সময় দিল্লির মুখলদের আক্রমণ আশংকা করে বিজয়মাণিক্যের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে। রাজমালার বিজয়মাণিক্যের প্রতিপক্ষ বাংলার সুলতান দাযুদ কররানিকে বলা হয়েছে এবং আফগান সেনাপতি মমারক খানকে দায়ুদ কররানির শ্যালক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য অনুযায়ী দায়ুদ কররানি (১৫৭৩ খ্রিঃ—১৫৭৬ খ্রিঃ) বিজয়মাণিক্যের (১৫৩২ খ্রিঃ—১৫৬৩ খ্রিঃ) সমসাময়িক হতে পারেন না। কররাণি

বংশীয় সুলতানদের পূর্ববর্তী কোনো সুলতান বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন।

মুঘল আফগান সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে বিজয়মাণিক্য সোনারগাঁও অভিযান করেন এবং সোনারগাঁও থেকে প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করেন। তাঁর সেনাবাহিনী পদ্মানদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। রেভারেণ্ড জেমস লং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় বিজয়মাণিক্য ছাব্বিশ হাজার পদাতিক, পাঁচ হাজার নৌকা, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও বহু গোলন্দাজ নিয়ে ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও লক্ষ্যা নদী দিয়ে সোনারগাঁও বিক্রমপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। বিজয়মাণিক্যের এই বিজয় অভিযানের কাহিনী সম্পর্কিত তিন প্রকার স্মারকমুদ্রা অবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথমটি সুবর্ণগ্রাম জয়ের পর ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ ধ্বজঘাট স্নানের, দ্বিতীয়টি ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী লক্ষ্যাস্নানের এবং তৃতীয়টি পদ্মাবতী স্নানের স্মরণে মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রাগুলির সময়কাল থেকে মনে হয় যে বিজয়মাণিক্যের অভিযানগুলি রাজত্বের শেষ দিকে (১৪৭৯ শক থেকে ১৪৮৫ শকের মধ্যে) সংঘটিত হয় এবং এই অভিযানগুলিতে তিনি স'ফল্য লাভ করেন।

বিজয়মাণিক্য মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে উল্লেখ আছে যে "ভাটি সংলগ্ন এক বিস্তীর্ণ ভূভাগে তিপ্রা উপজাতি বাস করে। তাদের রাজার নাম বিজয়মাণিক্য। রাজারা মাণিক্য ও সর্দাররা নারায়ণ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর দুই লক্ষ পদাতিক ও এক সহস্র হস্তি আছে। অবশ্য অশ্বের সংখ্যা নগণ্য।" বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে খাসিয়া জয়ন্তিয়া রাজার প্ররোচনায় কিছু হালাম প্রজা বিদ্রোহ করলে বিজয়মাণিক্য শান্তিপূর্ণভাবে এই বিদ্রোহ প্রশমিত করেন এবং হালাম সর্দারকে উপহার প্রদানপূর্বক বশীভূত করেন।

বিজয়মাণিক্যের যে বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে সেগুলি নানাভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৪৫৪ থেকে ১৪৮৫ শকাব্দের মধ্যে মুদ্রিত এই মুদ্রাগুলিতে তাঁর চারটি বিচিত্র বিরুদ ও চার জন মহিষীর নাম পাওয়া যায়। চার প্রকার মুদ্রায় তাঁকে 'কুমুদীশদর্শী', 'প্রতিসিন্ধুসীম', 'ত্রিপুরমহেশ' ও 'বিশ্বেশ্বর' বলা হয়েছে। এগুলির লেখনে যথাক্রমে বিজয়া, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও বাগ্‌দেবীর নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে রাজমালায় শুধুমাত্র লক্ষ্মীর নাম প্রত্যক্ষভাবে এবং দ্বিতীয় এক রানির কথা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। বিজয়মাণিক্যের লক্ষ্যাস্নানের স্মারক মুদ্রাগুলিতে শিব ও দুর্গার অংশে কল্পিত অনন্যপূর্ব অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি এবং পদ্মাবতী স্নানের স্মারক মুদ্রার মুখ্য দিকে শিবলিঙ্গ ও গৌণ দিকে সিংহাসনে স্থাপিত গরুড়বাহিত বিষ্ণুরমূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। এর থেকে তিনি যে শিব, দুর্গা ও বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা বোঝা যায়।

বিজয়মাণিক্য কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণেরও সমসাময়িক ছিলেন। নরনারায়ণ কাছাড়, মণিপুর ও শ্রীহট্ট জয় করেন। 'দরং রাজবংশাবলীতে' দাবি করা হয়েছে যে

নরনারায়ণের ভ্রাতা ও সেনাপতি চিলা রায় ত্রিপুরা আক্রমণ করেন ও রাজাকে নিহত করেন। ত্রিপুরার পরবর্তী রাজা দশ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা, একশত স্বর্ণমুদ্রা ও ত্রিশটি অশ্ব কর হিসাবে দিতে স্বীকৃত হন। রাজমালাতে এ ধরনের কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই। বিজয়মাণিক্য একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁর পক্ষে এ ধরনের পরাজয় ঘটেছিল বলে মনে হয় না। রাজমালা থেকে জানা যায় বিজয়মাণিক্যের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঙ্গরফা শারীরিক দিক থেকে দুর্বল থাকায় শাসনের উপযুক্ত নয় বিবেচনা করে তাঁকে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের দরবারে প্রেরণ করা হয় এবং কনিষ্ঠ পুত্র অনন্তমাণিক্যকেই ত্রিপুরার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়। সম্ভবত বিজয়মাণিক্য বাংলার সুলতানদের বিরুদ্ধে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন যা তাঁর কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় দেয়।

বিজয়মাণিক্য উদয়পুরের নিকট হিরাপুরে গোপীনাথের মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি তুলাপুরুষ জলাশয় খনন, মঠ নির্মাণ, দেবতা স্থাপন, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি নানাপ্রকার ভূমিদান করেছিলেন। তিনি বিজয় নদীর বিবিধ বাঁক কর্তন করেন। সেজন্য সেই নদী আজও বিজয় নদী নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

অনন্তমাণিক্য

১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে বসন্তরোগে বিজয়মাণিক্যের মৃত্যু হলে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র অনন্তমাণিক্য ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দের শেষে অথবা ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা হন। ১৪৮৬ শকাব্দ বা ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের অনন্তমাণিক্যের মুদ্রা পাওয়া গেছে। অনন্তমাণিক্য উপযুক্ত রাজা ছিলেন না। তিনি শ্বশুর ও সেনাপতি গোপীপ্রসাদনারায়ণের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েন। গোপীপ্রসাদ ত্রিপুরা রাজ পরিবার ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু বিজয়মাণিক্যের সময় তিনি সেনাপতি পদ লাভ করে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেন। অনন্তমাণিক্যের সময় তিনি রাজ্যের সর্বেসর্বা হন। কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত শ্রীরাজমালা ও কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা অনুসারে ক্ষমতালোভী গোপীপ্রসাদ জামাতা অনন্তমাণিক্যকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করান। পুরাতন রাজমালার মতে অনন্তমাণিক্য রোগাক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। তাঁর ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দের সর্বশেষ মুদ্রা পাওয়া গেছে। তিনি মাত্র দেড় বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

উদয়মাণিক্য

অনন্তমাণিক্যের মৃত্যুর পর গোপীপ্রসাদ ত্রিপুরার রাজা হল। সম্ভবত তিনি প্রথম দিকে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন নি। বেশ কিছুদিন পরে সম্ভবত ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে বা রাজার কিছুপূর্বে অভিষিক্ত হয়ে সিংহাসনে বসেন এবং উদয়মাণিক্য নাম ধারণ করেন।

ঐ বৎসর অর্থাৎ ১৪৮৯ শকে তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। রাজা হিসাবে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি চন্দ্রপুরে চন্দ্রসাগর নামে এক দিঘি খনন করেন। ত্রিপুরার রাজধানী রাঙ্গামাটি তাঁর নাম অনুসারে উদয়পুর নামে পরিচিত হয়। তিনি বহু জলাশয় খনন এবং প্রসাদাদি নির্মাণ করেন। চন্দ্রগোপীনাথের মন্দিরও নির্মাণ করেন তাঁর রাজত্বকালে বাংলার সুলতান সুলেমান কররানি ত্রিপুরার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করে নেন। রাজমালার মতে উদয়মাণিক্য পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। মুদ্রার সাক্ষ্য অনুসারে অনুমিত হয় তিনি ছয় সাত বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

জয়মাণিক্য

উদয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জয়মাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে বা তার কিছু পূর্বে। ১৪৯৫ শকে (১৫৭৩ খ্রিঃ) তিনি নিজ নামে মুদ্রা নির্মাণ করেন। তিনি সেনাপতি রনাগণ নারায়ণের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন। দেবমাণিক্যের পুত্র ও বিজয়মাণিক্যের এক ভ্রাতা অমরমাণিক্য জয়মাণিক্য রনাগণ নারায়ণকে হত্যা করে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। এইভাবে ত্রিপুরার পুরাতন রাজা বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। রাজমালার মতে জয়মাণিক্যের রাজত্বকাল একবৎসর ছিল। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য অনুসারে মনে হয় জয়মাণিক্য আরো কয়েক বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

অমরমাণিক্য

অমরমাণিক্য ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন ওই বৎসর (১৪৯৯ শক) নিজ নামে মুদ্রা নির্মাণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর অমরমাণিক্য ত্রিপুরার অধীনস্থ সামন্ত ও জমিদারদের উপর নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ভুলুয়ার জমিদার তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে তিনি তাঁকেও করদানে বাধ্য করেন। ১৫০২ শকাব্দের (১৫৮০ খ্রিঃ) মুদ্রায় তিনি 'দিগ্বীজয়ী' এই বিশেষণ ব্যবহার করেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরপের জমিদার তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে তিনি তাঁকে দমন করার জন্য রাজপুত্র রাজধরকে প্রেরণ করেন। তরপের জমিদার শ্রীহট্টের শাসক ফতে খানের আশ্রয় নিলে ত্রিপুরার সৈন্যের সঙ্গে ফতে খানের তুমুল সংঘর্ষ হয়। রাজধরের হাতে ফতে খান পরাজিত হলে শ্রীহট্ট ত্রিপুরার অধীন হয়। ফতে খান বার্ষিক কর দানে স্বীকৃত হলে তাঁকে শ্রীহট্ট ফেরত দেওয়া হয়। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দের মুদ্রায় অমরমাণিক্য নিজেকে 'শ্রীহট্ট বিজয়ী' বলে ঘোষণা করেন। রাজমালার বিবরণ থেকে জানা যায় যে অমরমাণিক্য বাকলা চন্দ্রদ্বীপে অভিযান করে সেখান থেকে প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং বহু লোককে দাস রূপে বন্দি করে আনেন। ভাটির শাসনকর্তা ইশা খাঁর সঙ্গেও তাঁর মিত্রতা ছিল। সম্ভবত মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ইশা খাঁ ত্রিপুরারাজের সাহায্য প্রার্থী ছিলেন এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে ইশা খাঁ ত্রিপুরার সাহায্য পেয়েছিলেন। রাজমালার মতে ত্রিপুরার রাজা ইশা খাঁকে মসনদ-

ই-আলা উপাধি দেন। শ্রীহট্টের আফগান শাসক ফতে খানের সঙ্গে সদয় ব্যবহার এবং ইশা খাঁর সঙ্গে মিত্রতা থেকে অনুমিত হয় যে তিনি সম্ভাব্য মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে আফগানদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন।

অমরমাণিক্য উদয়পুরের কিছুদূরে অমরসাগর নামে এক বিশাল দিঘি খনন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে থেকেও বহু শ্রমিক এই দিঘির খনন কার্যে নিযুক্ত হয়েছিল। এই দিঘির তীরে এক ত্রিতল অট্টালিকাও নির্মাণ করেন। প্রাসাদটির ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। সম্ভবত ঐ অঞ্চলে তিনি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এবং এই এলাকাটি অমরপুর নামে পরিচিত। অমরমাণিক্য মৃগয়া উপলক্ষে সরাইল গ্রামে আগমন করেছিলেন। সবাইলের দক্ষিণ দিকস্থ বনজঙ্গল পরিষ্কার করে অমরমাণিক্যের অনুমতি নিয়ে তাঁর পুত্র রাজধর সেখানে বেয়াল্লিশ নামে গ্রাম স্থাপন করেন। রাজমালার দ্বিতীয় খণ্ড তাঁরই রাজত্বকালে রচিত হয় বলে ধারণা করা হয়।

অমরমাণিক্যের রাজত্বের শেষ দিক নানাভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। অমরমাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করে আরাকান রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রথম দিকে অমরমাণিক্য জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজদের সাহায্য নিয়ে আরাকানরাজ অমরমাণিক্যকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে অমরমাণিক্যের পুত্র জুঝা সিংহ নিহত হন। কথিত আছে যে আরাকানরাজ সিকন্দর শাহ (মেংফলুং) অমরমাণিক্যের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে তাদের মধ্যে আত্মকলহের সৃষ্টি করেন। ফলে ত্রিপুরার সেনাদল দুর্বল হয়ে যায়। এই সুযোগে আরাকান রাজ উদয়পুর অধিকার করেন ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে। আরাকানি বা মগরা উদয়পুরে অবাধলুণ্ঠন ও হত্যালীলা চালিয়ে আরাকানে প্রস্থান করে। ইতিমধ্যে অমরমাণিক্য আত্মরক্ষার্থে মনু নদীতীরস্থ তেঁতৈয়া নামক স্থানে পলায়ন করেন। কিন্তু সেখানেও তিনি শান্তিতে থাকতে পারেন নি। অমরমাণিক্যের এক শ্যালক ছত্রনাজির কুকিদের সাহায্য নিয়ে বিদ্রোহ করেন। অমরমাণিক্য এই বিদ্রোহ দমন করলেও বারংবার কুকি আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত মানসিক দিক থেকে ভারাক্রান্ত হয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। রাজধরমাণিক্যের ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের প্রাথমিক মুদ্রা থেকে মনে হয় যে অমরমাণিক্য ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে রালফ ফিচ নামক এক ইউরোপীয় পর্যটক সাতগাঁও থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন, "সাতগাঁও থেকে আমি ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম। মগদের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বর অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। রাক্ষিয়াং ও রামুরাজ্যের মগেরা ত্রিপুরাপতির চাইতে অধিক শক্তিশালী হওয়ায় চট্টগ্রাম বা পোর্টগ্রোন্ডা বারংবার রাক্ষিয়াং রাজার হাতে চলে যাচ্ছিল।" কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর রাজমালায় রালফ ফিচকে বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রালফ ফিচের ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দের বিবরণী থেকে

মনে হয় তিনি অমরমাণিক্যের রাজত্বকালেই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন।

রাজধরমাণিক্য

অমরমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজধরমাণিক্য (জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজদুর্লভ নারায়ণ অমরমাণিক্যের জীবিতকালেই মারা গিয়েছিলেন।) ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন এবং সেই বৎসর নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করেন। মগেরা উদয়পুর পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। সুতরাং রাজধরমাণিক্য উদয়পুরে পুনরায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি যুদ্ধবিগ্রহের চাইতে ঈশ্বরের আরাধনায় নিজেকে অধিক সময় নিযুক্ত রাখেন। তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং উদয়পুরে একটি বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরে তিনি আটজন ব্রাহ্মণ গায়ক নিযুক্ত করেন যাঁরা দিবারাত্র হরিসংকীর্তন করতেন। রাজমালায় বলা হয়েছে যে রাজধরমাণিক্যের রাজত্বের প্রতি অনাসক্তি মুঘলদের ত্রিপুরা আক্রমণে উৎসাহিত করে। মুঘলরা কৈলাগড় দুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েও শেষ পর্যন্ত বিনাযুদ্ধেই পলায়ন করে। কৈলাসচন্দ্র সিংহ অবশ্য বলেছেন যে রাজধরমাণিক্যের মন্ত্রী ও সৈন্যদের তৎপরতায় মুঘলরা পরাজিত হয়েছিল। সমসাময়িক অন্য কোনো লেখা থেকে এধরনের ঘটনার কথা জানা যায় না। অবশ্য তাঁর রাজত্বকালে মুঘল সেনাপতি মানসিংহ ঈশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে ত্রিপুরা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যদিও মানসিংহ আর ত্রিপুরা আক্রমণ করেন নি। রাজমালার মতে রাজধরমাণিক্য বারো বৎসর রাজত্ব করেন। কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে রাজধরমাণিক্য তিন বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু রাজধরমাণিক্যের ১৫০৮ সালের মুদ্রা এবং ঈশ্বরমাণিক্য ও যশোধরমাণিক্যের ১৫২২ সালের মুদ্রা থেকে অনুমিত হয় যে রাজধরমাণিক্য বারো বৎসরের অধিকাল রাজত্ব করেছিলেন।

ঈশ্বরমাণিক্য

রাজধরমাণিক্যের মৃত্যুর পর ঈশ্বরমাণিক্য নামে এক রাজা ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। রাজমালা প্রদত্ত রাজবংশ তালিকায় ঈশ্বরমাণিক্যের নাম দেওয়া নেই। রাজমালায় বলা হয়েছে রাজধরমাণিক্যের পর যশোধরমাণিক্য রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু ১৫২২ শকের (১৬০০ খ্রিঃ) ঈশ্বরমাণিক্যের মুদ্রা পাওয়া যাওয়ায় ঈশ্বরমাণিক্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। সম্ভবত রাজধরমাণিক্যের মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে রাজপরিবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল এবং রাজধরমাণিক্যের ভ্রাতা অমরদুর্লভ কিছুদিনের জন্য সিংহাসন অধিকার করে নিজ নামে ১৫২২' শকের মুদ্রা প্রচার করেন। তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

সমতল ত্রিপুরায় মুঘল আধিপত্য বিস্তার

যশোধরমাণিক্য

রাজধরমাণিক্যের পুত্র যশোধরমাণিক্য ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা হন। ঐ বৎসরের (১৫২২ শক) যশোধরমাণিক্যের মুদ্রাও পাওয়া গেছে। ওই বৎসরেই ঈশ্বরমাণিক্য নামে এক ত্রিপুরার রাজার মুদ্রা পাওয়া যাওয়ায় মনে হয় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ঈশ্বরমাণিক্য ও পরের দিকে যশোধরমাণিক্য সিংহাসনে বসেন। অথবা যশোধরমাণিক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ঈশ্বরমাণিক্য কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন। ১৫২২ শকের মুদ্রায় বংশীবাদক কৃষ্ণের মূর্তি দেখে বোঝা যায় যশোধরমাণিক্যও পিতার মতো বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। রাজমালায় বলা হয়েছে যশোধরমাণিক্য ভুলুয়া আক্রমণ ও জয় করেন।

যশোধরমাণিক্যের রাজত্বকালে বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খান ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। এইসময় মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গির আরাকানরাজকে পরাস্ত করার জন্য ইব্রাহিম খানকে আদেশ দেন। সম্ভবত আরাকান অভিযানের সুবিধার জন্যই ইব্রাহিম প্রথমে ত্রিপুরা জয়ের পরিকল্পনা নেন। রাজমালায় অবশ্য আছে যে ত্রিপুরার রাজা মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরকে কর হিসাবে হস্তি প্রদান করতে অস্বীকার করলে মুঘলরা ত্রিপুরা আক্রমণ করে। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে এই আক্রমণ ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল। কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার বহরোস্তান-ই -ঘায়েবিতে আক্রমণের তারিখ দেওয়া না থাকলেও বহরোস্তান-ই-ঘায়েবিতে দেওয়া পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সময়কাল থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই আক্রমণ ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল। রাজমালাতে এই আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। তাছাড়া সমসাময়িক মুঘল সেনাধ্যক্ষ মির্জা নাথন যিনি এই সময় বাংলাদেশে বেশ কিছু মুঘল অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর স্মৃতিকথা বহরোস্তান-ই-ঘায়েবি গ্রন্থেও এই অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। রাজমালা ও বহরোস্তান-ই-ঘায়েবির বিবরণ অনুযায়ী বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ফতে জং ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য বিপুল আয়োজন করেন। উদয়পুর আক্রমণের জন্য মুঘল স্থলবাহিনীকে দুভাগে বিভক্ত করা হল। একটি বাহিনী মির্জা ইসফানদিয়ার নেতৃত্বে ও

মুসাখানের সহযোগিতায় কৈলাগড় বা কসবা পথে, অপর বাহিনী মির্জা নুরুদ্দিনের নেতৃত্বে মেহেরকুল বা কুমিল্লার পথে যাত্রা করল। এছাড়াও নৌসেনাপতি বাহাদুর খান তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে কুমিল্লা হয়ে গোমতী নদী দিয়ে উভয় বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে উদয়পুরের দিকে যাত্রা করল। বহরোস্তান-ই-ঘায়েবির বর্ণনা মতো যখন দুই স্থলবাহিনীও নৌবাহিনী কৈলাগড় উপস্থিত হল তখন ত্রিপুরার রাজা তাঁদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নৈশ আক্রমণের পরিকল্পনা নিলেন। তিনি এক সহস্র অশ্বারোহী, ষাট হাজার পদাতিক এবং দুইশত হস্তি নিয়ে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে মির্জা ইসফানদিয়ার কৈলাগড় অতিক্রম করে উদয়পুরের সীমানায় এসে পৌঁছেছিলেন। ত্রিপুরার রাজা মধ্যরাত্রে তাঁকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে উভয়পক্ষেই বহু হতাহত হন। কিন্তু ভাগ্যবান সম্রাটের সৈন্যরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হন। ত্রিপুরার রাজা পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন। মুঘলবাহিনী সত্তরটি হস্তি হস্তগত করল। এটি মুঘল সেনাদের একটি বড়োরকমের জয় ছিল। উদয়পুর যাত্রার পথে রাজার সঙ্গে মির্জা নুরুদ্দিন ও মুসা খানের দ্বিতীয় দলটির সঙ্গেও যুদ্ধ হল। কিন্তু এখানেও ত্রিপুরার রাজা পরাজিত হয়ে দ্রুত উদয়পুর যাত্রা করলেন। ত্রিপুরার সৈন্যদের এই পরাজয়ের কারণ হিসেবে স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন যে যদিও ত্রিপুরার সেনাবাহিনী সংখ্যায় বেশি ছিল কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও সংগঠনের দিক থেকে মুঘলদের চাইতে দুর্বল ছিল এবং মুঘলদের দক্ষ বন্দুকধারী ও গোলন্দাজবাহিনী সহজেই তাদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। বহরোস্তান-ই-ঘায়েবির বিবরণ অনুযায়ী : রাজা উদয়পুরে পৌঁছোনোমাত্র মুঘল নৌবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য নদীপথে এক নৌবহর এবং স্থলবাহিনী প্রেরণ করলেন এবং মুঘল নৌবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্য নদীর উপর সেতু এবং নদীর দুইদিকে দুর্গ নির্মাণের আদেশ দিলেন। সর্দাররা রাজার আদেশ অনুযায়ী কাজ করলেন এবং শত্রুদের বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন কিন্তু সবই বৃথা হল এবং ত্রিপুরার সৈন্য মুঘল সেনাবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করতে পারে নি। মুঘলবাহিনী রাজধানী উদয়পুর অধিকার করে রাজার পশ্চাদ্ধাবন করল। রাজা পলায়নের সময় দুর্ভগ্যবশত নিজ সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। পশ্চাদ্ধাবনকারী মুঘল সৈন্যদের প্রতারিত করার জন্য রাজা হস্তিগুলি পরিত্যাগ করে গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু মুঘল সেনাও পদব্রজে পাহাড়ে প্রবেশ করল। প্রথমে মির্জা নুরুদ্দিন-এর ভৃত্য রাজ্যকে দেখতে পেয়ে পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হল। দুজনেই যখন আহত এবং ভৃত্যটি যখন রাজাকে বন্দি করার চেষ্টা করছিল সেই সময় মির্জা ইসফানদিয়ারের সেনা সেখানে এসে পড়ে এবং রাজাকে বন্দি করতে সাহায্য করে। রাজাকে সস্ত্রীক বন্দি করা হল এবং তাঁর হস্তিগুলিকে অনুসন্ধানের পর দখল করা হল। সস্ত্রীক রাজাকে ঢাকা বা জাহাঙ্গির নগরে জমিদারদের প্রধান ইশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ মসনদ-ই-আলির প্রভু খান ফতে জঙ্গের নিকট প্রেরণ করা হল। ত্রিপুরা রাজ্যের ভালো জলবায়ুও সৌন্দর্যের সংবাদ অবগত হয়ে খান

ফতে জং ত্রিপুরা পরিভ্রমণ করেন ও ত্রিপুরা রাজ্য সুনিয়ন্ত্রিত করে জাহাঙ্গির নগরে (ঢাকা) ফিরে আসেন। যশোধরমাণিক্যকে ঢাকায় ইব্রাহিম খানের দরবারে প্রেরণ করার পর তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। রাজমালায় বলা হয়েছে যে দিল্লি মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গির যশোধরমাণিক্যকে বার্ষিক করদানের বিনিময়ে রাজ্য ফেরত দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজ দেশের দুর্দশার কথা চিন্তা করে যশোধরমাণিক্য তা প্রত্যাখ্যান করে বারাণসী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। সম্ভবত মুঘল সাম্রাজ্যে নজরবন্দি হিসাবে থাকা অবস্থায় ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবনে বিষ্ণুর উপাসনা করে প্রাণত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে আড়াই বৎসর উদয়পুরের অবস্থানের পর মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটায় মুঘলবাহিনী উদয়পুর ত্যাগ করে চলে যায়। অধিকৃত সমতল অঞ্চল মুঘল রাজস্ব খাতায় 'সরকার উদয়পুর' হিসাবে লিখিত হয়।

কল্যাণমাণিক্য

যশোধরমাণিক্যের মৃত্যু হওয়ায় ত্রিপুরার সিংহাসন শূন্য হয়। যশোধরমাণিক্যের কোনো পুত্র না থাকায় উদয়পুরবাসী মহামাণিক্যের কনিষ্ঠপুত্র গগনফার বংশধর কছুফার পুত্র কল্যাণমাণিক্যকে ত্রিপুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে কল্যাণমাণিক্য নিজ নামে প্রথম মুদ্রা প্রচার করলেও ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই তিনি রাজা হয়েছিলেন মনে হয়। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রা প্রচার কবেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে কল্যাণমাণিক্য ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে এবং রাজমালার মতে ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন।

কল্যাণমাণিক্য একজন বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি ত্রিপুরাব ছিন্নভিন্ন সৈন্যদের একত্রিত করে সুশিক্ষিত করেন। মুঘলরা তাঁর সিংহাসন লাভের পূর্বে ত্রিপুরার যেসব অঞ্চল অধিকার করেছিল সেগুলি সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটাই পুনরুদ্ধার করে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ত্রিপুরার রাজকুমারদের ঠাকুর উপাধি প্রদানের প্রথা চালু করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দদেবকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। বাংলার সুবাদার সুজা ত্রিপুরা আক্রমণ করলেও কল্যাণমাণিক্য সে আক্রমণ প্রতিহিত করতে সক্ষম হন। মুঘলদের বিরুদ্ধে কল্যাণমাণিক্যের সাফল্য সমসাময়িক পর্যটক ও লেখকদের মন্তব্য দ্বারা সমর্থিত হয়। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে পিটার হেলস নামক এক ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে বদ প্রতিবেশী মুঘলদের অনবরত যুদ্ধ লেগে থাকত। ত্রিপুরা পাহাড় পর্বতময় বলে মুঘলদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম ছিল। ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত আজাদ অল হুসাইনির "নৌবহর-ই-মুরশিদ কুলিখানি" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে সে সুজার প্রধানমন্ত্রী জানবেগ খান সুজার নির্দেশ অনুযায়ী ত্রিপুরা অভিযান করেন। গভীর অরণ্য, উচ্চ দুর্গমালা এবং কষ্টসাধ্য যাতায়াত ব্যবস্থা

ত্রিপুরাকে দুর্ভেদ্য রাজ্যে পরিণত করেছিল। খানের লোকেরা এক বৎসর ধরে চেষ্টা করেও এই রাজ্যের একটি দুর্গও অধিকার করতে সমর্থ হয় নি। কেবলমাত্র মির্জাপুরের কয়েকটি জেলা অধিকার করেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয় এবং সেটাই মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা হিসাবে নির্দিষ্ট হল। প্রতিকূল জলবায়ুতে বহু মুঘল সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কল্যামাণিক্যের সমসাময়িক বানডিন ব্রোকে নামক এক ওলন্দাজ গভর্নর লিখেছিলেন : "ত্রিপুরা এবং উদয়পুর রাজ্য স্বাধীন, কিন্তু কোনো সময় মুঘল সম্রাট কখনো-বা আরাকানরাজ এটি অধিকার করেছেন।" সুজার শাসনকালে ১৫৮০ শকাব্দে (১৬৫৮ খ্রিঃ) সুবে বাংলার যে সংশোধিত রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করা হয়েছিল তাতে সরকার উদয়পুর রাজস্ব প্রদানকারী অঞ্চল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত রাজত্বের শেষ দিকে কল্যাণমাণিক্য সুজার নিকট পরাজিত হয়ে কিছুটা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সাফল্যের পর কুমিল্লায় সুজার নামে সুজা মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদের ব্যয়-নির্বাহের জন্য মসজিদ সংলগ্ন কয়েকটি গ্রাম ওয়াকফ্ সম্পত্তি বলে নির্দিষ্ট হয়। মসজিদ সংলগ্ন গ্রামগুলি সুজানগর নামে পরিচিত হয়। অবশ্য রাজমালার মতে গোবিন্দমাণিক্য সুজার সঙ্গে মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

কল্যাণমাণিক্য সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য ভ্রমণ করে ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্র প্রজাদের ভূমি ও অর্থদান করেছিলেন। তিনি তাম্রশাসন দ্বারা বহু নিষ্কর ভূমিও প্রদান করেছিলেন। কল্যাণমাণিক্যই ত্রিপুরার প্রথম রাজা যিনি বাংলা ভাষায় তাম্রশাসন প্রদান করেছিলেন। তিনি কসবা অঞ্চলে একটি বৃহৎ দিঘি খনন করেন যা কল্যাণসাগর নামে পরিচিত। কসবায় একটি মন্দির নির্মাণ করে—কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা ভগবতী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্তির নিম্নভাগে একটি শিবলিঙ্গ থাকায় মূর্তিটিকে অনেকে কালিকা মূর্তিও বলে থাকেন। তিনি উদয়পুরে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে গোপীনাথের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত কল্যাণপুর নগরটি তিনিই স্থাপন করেন। সেখানে একটি রাজপ্রাসাদ ও কালিকাদেবীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কল্যাণমাণিক্যের মুদ্রায় রানি কলাবতীর নাম পাওয়া যায়। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে আশি বৎসর বয়সে কল্যাণমাণিক্যের মৃত্যু হয়। কল্যাণমাণিক্যের মৃত্যুর পূর্ব থেকেই গোবিন্দমাণিক্য পিতার নামে রাজ্য পরিচালনা করেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রদত্ত এক তাম্রশাসনে সর্বপ্রথম ত্রিপুরাব্দ ব্যবহার দেখা যায়।

গোবিন্দমাণিক্য ও ছত্রমাণিক্য

কল্যাণমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন আরোহণ করেন। কল্যাণমাণিক্যের রাজত্বকালে গোবিন্দমাণিক্য যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনারোহণের পর ঐ বৎসরই গোবিন্দমাণিক্য নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন।

গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসনারোহণের পর থেকেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। কল্যাণমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের পূর্বেই গোবিন্দমাণিক্যের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু কল্যাণমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের পর নক্ষত্র রায়ের মাতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। নক্ষত্র রায়ের জন্ম কল্যাণমাণিক্যের সিংহাসনারোহণের পরে হয়েছিল বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দমাণিক্যের চাইতে তাঁর সিংহাসনের উপর দাবি অধিক যুক্তি-সঙ্গত বলে নক্ষত্র রায় মনে করেছিলেন। সুতরাং তিনি গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্ব অস্বীকার করে ছত্রমাণিক্য নাম নিয়ে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে নিজ নামেও মুদ্রা প্রচার করেন। তিনি কল্যাণমাণিক্যের রাজত্বের শেষ দিকে ঢাকায় মুঘল দরবারে রাজপ্রতিভূ হিসাবে অবস্থান করায় মুঘলদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়। এদিকে গোবিন্দমাণিক্য মন্দিরে বলিপ্রথা বন্ধ করার চেষ্টা করায় প্রধান পুরোহিত বা চন্তাই ও অনেকেরই বিরাগভাজন হন। ছত্রমাণিক্য এই সুযোগে গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করে ত্রিপুরার রাজা হন এবং ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। রাজমালায় আছে যে গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতৃযুদ্ধে অযথা রক্তক্ষয় করতে রাজি ছিলেন না। তিনি বিনাযুদ্ধে ছত্রমাণিক্যকে ত্রিপুরার সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু নক্ষত্র রায় বা ছত্রমাণিক্যের বংশধরদের কাছে যে রাজমালা রক্ষিত আছে তা থেকে জানা যায় যে গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে ছত্রমাণিক্যের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এটিই অধিক যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয়। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ছত্রমাণিক্য উদয়পুর অধিকার করতে পারেন নি। কারণ ঐ বৎসর গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁর ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুর উদয়পুরে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে কুমিল্লার নিকটবর্তী আমর্তলি গ্রামে গোবিন্দমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদেব ঠাকুরের সঙ্গে ছত্রমাণিক্যের তুমুল সংঘর্ষ হয়। কিন্তু এই সংগ্রামে রামদেব ঠাকুর পরাজিত হন।

ছত্রমাণিক্য ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনারোহণের পর স্বাধীনভাবে যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করেন। তিনি গোমতী নদীর তীরে এক প্রাসাদ নির্মাণ করেন। রাজমালা থেকে জানা যায় যে ছত্রমাণিক্য 'ছত্রসাগর' নামে এবং বৃহৎ দিঘি খনন করিছিলেন। কুমিল্লার নিকটবর্তী 'ছাত্রের খিল' ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত 'ছত্রপুর' প্রভৃতির নাম। তাঁর রাজত্বকালের সাক্ষ্যবহন করছে। মণিপুরের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ছত্রমাণিক্য ১৬৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মণিপুরের দরবারে একজন কন্যা ও এক হস্তি সহ দূত প্রেরণ করেছিলেন। ছত্রমাণিক্যের রাজত্বকালে টেভার্নিয়ার নামে একজন ইউরোপীয় পর্যটক বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে ত্রিপুরার রাজা ছত্রমাণিক্যের নাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। টেভার্নিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ আছে যে মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্বসীমা আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজ্য। টেভার্নিয়ারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরায় সে সময় একটি স্বর্ণখনি ও রেশমের কারখানা ছিল। এই স্বর্ণ ও তসর বাণিজ্যার্থে

বিদেশে প্রেরিত হত। তবে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উৎপাদিত স্বর্ণ ও রেশম ততটা বিশুদ্ধ ছিল না। ছত্রমাণিক্য সম্ভবত ছয় বৎসর রাজত্ব করেন।

সিংহাসনচ্যুত গোবিন্দমাণিক্য প্রথমে রিয়াংদের আশ্রয়ে বাস করেন। পরে চট্টগ্রামের পূর্বদিকস্থ পার্বত্য প্রদেশে বসবাস করেন। ইতিমধ্যে ঔরংজেবের কাছে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে বাংলার শাসনকর্তা সুজা সপরিবারে বাংলাদেশ থেকে পলায়ন করে পার্বত্য ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে আরাকানে আশ্রয় নেন। এইসময় সম্ভবত সুজার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের সাক্ষাৎ ঘটে এবং মিত্রতা স্থাপিত হয়। রাজমালায় উল্লেখ আছে সে সুজার কাছ থেকে গোবিন্দ মাণিক্য বহুমূল্য রত্নখচিত নিমচা তরবারি ও হীরকাঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সুজার নাম স্মরণীয় করার জন্য গোবিন্দমাণিক্য দ্বিতীয় বার সিংহাসন প্রাপ্ত হবার পর নিমচা তরবারি ও হীরকাঙ্গুরীয় বিক্রি করে সেই অর্থ দ্বারা কুমিল্লায় সুজা মসজিদ নির্মাণ ও মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য কয়েকটি গ্রাম দান করেন যা সুজানগর নামে পরিচিত হয়। কিন্তু অপর একটি মত অনুযায়ী কল্যাণমাণিক্যকে পরাজিত করে সুজা এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।

গোবিন্দমাণিক্য ছত্রমাণিক্য কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হবাব পূর্বেই বাংলার শাসনকর্তা সুজা আওরংজেবের কাছে পরাজিত হয়ে ত্রিপুরা হয়ে আরাকানে পলায়ন করেছিলেন। সুজা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করেছেন শুনে মুঘল সম্রাট আওরংজেব গোবিন্দমাণিক্যকে সুজার প্রত্যর্পণ দাবি করে একটি পত্র লিখেছিলেন। আগরতলা মহাকরণে সরকারি মহাফেজখানায় ফার্সি ভাষায় লিখিত গুরুত্বপূর্ণ এই পত্রটি সংরক্ষিত আছে। মহারাজকুমার সমরেন্দ্রকুমার দেববর্মা রচিত "ত্রিপুরার স্মৃতি" নামে গ্রন্থে যে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে তা এরূপ : "অতুলনীয় উচ্চকুলোদ্ভব সৌভাগ্যবান রাজ্যেশ্বর বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদর পঞ্চ শ্রীযুক্ত মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য বাহাদুর আল্লাতালা আপনার রাজ্য সুমঙ্গলে রক্ষা করুক। আমি সুনিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি যে, আমার চিরশত্রু, সুজা ভবদীয় রাজ্যে গোপনে অবস্থান করিতেছে। মদীয় পূর্বপুরুষের সম্মানিত মহোদয়গণের সঙ্গে আপনার গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষগণের পরস্পর আত্মীয়তা ও প্রণয় থাকা বশত আমাদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত আফগানের ভবদীয় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আপনার মহামান্য পূর্বপুরুষগণ অসি প্রহারে যেরূপ সেই দুষ্ট আফগানদিগকে বঙ্গদেশে বিতাড়িত করিতেন, বর্তমানে আমিও তদ্রূপ আশা করি আমার লিখনানুসারে আপনি উক্ত শত্রু (সুজাকে) ধৃত করিয়া সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করেন। যদি আপনার অভিমত হয় তবে আমার সেনাপতিকে মুঙ্গেরে অপেক্ষা করাইব। তাহাকে ধৃত করিবার পর আপনার সেনাপতির রক্ষণাবেক্ষণে সাবধানে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন— যেন প্রাচীন বন্ধুতা স্থায়ী রহে। নতুবা ইহা নিশ্চয় জানিবেন—আপনার রাজ্যে উক্ত অপরিণামদর্শীর অবস্থান করার জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্য সংঘটিত হইবে। আমার লিপি

অনুসারে কার্য হইবে বলিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।" এই চিঠিটির প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এই পত্রটি প্রাপ্ত হবার পূর্বেই সুজা ত্রিপুরা ত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং ঔরংজেবকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য গোবিন্দমাণিক্য ঔরংজেবের নিকট বশ্যতা স্বীকার পূর্বক বার্ষিক হস্তিকর দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

দীর্ঘদিন চট্টগ্রামে অবস্থানের পরে গোবিন্দমাণিক্য দ্বিতীয়বার ত্রিপুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজমালায় বলা হয়েছে যে ছত্রমাণিক্যের মৃত্যু হলে জনসাধারণের অনুরোধক্রমে গোবিন্দমাণিক্য উদয়পুরে এসে দ্বিতীয়বার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ত্রিপুরায় যে দুজন আহোমরাজের দূত এসেছিলেন তাদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ছত্রমাণিক্যকে নিহত করে গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছিলেন। সম্ভবত এ ব্যাপারে তিনি আরাকানরাজের সহায়তা পেয়েছিলেন। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দের গোবিন্দমাণিক্যের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমিত হয় গোবিন্দমাণিক্য অন্তত ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে বা তার কিছু পূর্বে দ্বিতীয় বারের মতো ত্রিপুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে সরকারি কর্মচাবীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রিয়াং সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে। গোবিন্দমাণিক্য রিয়াংদের প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন না। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হয়ে তিনি যখন সপরিবারে রিয়াংদের এলাকায় বসবাস করছিলেন সেই সময় রিয়াংরা গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি বিশেষ আনুগত্যপূর্ণ ব্যবহার করে নি। এর দুটি কারণ হতে পারে, হয়তো রিয়াংরা ছত্রমাণিক্যের অনুগত থাকতে চাইছিল অথবা গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁর সহচরদের চাহিদা রিয়াংদের আর্থিক সংগতিকে ভারাক্রান্ত করেছিল। ফলে গোবিন্দমাণিক্য রিয়াংদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাঁর রাজত্বকালে কিছু সংখ্যক রিয়াং বন থেকে বাঁশ সংগ্রহ করে নদীপথে ভাসিয়ে আনার সময় রাজসরকার কর্তৃক প্রদত্ত নদীপথের অবরোধ রজ্জু ছিন্ন করে দেয়। এই রজ্জু রাজসরকার কর্তৃক গঙ্গাপূজা উপলক্ষে নদীপথে অবরোধ কল্পে লাগানো হয়েছিল। রাজসরকারের এই রীতি লঙ্ঘনকে কেন্দ্র করে রাজকর্মচারীদের সঙ্গে রিয়াংদের বিবাদ শুরু হয়। সম্ভবত বিয়াংদের বনজ সম্পদের উপর শুল্ক বৃদ্ধির ফলে রিয়াংদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। নদীপথে বাঁশ আনার সময় তা অবরোধ করে রাজকর্মচারীদের রিয়াংদের কাছে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করার চেষ্টা করলে এই বিরোধের সূত্রপাত হয় বলেই মনে হয়। গঙ্গাপূজার ঘটনা উপলক্ষ মাত্র। হয়ত এই কাহিনী রাজপক্ষকে সমর্থনের জন্য সংযোজিত হয়েছিল। রিয়াং বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য প্রেরিত হল। বিদ্রোহী রিয়াংদের কয়েকজন সর্দারকে বন্দি করে উদয়পুর নিয়ে আসা হয়। গোবিন্দমাণিক্য তাঁদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী রানি গুণবতী বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। রিয়াংসর্দারদের প্রাণদণ্ড দিলে রিয়াং বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে আশঙ্কা করে তিনি মহারাজ ও রিয়াং সর্দারদের মধ্যে

মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য

একটা আপস করতে যত্নবান হলেন। তিনি রাত্রিকালে রিয়াং সর্দাদের সঙ্গে দেখা করে রাজদ্রোহিতার কুফল সম্পর্কে তাদের বুঝিয়ে বলেন। বন্দিরা তাঁকে মা হিসাবে সম্বোধন করলে তিনিও তাদের সন্তান হিসাবে সম্বোধন করলেন এবং নিজ স্তনদুগ্ধ পূর্ণ একটি পাত্র রিয়াং সর্দারদের হাতে তুলে দেন। তাঁরা এই দুগ্ধ পান করে রানির নির্দেশ অনুযায়ী ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। দুগ্ধ পান ছাড়াও একটি প্রস্তর খণ্ড প্রতিজ্ঞার নিদর্শন স্বরূপ তাদের দেওয়া হয়। গোবিন্দমাণিক্য তাদের আনুগত্যের বিনিময়ে সকলকে মুক্তি দিলে রিয়াং বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। শ্রীরাজমালায় বর্ণিত এই ঘটনার বিবরণ কতটা সত্য তা বলা কঠিন। তবে এই বিদ্রোহ প্রশমনে রানি গুণবতী যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সে বিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়বার সিংহাসন প্রাপ্তির পর গোবিন্দমাণিক্য নানা সৎকার্যের দ্বারা বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গোবিন্দমাণিক্য ছত্রমাণিক্যের পুত্র উৎসবরায়কে কয়েকটি পরগনা বৃত্তি হিসাবে দান করেছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের চেষ্টায় মেহেরকুল বিশেযরূপে আবাদ হয়েছিল। ইতিপূর্বে গোমতীর জলপ্রাবণে তীরস্থ শস্য ক্ষেত্র সর্বদা বিনষ্ট হত। গোবিন্দমাণিক্য 'গাংগাইল' নামে বাঁধ নির্মাণ করে শস্যক্ষেত্র রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের তাম্রশাসন দ্বারা বহু নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। তাম্রশাসনগুলি বাংলাভাষায় লিখিত ছিল। চন্দ্রনাথে গোবিন্দমাণিক্য একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন। উদয়পুরে গোমতী নদীর তীরে গোবিন্দমাণিক্য ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর মহিষী গুণবতী ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুরে একটি বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কসবা থানার অন্তর্গত জাজিয়াড়া নামক গ্রামে রাণী গুণবতী দিঘি খনন করেন যা 'গুণসাগর' দিঘি নামে পরিচিত হয়। গোবিন্দমাণিক্যের ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুরও একটি দিঘি খনন করেন এবং এই দিঘিটি জগন্নাথ দিঘি নামে পরিচিত হয়। উদয়পুরে জগন্নাথ দিঘি সংলগ্ন জগন্নাথ মন্দিরটিও জগন্নাথ ঠাকুর নির্মাণ করেন। রাজমালার বিবরণ থেকে জানা যায় যে গোবিন্দমাণিক্য এক বণিকের কাছ থেকে হস্তির বিনিময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে লবণ আমদানি করিয়েছিলেন। তিনি প্রতি কানি জমির রাজস্ব চার আনা ধার্য করেন। "বৃহৎনারদ পুরাণ" গ্রন্থটি তিনি বাংলাভাষায় অনুবাদ করিয়েছিনেল। রাজমালার তৃতীয় খণ্ড গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে সংকলিত হয় বলে উল্লেখিত আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও 'বিসর্জন' নাটক গোবিন্দমাণিক্যকে অমর করে রেখেছে। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দমাণিক্যের মৃত্যু হয়।

রামদেবমাণিক্য

গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামদেবমাণিক্য সম্ভবত রাজা হন ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে। কারণ ওই বৎসরই তিনি প্রথম মুদ্রা নিজ নামে প্রচার করেন। রাজমালা থেকে জানা যায় যে

রামদেবমাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারিকানাথ ঠাকুর রামদেবমাণিক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নরেন্দ্রমাণিক্য উপাধিগ্রহণ করেন। সরাটল-এর জমিদার নাসিরমহম্মদের সহায়তায় ত্রিপুরার সিংহাসনও অধিকরে করেন। রামদেবমাণিক্য বাংলার নবাবের সাহায্যে ত্রিপুরার সিংহাসন পুনুরুদ্ধার করেন। নরেন্দ্রমাণিক্যকে বন্দি করে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রামমাণিক্যের তেরো জন পুত্রের মধ্যে চারজন পুত্র জীবিত ছিলেন। এঁরা হলেন রত্নদেব, দুর্জয়সিংহ, ঘনশ্যাম এবং চন্দ্রমণি। রামদেবমাণিক্য জ্যেষ্ঠপুত্র রত্নদেব বা রত্নমাণিক্যকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার মনোনীত করেন এবং বড়ঠাকুর নামক নতুন পদ সৃষ্টি করে দ্বিতীয় পুত্র দুর্জয়সিংহকে প্রদান করেন। রত্নমাণিক্য বয়সে বালক ছিলেন বলে রামদেবেমাণিক্য নিজ শ্যালক বলিভীম নারায়ণকে রত্নমাণিক্যের অভিভাবক নিযুক্ত করেছিলেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের বিবরণ থেকে জানা যায় যে রামদেবমাণিক্য নিজ শ্যালক বলিভীম নারায়ণকে যুবরাজ পদ প্রদান করেছিলেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ''শ্যালককে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করা জগতের ইতিহাসে একটি নূতন দৃষ্টান্ত বটে।'' ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরটির প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। রামদেবমাণিক্য ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে মন্দিবটি সংস্কার করেন। রত্নমাণিক্যের প্রাচীনতম ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে মনে হয় ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দ বা তার কিছু পূর্বে রামদেবমাণিক্যের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য

রামদেবমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রত্নমাণিক্য ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা হন। ওই বৎসর তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। ওই সময় তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বৎসর। অবশ্য ত্রিপুরা বুরঞ্জি মতে রত্নমাণিক্য সাত বৎসব বয়সে রাজা হন। তাঁর রাজত্বকালে রাজপরিবারে ষড়যন্ত্রে ও সংঘর্ষে পূর্ণ।

'চম্পক বিজয়' নামক সমসাময়িক ইতিহাসমূলক কাব্য থেকে জানা যায় যে রত্নমাণিক্য নাবালক হওয়া তাঁর মাতুল বলিভীম নারায়ণ অভিভাবক হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। কিন্তু তিনি রত্নমাণিক্যকে নিরাপদ রাখার জন্য অন্যান্য সিংহাসনের দাবিদারদের অনেককেই হত্যা করেন। এইসময় শায়েস্তা খানের পরিবর্তে বাহাদুর খান বাংলার সুবাদার হয়ে এলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বাংলার অন্যান্য রাজা ও জমিদাররা তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। বলিভীম নারায়ণ দরবারে উপস্থিত না হওয়ায় বাহাদুর খান তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি পূর্বের নিয়মিত বার্ষিক তিনটি হস্তিকর ছাড়াও আরো অর্থ ও হস্তি দাবি করেন। বলিভীম তা দিতে বিলম্ব করায় তাঁকে বন্দি করে সুবাদারের দরবারে আনা হয়। শেষ পর্যন্ত ইসলামধর্ম গ্রহণ করে তিনি নিষ্কৃতি পান।

বলিভীম নারায়ণের পতনের পর রামদেবমাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রমাণিক্য দ্বিতীয়বার

সিংহাসন দাবি করেন এবং সুবাদারকে পূর্বের চাইতে অতিরিক্ত হস্তিকর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন এবং মুঘলদের সাহায্য নিয়ে ত্রিপুরার রাজা হন। ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে নিজ নামে মুদ্রাও প্রচার করেন। তিনি স্নেহবশত রত্নমাণিক্যকে হত্যা না করে নজরবন্দি করে রাখেন। কিন্তু তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না। ফলে জনসমর্থন নিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুরের পুত্র চম্পকরায় সেনাপতি মির খানের সহায়তায় চণ্ডীগড়ের যুদ্ধে নরেন্দ্রমাণিক্যকে পরাজিত করে সিংহাসনচ্যুত করেন। চম্পক রায় রত্নমাণিক্যকে ত্রিপুরার সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে নিজে যুবরাজ নিযুক্ত হন। নরেন্দ্রমাণিক্য সম্ভবত দুই বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

চম্পক রায় যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি মুঘলদের বার্ষিক হস্তিকর প্রদান করা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তাঁর একনায়কতন্ত্র অনেকেরই বিরক্তি ও ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চম্পক রায়ের বিরোধীরা রত্নমাণিক্যকে চম্পক রায়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনলে রত্নমাণিক্য তাঁকে বন্দি করে হত্যা করেন। চম্পক রায়ের পতনের পর রত্নমাণিক্য নিজ হস্তে রাজ্যশাসনের ভার নেন। তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দুর্জয় সিংহকে যুবরাজ এবং ঘনশ্যামকে বড়ঠাকুর নিযুক্ত করেন। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমণিকে বাংলার সুবাদারের দরবারে রাজ প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। ত্রিপুরায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। রত্নমাণিক্য মুঘলদের হস্তিকর প্রদান করে নাম মাত্র বশ্যতা স্বীকার করলেও কার্যত স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করছিলেন। মেজর স্টুয়ার্ট তাঁর রচিত 'বাংলার ইতিহাসে' লিখেছেন "যদিও ইতিপূর্বে মুসলমানদের বাহুবলে ত্রিপুরা লুণ্ঠিত ও বিজিত হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নি। ত্রিপুরেশ্বর স্বাধীন ছত্র ধারণ পূর্বক নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করতেন। ১৭০৭-৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা নবাব মুরশিদকুলী খাঁয়ের প্রবল বিক্রম কাহিনি শুনে তাঁকে হস্তি ও হস্তিদন্ত প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করেন। তার বিনিময়ে নবাব ত্রিপুরার রাজাকে "খেলাত" প্রদান করেছিলেন। প্রতিবৎসর ত্রিপুরার রাজা নবাবকে যেরূপ উপঢৌকন প্রেরণ করতেন নবাবও সেরূপ তাঁকে 'খেলাত' প্রদান করতেন। সময়ের দিক থেকে বিচার করলে মুরশিদকুলি তখন বাংলার দেওয়ান ছিলেন, তখনও নবাব হন নি। সেই সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন আজিম-উস-সান। অবশ্য দেওয়ান হিসাবে মুরশিদকুলিই রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং আজিম-উস-সানের সঙ্গে কলহ হেতু ঢাকা থেকে রাজস্ব দপ্তর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করছিলেন। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির বাদশাহ্ প্রথম শাহ্ আলম এক প্রতিনিধির মারফত রত্নমাণিক্যের সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়।

দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে আসামের রাজা রুদ্রসিংহ ত্রিপুরার রাজারা সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে রতন কন্দলি ও অর্জুন দাস বৈরাগী নামক দুজন রাজদূতকে আনন্দিরাম মেধি নামক এক বাঙালি গায়কের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজদরবারে

প্রেরণ করেন। রুদ্রসিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার রাজা কোনো সাহায্য করবেন কিনা সে সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তিনি তাদের ত্রিপুরায় প্রেরণ করেছিলেন। রতন কন্দলি ও অর্জুন দাস বৈরাগীকে রত্নমাণিক্য সাদরে গ্রহণ করেন। রত্নমাণিক্যও ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে রামেশ্বর ভট্টাচার্য ন্যায়লঙ্কার ও উদয়নারায়ণ বিশ্বাসকে ত্রিপুরার রাজপ্রতিনিধি হিসাবে আসামে প্রেরণ করেন। আসামের রাজা রুদ্রসিংহ আসামের রাজধানী রংপুরে ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে সাড়ম্বরে তাঁদের গ্রহণ করেন। এরপর রুদ্রসিংহ রতন কন্দলি ও অর্জুন দাস বৈরাগীকে দ্বিতীয়বার ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল রাজ রত্নমাণিক্য তাঁদের গ্রহণ করলে তাঁরা রুদ্রসিংহের একটি গোপন পত্র রাজাকে দেন। তাতে ত্রিপুরার রাজ্য তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শ করে মুঘলদের বিরুদ্ধে রুদ্রসিংহকে কতটা সাহায্য করতে পারবেন তা রুদ্রসিংহকে জানাতে অনুরোধ করা হয়। উদয়পুর থাকাকালে আসামের দূতদ্বয় ও তাঁদের সহযোগীরা ত্রিপুরার মদন উৎসব উপভোগ করেন। ১৭০৯ থেকে ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁরা তিনবার ত্রিপুরায় দূত হিসাবে আগমন করেছিলেন। তাঁদের লেখা 'ত্রিপুরা দেশর কথা লেখ' গ্রন্থ থেকে ত্রিপুরা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

রত্নমাণিক্য কুমিল্লার নিকটবর্তী জগন্নাথপুর গ্রামে 'সতেরো রত্নের' মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে শেখ মেহেদি সেনাপতি মিরখানের পৃষ্ঠপোষকতায় 'চম্পক বিজয়' নামক চম্পক রায়ের জীবনগাথা রচনা করেছিলেন। রতন কন্দলি ও অর্জুন দাস বৈরাগীর অবস্থানকালে ত্রিপুরার রাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যকে তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর সিংহাসনচ্যুত করে মহেন্দ্রমাণিক্য উপাধি ধারণপূর্বক ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। আসামের এই রাজদূতরা রাজপ্রাসাদের এই ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ তাঁদের লেখা 'ত্রিপুরা দেশর কথা লেখ' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। সমসাময়িক বিবরণী হিসাবে এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর রত্নমাণিক্যের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিলেন। কারণ রত্নমাণিক্য নিজ শ্যালক কবিশেখর নারায়ণকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং নিজ ভগিনীর সঙ্গে রাজদুর্লভ নারায়ণের বিবাহ দিয়ে তাঁকে অনেক উচ্চসম্মান দান করে কোতয়াল মুসিব নিযুক্ত করেন। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর সিংহাসন অধিকারের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তিনি মুরাদ বেগ নামক এক মুঘলের সহযোগিতা লাভ করেন। মুরাদ বেগের বিবাহিতা ভগিনীকে রত্নমাণিক্য অসম্মান করেছিলেন বলে মুরাদ বেগ রত্নমাণিক্যের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে মুরাদবেগ ঢাকায় লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর এই সময় মুঘলদের

প্রাপ্য হস্তিকর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অন্যবৎসরের তুলনায় অধিক লোকজনসহ খণ্ডল পরগণায় অবস্থান করতে থাকেন। মুরাদবেগের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মামুদ সাপি নামক মুঘল কর্মচারী ত্রিপুরা রাজের কাছ থেকে প্রাপ্য হস্তিকর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে ত্রিপুরা অন্য বৎসরের তুলনায় অধিক লোকজন সহ খণ্ডল পরগনায় অবস্থান করতে থাকেন। মুরাদ বেগের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মামুদ সাপি নামক মুঘল কর্মচারী ত্রিপুরা রাজের কাছ থেকে প্রাপ্য হস্তিকর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে ত্রিপুরা অভিযানে যাত্রা করেন। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর মামুদ সাপির সমর্থনলাভ করতে সমর্থ হন। রত্নমাণিক্যের শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। কিন্তু রত্নমাণিক্য তাঁদের কথা বিশ্বাস করেন নি এবং কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন নি। সুতরাং ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর ষড়যন্ত্র সফল করার পূর্ণ সুযোগ পান। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর মুরাদ বেগের সঙ্গে রত্নমাণিক্যের আপষ মীমাংসার অজুহাতে মুরাদ বেগ ও মামুদ সাপির সঙ্গে সসৈন্যে উদয়পুর আগমন করেন। রত্নমাণিক্য যুবরাজ দুর্জয় সিংহ ও রাজদুর্লভ নারায়ণকে তাঁদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুরাদ বেগের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেরণ করলে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর তাঁদের বন্দি করেন। যুবরাজ দুর্জয় সিংহ মামুদ সাপিকে দশ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়ে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি রাজাকে সমস্ত ঘটনা অবগত করলেও রাজার ঘনশ্যামের প্রতি বিশ্বাস অটুট থাকে। এই অবস্থায় ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর সসৈন্যে রত্নমাণিক্যের দরবারে প্রবেশ করেন এবং সিংহাসনে উপবিষ্ট রত্নমাণিক্যকে বলপূর্বক সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং মহেন্দ্রমাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাটি ঘটে সোমবার ১০ই মে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে এবং আসামের রাজদূতদ্বয়ের চোখের সামনেই। সিংহাসনচ্যুত রত্নমাণিক্যকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। রত্নমাণিক্যের ভগিনীপতি কোতয়াল মুসিব রাজদুর্লভ নারায়ণের প্রতি ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর পূর্ব থেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। সুতরাং রাজদুর্লভ নারায়ণকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। নতুন রাজার অনুমতি নিয়ে তাঁর পত্নী মৃত স্বামীর সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সতীত্ব বরণ করেন। এইসময় মহেন্দ্রমাণিক্যের প্রাসাদ এক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হলে গঙ্গানারায়ণী নামে প্রাসাদের এক ধাত্রী— মহেন্দ্রমাণিক্যকে উপদেশ দেয় যে রত্নমাণিক্যকে জীবিত রাখলে নানা অঘটন ঘটতে পারে সুতরাং তাকে হত্যা করা উচিত। গঙ্গানারায়ণীর পরামর্শ মতো রত্নমাণিক্যকে হত্যা করেন এবং গোমতী নদীর তীরে তাঁর দেহের সৎকার করেন। রত্নমাণিক্যের পত্নীরা রত্নমাণিক্যের মাতার অনুমতি নিয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় আরোহণ করে সতীত্ব বরণ করেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের একশত পঁচিশ জন পত্নী ছিলেন এবং সকলেই ছিলেন নিঃসন্তান। মহেন্দ্রমাণিক্য এই হত্যাকাণ্ডের পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য বহু ব্রাহ্মণকে দানধ্যান করেন।

মহেন্দ্রমাণিক্য

ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করে মহেন্দ্রমাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি চন্দ্রমণিকে বড়ঠাকুর নিযুক্ত করেন। দুর্জয়সিংহ যুবরাজ পদেই বহাল থাকেন। নতুন রাজা আসামের রাজদূতদ্বয়কে ২৪শে জুলাই ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে রাজদরবারে সাক্ষাৎ করেন এবং ত্রিপুরার দূত হিসাবে অরিভীম নারায়ণকে উপঢৌকন ও পত্র সহ আসামের রাজদূত দ্বয়ের সঙ্গে ১৮ই জানুয়ারি ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে অহোম রাজদরবারে প্রেরণ করেন। মহেন্দ্রমাণিক্য অহোমরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব যাতে সুদৃঢ় হয় পত্রে ও দূতের মারফত তা উল্লেখ করেন। ত্রিপুরার দূত আসামের রাজদরবার থেকে পত্র ও উপহার সহ ১৭১৪ সালের ৭ই এপ্রিল ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মহেন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যু ঘটে। তিনি মাত্র ১৪ মাস রাজত্ব করেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে মহেন্দ্রমাণিক্য দুই বৎসর রাজত্ব করেন।

দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য

মহেন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতা যুবরাজ দুর্জয়সিংহ ধর্মমাণিক্য উপাধি ধারণ করে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন।

অহোম রাজা রুদ্রসিংহ রতন কন্দলি ও অর্জুন দাস বৈরাগীকে তৃতীয়বার রাজদূত হিসাবে ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য তাঁদের ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মে সাদরে গ্রহণ করেন। ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে দূতদ্বয় ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। ধর্মমাণিক্য তাঁদেরকে রাজা রুদ্রসিংহের জন্য উপহার ও পত্র দেন। অহোমরাজের সঙ্গে ধর্মমাণিক্যের বন্ধুত্ব যাতে অটুট থাকে তার প্রতিশ্রুতি দেন। এবার ত্রিপুরা থেকে কোনো দূত প্রেরিত হয় নি।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র সিংহের রাজমালা থেকে জানা যায় যে ধর্মমাণিক্যের সিংহাসন আরোহণের অল্পদিনের মধ্যে বাংলার নবাব ধর্মমাণিক্যকে পরাজিত করে ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র অধিকার করে সেখানে মুঘল বংশীয় জমিদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ধর্মমাণিক্য যুদ্ধে জয় লাভ করে মুঘল জমিদারকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। এই ঘটনার পর বাংলার নবাব ধর্মমাণিক্যের সঙ্গে যে সন্ধি করেন তাতে স্থির হয় যে ধর্মমাণিক্য কেবল নুরনগর পরগনার জন্য বার্ষিক পঁচিশ সহস্র মুদ্রা কর হিসাবে দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু মুঘল সম্রাট স্বয়ং নুরনগরকে সামরিক জায়গির হিসাবে গণ্য করে বার্ষিক রাজস্ব পঁচিশ হাজার টাকা রেহাই করে দিয়েছিলেন।

রাজমালা থেকে জানা যায় যে ছত্রমাণিক্যের বংশধর জগৎরাম ত্রিপুরার সিংহাসন

দখল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে জগৎরাম পাঠপাশা পরগনার জমিদার আকাসাদিকদের শরণাপন্ন হন। আকাসাদিক জগৎমাণিক্যকে সমর্থন করে মুঘল কর্মচারী মিরহাবিবকে ত্রিপুরা আক্রমণে প্ররোচিত করেন। মিরহাবিব ত্রিপুরা জয়ের সম্ভাবনা লক্ষ করে ঢাকার নায়েব নাজিমের অনুমতি নিয়ে এক বিশাল মুঘলবাহিনী সহ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। মিরহাবিব ত্রিপুরার রাজা সতর্ক হবার পূর্বেই ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং জগৎরাম পথ প্রদর্শকের কাজ করায় সহজেই মুঘলবাহিনী উদয়পুর প্রবেশ করে। চণ্ডীগড় দুর্গ মুঘলদের হস্তগত হয়। অপ্রস্তুত রাজা আত্মরক্ষার্থে পর্বতমধ্যে আশ্রয় নেন। এইভাবে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য মুঘলদের দ্বারা অধিকৃত হল। বাংলার নবাবকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে জগৎরামকে ত্রিপুরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হল। জগৎরাম জগৎমাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন। জগৎমাণিক্যকে রক্ষা করার জন্য একদল মুঘল সৈন্য উদয়পুরে অবস্থান করতে থাকে এবং আকাসাদিক উদয়পুরের (কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে কুমিল্লার) ফৌজদার নিযুক্ত হন। মির হাবিবের ত্রিপুরা অভিযানের বর্ণনা তারিখ-ই-বাঙ্গালা ও রিয়াজ-উল-সালাতিন নামক গ্রন্থে দেওয়া আছে। মির হাবিবের ত্রিপুরা অভিযানের কয়েক সপ্তাহ পরে লিখিত 'নৌবহর-ই-মুরশিদকুলিখানি' গ্রন্থে আছে যে মিরহাবিবের সেনাদল ঢাকা, জয়ন্তিয়া ও চট্টগ্রাম এই তিন দিক থেকে একযোগে সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। প্রবল প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা বিজয় সম্ভব হয়েছিল। রাজা পর্বতে পলায়ন করলেও শেষ পর্যন্ত বন্দি হয়ে ঢাকায় প্রেরিত হন। নৌবহর-ই-মুরশিদকুলিখানি গ্রন্থ অনুযায়ী এই আক্রমণ ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়। স্টুয়ার্ট তাঁর 'বাংলার ইতিহাসে' আক্ষেপ করে বলেছেন "স্মরণাতীত কাল থেকে যে ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল তা আজ মুঘলদের অধীন হল।" নবাব সুজাউদ্দিন মির-হাবিবের সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে খান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ত্রিপুরায় মুগলদের অধিকৃত সমতল অঞ্চলের নাম রাখেন রোশনাবাদ যা চাকলা রোশনাবাদ নামে পরিচিত হয়। চাকলা রোশনাবাদের বার্ষিক ৯২৯৯৩ টাকা কর ধার্য করে জগৎমাণিক্যকে এই অঞ্চল জমিদারি স্বরূপ দান করা হয়। এই রাজস্বের মধ্যে দিল্লির সম্রাটের পূর্ব আদেশ মতো নুরনগর পরগনা সামরিক জায়গির হিসাবে বার্ষিক ২৫০০০ টাকা এবং হস্তি ধৃত করার খরচ বাবদ ২০০০০ টাকা মোট ৪৫০০০ টাকা বাদ দিয়ে মোট ৪৭৯৯৩ টাকা আদায়ী রাজস্ব ধার্য করা হয়। ত্রিপুরার পর্বত্য অঞ্চল রাজস্ব আদায় থেকে বহির্ভূত রাখায় পার্বত্য অঞ্চলের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। ধর্মমাণিক্য মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের সহায়তায় নবাব সুজাউদ্দিনের কাছ থেকে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি প্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় চাকলা রোশনাবাদের রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা যার মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা সামরিক জায়গীর বাবদ এবং কুড়ি হাজার টাকা হস্তি ধৃত করার খরচ বাবদ মোট পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বাদ

দেওয়া হয়েছিল। ধর্মমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হলেও চাকলা রোশনাবাদের জন্য বাংলার নবাবের অধীনস্থ জমিদার হিসাবে পরিণত হন। দ্বিতীয় বার সিংহাসন প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই সম্ভবত ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে ধর্মমাণিক্য প্রাণত্যাগ করেন। ধর্মমাণিক্য মুঘল আক্রমণে যখন বিপর্যস্ত সেইসময় মণিপুর রাজ পামহেইবা ত্রিপুরার উত্তর সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ ও অধিকার করেন। এই সাফল্যের জন্য পামহেইবাকে 'তাখেলঙাম্বা' অর্থাৎ 'ত্রিপুরা বিজয়ী' আখ্যায ভূষিত করা হয় এবং এই উপলক্ষে মণিপুরে 'তাখেলঙাম্বা' অর্থাৎ 'ত্রিপুরা বিজয়' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করা হয়।

ধর্মমাণিক্য প্রজাদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলেন। তিনি বেশ কিছু নিষ্কর জমি ব্রাহ্মণদের দান করেন। মেহেরকুল, ছত্রগ্রাম, কসবা ও ধর্মপুরে কয়েকটি দিঘি খনন করেন। তিনি মহাভারতের বাংলা পদ্যানুবাদ করিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

নক্য

দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা চন্দ্রমণি মুকুন্দমাণিক্য উপাধিধারণ পূর্বক ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহন করেন। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মুকুন্দমাণিক্যের ১১৩৯ ত্রিপুরাব্দ বা ১৭২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দের একটি সনদের উল্লেখ করেছেন। এই সনদের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে মুকুন্দমাণিক্য ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে অন্তত ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা হন।

মুকুন্দমাণিক্য তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুরকে মুর্শিদাবাদের দরবারে প্রতিভূ হিসাবে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। উদয়পুরে হাজিমাসুম নামে এক মুঘল ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় থেকে চাকলা রোশনাবাদের বার্ষিক রাজস্ব ৭৮,৩০৫ টাকা ধার্য হয়। সামরিক জায়গির ও হস্তি ধৃত খরার খরচ বাবদ মোট ৪৫,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৩৩,৩০৫ টাকা নিয়মিত বার্ষিক রাজস্ব দিতে হত। গোবিন্দমাণিক্যের ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র সুবা রুদ্রমণি ঠাকুর গোপনে পার্বত্য সর্দারদের সহায়তায় একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করে উদয়পুরে ফৌজদার ও তাঁর অনুচরদের হত্যার পরিকল্পনা করেন। এ সম্পর্কে তিনি মুকুন্দমাণিক্যকে অবহিত করলে মুকুন্দমাণিক্য মুর্শিদাবাদে জ্যেষ্ঠপুত্র পাঁচকড়ির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ফৌজদারকে এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও ফৌজদার মুকুন্দমাণিক্যও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন সন্দেহ করে তাঁকে সপরিবারে বন্দি করেন। অপমান ও হতাশায় মুকুন্দমাণিক্য বিষপানে আত্মহত্যা করেন। মুকুন্দমাণিক্য সম্ভবত দশ বৎসর (১৭২৯—১৭৩৮ খ্রিঃ) রাজত্ব করেন। তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি বর্ণের ব্যক্তিদের বহু নিষ্কর জমি দান করেছিলেন।

জয়মাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্য

রুদ্রমণি একটি জাতীয় সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে উদয়পুর অবরোধ করেন। উদয়পুরের মুঘল ফৌজদার এই আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে রুদ্রমণির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে উদয়পুর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। রুদ্রমণির এই সাহসিকতার জন্য জনসাধারণ মুকুন্দমাণিক্যের পুত্রের পরিবর্তে রুদ্রমণিকেই তাদের রাজা নির্বাচিত করে। রুদ্রমণি জয়মাণিক্য উপাধি নিয়ে ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা হন এবং ঐ বৎসর তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। এদিকে মুকুন্দমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি সেই সময় মুর্শিদাবাদে ত্রিপুরার রাজার প্রতিভূ হিসাবে অবস্থান করছিলেন। তিনি বাংলার নবাবের সাহায্য লাভ করে ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন এবং ইন্দ্রমাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। জয়মাণিক্য উদয়পুর থেকে বিতাড়িত হয়ে মতাই পাহাড়ে তাঁর প্রশাসন কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি স্থানীয় জমিদারদের সহযোগিতায় ঘনঘন উদয়পুর আক্রমণ করে ইন্দ্রমাণিক্যকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিলেন। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের এক পুত্র গঙ্গাধর ঢাকার নায়েব নাজিমের নিকট থেকে সনদ নিয়ে ত্রিপুরার রাজা হবার চেষ্টা করেন। উদয়মাণিক্য নাম নিয়ে অল্পকালের জন্য রাজাও হন। ইতিমধ্যে তিনি উদয়মাণিক্যকে কুমিল্লা থেকে বিতাড়িত করে সমগ্র ত্রিপুরা পুনরুদ্ধার করেন। জয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হরিমণি ঠাকুর বাংলার নবাবের সনদ লাভ করে বিজয়মাণিক্য উপাধি নেন এবং ত্রিপুরার রাজা হন। ইন্দ্রমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ কৃষ্ণমণি জয়মাণিক্য ও বিজয়মাণিক্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নবাবকে নিয়মিত রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে তাঁকে বন্দি করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। সম্ভবত তিনি পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

সমশের গাজির উত্থান ও পতন

অষ্টাদশ শতাব্দীর ত্রিপুরার প্রজাবিদ্রোহের ইতিহাসে সমশের গাজির বিদ্রোহ এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সমশের গাজি ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণশিক পরগনায় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ মনুহর রচিত গাজিনামা এবং কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত রাজমালা থেকে জানা যায় সমশেরের পিতা পির মহম্মদ একজন ফকির ছিলেন। আবার রামগঙ্গা বিশারদ রচিত কৃষ্ণমালা গ্রন্থে সমশেরকে রজক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাল্যজীবনে তিনি দক্ষিণ শিকের জমিদার নাসির মহম্মদের গৃহে প্রতিপালিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি জমিদারের একজন তহশিলদার নিযুক্ত হন। তিনি জমিদার নাসির মহম্মদের কন্যাকে বিবাহ করতে চাইলে জমিদার ক্রুদ্ধ হন এবং সমশের পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন।

তহশিলদার নিযুক্ত থাকাকালে তিনি জমিদারের অত্যাচার এবং কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন হন এবং এর প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হন। তিনি বিক্ষুব্ধ কৃষকদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন এবং নাসির মহম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁরই নেতৃত্বে বিদ্রোহী প্রজারা নাসির মহম্মদের প্রাসাদ আক্রমণ করলে নাসির মহম্মদ ও তাঁর পুত্রেরা বিদ্রোহীদের বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন। সমশের নিহত জমিদারের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং দক্ষিণ শিক পরগনার জমিদারি অধিকার করেন। ত্রিপুরার রাজা ইন্দ্রমাণিক্য সমশের গাজির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু সমশের তাঁর বিদ্রোহী বাহিনীর সহায়তায় ত্রিপুরার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। ত্রিপুরার উজির তাঁকে দক্ষিণ শিকের জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে মুক্তিলাভ করেন। এরপর নগরের প্রতিনিধি হাজি হোসেনের সহায়তায় এবং নবাবকে বার্ষিক অধিক রাজস্ব আদায় করে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি সমগ্র চাকলা রোশনাবাদের শাসক হন। ইতিমধ্যে নানা অরাজকতার মধ্যে ত্রিপুরার রাজা বিজয়মাণিক্য ঢাকায় পরলোক গমন করলে ইন্দ্রমাণিক্যের ভ্রাতা কৃষ্ণমাণিক্য ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর অধিকার করতে সচেষ্ট হন। সমশের তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে উদয়পুর আক্রমণ ও অধিকার করেন। বিতাড়িত কৃষ্ণমাণিক্য পুরাতন আগরতলায় এসে বসবাস শুরু করেন। পার্বত্য ত্রিপুরার প্রজারা প্রথমদিকে সমশেরকে রাজা হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করায় সমশের দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের এক পৌত্র লক্ষ্মণমাণিক্যকে নামে মাত্র উদয়পুরের সিংহাসনে স্থাপন করে নিজেই রাজ্য চালাতে থাকেন এবং কয়েক বছর পর ত্রিপুরার সিংহাসনও নিজে অধিকার করেন। সমশের অবশ্য রাজা উপাধি গ্রহণ করেন নি। সনদগুলিতে তিনি নিজেকে 'শ্রীশ্রীযুত মহম্মদ সমশের চৌধুরি জমিদার' হিসাবে উল্লেখ করেন।

সমশের ছিলেন সুদক্ষ শাসক। তিনি রাজ্যের প্রতি পরগনায় একজন করে সুদক্ষ শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রাজাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে কিল্লা বা দুর্গ নির্মাণ করেন। শাসনকার্যে হিন্দু ও মুসলিম দুই শ্রেণীই নিযুক্ত হত। ধর্মপুর নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন তাঁর দেওয়ান এবং খণ্ডল নিবাসী হরিহর ছিলেন তাঁর নায়েব দেওয়ান। এঁদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল। সমশেরের প্রধান অনুচর আবদুল রজ্জাক ছিলেন রোশনাবাদের শাসন কর্তা।

দরিদ্র প্রজাদের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য সমশের নানা ধরনের পন্থা অবলম্বন করেন। দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে তিনি বিনামূল্যে জমি বণ্টন করেন এবং তিনি যে রাজস্বের ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে দরিদ্র প্রজাদের কোনো কর দিতে হত না। কৃষ্ণমালা থেকে জানা যায় তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণদেরও নিষ্কর জমিদান করেছিলেন। তাঁর আদেশে বহু গ্রামে পুষ্করিণী খনন করা হয়। জনসাধারণের সুবিধার্থে তিনি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম ও ওজন

নির্দিষ্ট করে দেন। রাজমালার লেখক শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের ভাষায় ''সমশের তাঁহার অধিকার মধ্যে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের আশ্চর্য নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশে ৮২ সিক্কা ওজনের সের ধার্য হইয়াছিল। তিনি সেই সেরের পরিমাণে কোনো দ্রব্য কত মূল্যে বিক্রয় হইবে তাহার একটি তালিকা প্রত্যেক বাজারে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। কেহ ইহার অন্যথা করিতে পারিত না।''

দরিদ্র প্রজাদের বিনামূল্যে জমি-বণ্টন ও নিষ্কর জমিদানের ফলে এবং বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। এদিকে অধিক পরিমাণে রাজস্ব দিয়ে বাংলার নবাবকেও সন্তুষ্ট রাখতে হত। সমশের অর্থ সংগ্রহের জন্য এক সহজ উপায় অবলম্বন করেন। তিনি নিজ রাজ্যের বাইরে ধনী ও কৃপণ জমিদারদের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করে অর্থ সংগ্রহ করতেন। সেই অর্থের একাংশ তিনি দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং অপর অংশ বাংলার নবাবকে রাজস্ব দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতেন। সমশেরের জীবন চরিত প্রণেতা শেখ মনোহর লিখছেন সমশের একজন কৃপণ জমিদারের গৃহে ডাকাতি করে এক লক্ষ টাকা এনেছিলেন। কারণ ঐ জমিদার কোনো দান খয়রাত করত না।

সমশেরের ডাকাতির কথা চারিদিকে প্রচারিত হতে থাকে এবং জমিদার ও ধনী ব্যক্তিরা ভীত হয়ে নবাবের কাছে সমশেরের বিরুদ্ধে বারংবার অভিযোগ পেশ করতে থাকেন। যুবরাজ কৃষ্ণমাণিক্য সমশেরের বিরুদ্ধে নবাবের কাছে দরবার করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত নবাব কৃষ্ণমাণিক্যকে ত্রিপুরার রাজা বলে স্বীকার করে নেন এবং সমশেরকে বন্দি করার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সমশের পরাজিত হলে নবাবের আদেশে সমশেরকে কামানের মুখে রেখে হত্যা করা হয়। গাজিনামার মতে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা আবুবকরের সঙ্গে সমশেরের বিবাদ ঘটে এবং আবুবকরই রংপুর ঘোড়াঘাটে কামানের মুখে সমশেরকে হত্যা করেন। সম্ভবত ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ বা তার কিছু পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

সমশের গাজির পতনের পর তাঁর অনুগত রোশনাবাদের শাসনকর্তা আবদুল রজ্জাক বারংবার কৃষ্ণমাণিক্যের রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। ১৭৬১ সালের পর রোশনাবাদের জমিদারিত্ব প্রথমে বলরামমাণিক্য ও পরে কৃষ্ণমাণিক্যকে দেওয়া হলে আবদুল রজ্জাক তাঁর দলবল নিয়ে গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নেন এবং দস্যুতা আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত নবাবের অনুচরেরা তাঁকে বন্দি করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসে এবং কামানের মুখে রেখে হত্যা করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ত্রিপুরা ও ইংরাজ শক্তি

কৃষ্ণমাণিক্য

সমশের গাজির পতনের পর মুকুন্দমাণিক্যের পুত্র কৃষ্ণমাণিক্য নাম ধারণ করে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। সমশের গাজির শাসনকালে উদয়পুর অধিকারে ব্যর্থ হয়ে কৃষ্ণমাণিক্য পুরাতন আগরতলায় এসে বসবাস করছিলেন। সমশেরের পতনের পর উদয়পুর কৃষ্ণমাণিক্যের অধিকারে এলেও পুরাতন আগরতলাতেই অধিক নিরাপদ মনে করে এখানেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।

সিংহাসন লাভের অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণমাণিক্য এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হলেন। চাকলা রোশনাবাদের রাজস্ব আদায়কে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের ফৌজদার রেজা খানের সঙ্গে কৃষ্ণমাণিক্যের বিরোধ শুরু হয়। বেজা খান দেওয়ান রামশঙ্করের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ত্রিপুরা অভিযানে প্রেরণ করেন। এই অভিযানের ব্যয় নির্বাহের জন্য রেজা খান চট্টগ্রামের প্রজাদের নিকট থেকে দুই আনা করে অতিরিক্ত কর আদায় করেছিলেন। ফৌজদার নবাবের নিকট অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করলে নবাব মিরকাশিম তদানীন্তন ইংরেজ গভর্নর ভ্যানসিটার্টকে ফৌজদারের সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করতে অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাব মিরকাশিমের কাছ থেকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জমিদারি হিসাবে লাভ করেছিল। এখন চট্টগ্রামের সীমারেখা বিস্তারে আগ্রহী ভ্যানসিটার্ট ত্রিপুরা অভিযানে উৎসাহী হলেন। তিনি ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দেব ২০শে জানুয়ারি চট্টগ্রামের ইংরেজের প্রধান কর্মকর্তা ভার্লেস্টকে ত্রিপুরার রাজা যাতে ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) সরকারের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন সেরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। ত্রিপুরা অধিকার করলে ইংরেজদের কী ধরনের সুযোগ সুবিধা হবে তাও তিনি জানাতে চান। কলিকাতার গভর্নর ভ্যানসির্টাটের নির্দেশ পেয়ে ভার্লেস্ট লেফটেন্যান্ট ম্যাথুসকে দুইশত ছয়জন পদাধিক সৈন্য ও দুটি কামানসহ ত্রিপুরা অভিযানে প্রেরণ করেন (১৭৬১ খ্রিঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি)। ইংরেজ সেনাবাহিনীর ত্রিপুরা অভিযানকালে রেজা খান তাঁর সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। রেজা খানের সেনাবাহিনীর দ্বারা ত্রিপুরার রাজা ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। এই অবস্থায় ত্রিপুরার রাজার পক্ষে সুশিক্ষিত ইংরেজ সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও কৃষ্ণমাণিক্য ইংরেজ সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ

করার উদ্দেশ্যে কৈলাগড় দুর্গে সাত হাজার সুশিক্ষিত পদাতিক, বহু সংখ্যক কুকি সৈন্য এবং কয়েকটি কামান সহ অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব মনে করে কৃষ্ণমাণিক্য ইংরেজ সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। জনশ্রুতি আছে যে ত্রিপুরারাজের সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত বক্সির বিশ্বাসঘাতকতায় ত্রিপুরা রাজের বিপর্যয় ঘটেছিল। ত্রিপুরা রাজের সেনাবাহিনী বিনাযুদ্ধে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করেছিল। এর ফলে ত্রিপুরার সমতল অঞ্চল ইংরেজদের অধিকারে আসে (১৭৬১ খ্রিঃ)। ত্রিপুরার রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের জন্য চট্টগ্রামের কর্মকর্তারা কালেক্টর ম্যারিয়টকে ত্রিপুরায় পাঠালেন। মিঃ ম্যারিয়ট কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে দুটি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। প্রথম চুক্তিতে স্থির হল রাজা রাজস্ব হিসাবে এক লক্ষ এক টাকা দেবেন এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার চারশো তেশোট্টি টাকা যুদ্ধের ব্যয় বাবদ ইংরেজ ও নবাবের সেনাবাহিনীকে দিতে হবে। অপর চুক্তি অনুসারে নজরানা বা সেলামি বাবদ এক লক্ষ এগারো হাজার একশো একানব্বই টাকা ছয় আনা তিন পয়সা ধার্য করা হল। রেজা খানের সেনাবাহিনীর আক্রমণের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন বিপর্যয়ের মুখে। রাজার হাতে নগদ অর্থও খুব সামান্য ছিল। রাজার এই আর্থিক দুরবস্থার কথা চিন্তা করে ম্যারিয়ট সাহেব এইসব অর্থ কিস্তিতে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। রাজার সঙ্গে রাজস্ব ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তা চাকলা রোশনাবাদ বা সমতল ত্রিপুরাকে নিয়েই। পার্বত্য ত্রিপুরাকে নিয়ে কোনো চুক্তি হয় নি। পার্বত্য পাথুরে বনজঙ্গল পূর্ণ পূর্বাংশের প্রতি ইংরেজদের কোনো আগ্রহ ছিল না। এর ফলে চাকলা রোশনাবাদ বা সমতল ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কৃষ্ণমাণিক্য ইংরেজ কোম্পানির অধীনস্থ এক জমিদারে পরিণত হলেন। আর পার্বত্য ত্রিপুরায় তিনি স্বাধীন রাজা হিসাবেই রাজত্ব করতে থাকনে। র‍্যালফ লিক সমতল ত্রিপুরা বা চাকলা রোশনাবাদের রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলেন। তিনিই ত্রিপুরার প্রথম রেসিডেন্ট বা ইংরেজ প্রতিনিধি।

এই সময় থেকে চাকলা রোশনাবাদ ও পার্বত্য ত্রিপুরার বিচারকার্য আলাদাভাবে করার ব্যবস্থা করা হয। পার্বত্য বিচারকার্য নির্বাহ করতেন রাজার নিযুক্ত বিচারকরা আর চাকলা রোশনাবাদের বিচার কার্য করতেন রেসিডেন্ট এবং রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ চাকলা রোশনাবাদের দেওয়ান সম্মিলিত ভাবে।

কৃষ্ণমালা থেকে জনা যায় যে বাংলার নবাব ভাগ্যমাণিক্যের পুত্র বলরামমাণিক্যকে চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি স্বত্ব দান করেন। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের বলরামমাণিক্য প্রদত্ত একটি নিষ্কর সনদ থেকে জানা যায় যে ওই সময় তিনি চাকলা রোশনাবাদের অধিকারী ছিলেন। তিনি মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করলেও পার্বত্য ত্রিপুরার অধিকারী ছিলেন বলে মনে হয় না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চট্টগ্রাম কুঠির অধ্যক্ষ ভার্লেস্টের চেষ্টায় কিছুদিনের

মধ্যেই কৃষ্ণমাণিক্য চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি ফিরে পান। কৃষ্ণমালা থেকে আরো জানা যায় যে কৃষ্ণমাণিক্য মিঃ ভার্লেস্টের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। ভার্লেস্টের মণিপুর ও কাছাড় অভিযানে কৃষ্ণমাণিক্য তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

সমশের গাজি আবদুল রজ্জাককে চাকলা রোশনাবাদের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। সমশের গাজির পতন ও আবদুল রজ্জাক ক্ষমতাচ্যুত হলেও চাকলা রোশনাবাদে মাঝে মাঝে আক্রমণ করে আবদুল রজ্জাক কৃষ্ণমাণিক্যকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নবাব বন্দি করে হত্যা করেন।

কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বের শেষ দিকে চাকলা রোশনাবাদের বন্দোবস্ত নিয়ে কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে ত্রিপুরার ইংরেজ রেসিডেন্ট মিঃ লিকের বিরোধ বাধে। মিঃ লিক ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বারংবার হস্তক্ষেপ করতে থাকলে রাজা মিঃ লিকের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন। রাজা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাজধরকে কলিকাতায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করেন এবং তাঁর মারফত জানান যে কোম্পানীর প্রাপ্য চাকলা রোশনাবাদের রাজস্বের কিছুটা তিনি শোধ করে দেবেন এবং ভবিষ্যতে বাকি রাজস্ব শোধ করার জন্য উপযুক্ত জামিন দিতেও তিনি রাজি আছেন তবে এর বিনিময়ে মিঃ লিককে ত্রিপুরা ত্যাগের নির্দেশ দিতে হবে। এদিকে মিঃ লিকও রাজা ও রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের ইংরেজবিরোধী কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কলিকাতায় কর্তৃপক্ষকে জানান যে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ইংরেজদের বাধাদানের জন্য রাজা আগরতলায় সৈন্য সমাবেশ করেছেন। এর মোকাবিলার জন্য মিঃ লিক সৈন্য সাহায্যেরও আবেদন জানান। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মিঃ লিককে সেনা দিয়ে সাহায্য করলেও এই বলে নির্দেশ দেন যে রাজ্য কর্তৃক আক্রান্ত না হলে যেন মিঃ লিক এই সৈন্য রাজার বিরুদ্ধে ব্যবহার না করেন। শেষ পর্যন্ত ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দশ বৎসরের জন্য চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি সরাসরি ব্যবস্থাপনায় বা খাসে নিয়ে আসেন। সরকারের প্রাপ্য রাজকর পরিশোধ করে শাসন সংক্রান্ত ব্যয় ও রাজপরিবারের ভরণপোষণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করা রেসিডেন্টের কর্তব্য ছিল। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি ত্রিপুরার রাজাকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল।

কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকালে পূর্ব ও উত্তর ত্রিপুরায় প্রায় পঁচিশ হাজার পৈতু কুকি তাদের সর্দার শিবুতের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কৃষ্ণমাণিক্য সৈন্যের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করেন ও তাদের ত্রিপুরা রাজের অধীনে আনতে সক্ষম হন। অন্যান্য কুকিদের বিদ্রোহও দমন করা হয়।

কৃষ্ণমাণিক্য উদয়পুর থেকে বৃন্দাবনচন্দ্রের বিগ্রহ ও চতুর্দশ দেবতাদের বিগ্রহ এনে পুরাতন আগরতলায় মন্দির নির্মাণ করে স্থাপন করেন। কুমিল্লা নগরীর পূর্ব প্রান্তে দ্বিতীয়

রত্নমাণিক্য যে সতেররত্ন নামক দেবমন্দিরে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন কৃষ্ণমাণিক্য সেই মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন। তিনি অনেক ধর্মানুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণদের নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। সমশের গাজি প্রদত্ত নিষ্কর জমিগুলিও তিনি বহাল রেখেছিলেন। দীর্ঘ তেইশ বৎসর রাজত্বের পর ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ই জুলাই তিনি পরলোকগমন করেন।

রানি জাহ্নবীদেবীর শাসন

কৃষ্ণমাণিক্যের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হলে ত্রিপুরার সিংহাসনের অধিকার নিয়ে গৃহ বিবাদ শুরু হয়। সিংহাসনের জন্য প্রধান দুই দাবিদার ছিলেন কৃষ্ণমাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজধর এবং লক্ষ্মণ মাণিক্যের পুত্র দুর্গামণি। কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রেসিডেন্ট লিক কুমিল্লা থেকে আগরতলা এসে রানি জাহ্নবীদেবীর কাছে জানতে পারেন যে ভূতপূর্ব রাজা এবং রানি উভয়েই রাজধরকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচিত করে রেখেছিলেন। মিঃ লিকের পরামর্শ মতো রানি জাহ্নবীদেবীও ওয়ারেন হেস্টিংসকে রাজধরের মনোয়নের ব্যাপারে পত্র লেখেন। ওয়ারেন হেস্টিংসএর অনুমতি আসতে বিলম্ব হওয়ায় রানি জাহ্নবীদেবী স্বয়ং দুই বৎসরের উপর ত্রিপুরার শাসনকার্য দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। রাজধর সিংহাসন লাভ করলে দুর্গামণিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হবে বলে জাহ্নবীদেবী দুর্গামণিকে আশ্বাস দিয়ে শান্ত রাখেন। তাঁর শাসনকালের শেষ দিকে ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং এই দুর্ভিক্ষ প্রায় দুই বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। রানি জাহ্নবীদেবী কুমিল্লায় রানির দিঘি ও রাধানগরে রাধামাধবদেবের মন্দির নির্মাণ করেন। সংস্কৃতে তাঁর দক্ষতা ছিল।

দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য

১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ই মে ইংরেজ সরকারের অনুমোদন ও খেলাত লাভ করে কৃষ্ণমাণিক্যের ভ্রাতা হরিমণি ঠাকুরের পুত্র রাজধরমাণিক্য উপাধি গ্রহণ করে ত্রিপুরার রাজা হন। রানি জাহ্নবীদেবীর পরামর্শ মতো দুর্গামণিকে যুবরাজের পদ দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে একদল ডাকাতকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে রাজধরকে চট্টগ্রামে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। পরে নির্দোষ প্রমাণিত হলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। রাজধরমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হলেও চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশের 'দশসালা' বন্দোবস্ত অনুযায়ী তিনি চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি ফেরত পান এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী চাকলা রোশনাবাদের জমিদারির স্থায়ী মালিকানা লাভ করেন। এই সময় ত্রিপুরার রেসিডেন্টের পদ বিলোপ করা হয় এবং চাকলা রোশনাবাদের স্থলে রোশনাবাদ ত্রিপুরা জেলার সৃষ্টি করা হয়। এই ত্রিপুরা জেলার জন্য একজন ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত হয়।

রাজধরমাণিক্যের রাজত্বকালে বিজয়মাণিক্যের (জয়মাণিক্যের ভ্রাতা হরিধন ঠাকুর)

পুত্র রামচন্দ্র ঠাকুর চট্টগ্রামের রিয়াং প্রজাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেন এবং তাদের সাহায্য নিয়ে ত্রিপুরার সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন। রাজধরমাণিক্য তিন বৎসর চেষ্টার পর এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

রাজধরমাণিক্য মণিপুররাজ জয়সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। এর ফলে মণিপুরের সঙ্গে ত্রিপুরার সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। শেষ জীবনে রাজধরমাণিক্যের বৈরাগ্যভাব উপস্থিত হয় এবং সর্বদা ঈশ্বরের উপাসনায় নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজধরমাণিক্য একজন স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন রাজা ছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে রেসিডেন্ট লিকের বিরোধের সময় রাজধর সর্বদাই কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং ইংরেজদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য কৃষ্ণমাণিক্যের সামরিক প্রস্তুতির তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। রাজধর সত্যিই ডাকাতদের আশ্রয় দিয়ে থাকলে কী ধরনের ডাকাতদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তা জানা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ইংরেজ রাজত্বের সুচনায় বাংলাদেশে যে অরাজকতা চলছিল এবং চোর ডাকাতের উপদ্রব বেড়েছিল তার মধ্যে কিছু স্বদেশি ও ইংরেজ বিদ্বেষী তথাকথিত ডাকাতের সংখ্যাও একেবারে কম ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানি' উপন্যাসে এর কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজধরমাণিক্য এ ধরনের ডাকাতদের আশ্রয় দিয়ে নিজ ইংরেজ বিরোধী মনোভাবকে চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন কিনা তা গবেষণাসাপেক্ষ। রাজধরমাণিক্যের ইংবেজ বিদ্বেষ স্বভাবতই মিঃ লিক ও পরবর্তী রেসিডেন্ট জনবুলারের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিঃ লিক রাজধরমাণিক্যকে মদ্যপ ও বিশ্বাসের অযোগ্য এবং জন বুলার রাজধরমাণিক্যকে নিরক্ষর বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁদের এই মন্তব্য থেকে রাজধরমাণিক্যের প্রকৃত চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায় না।

দুর্গামাণিক্য

রাজধরমাণিক্য দুর্গামণিকে যুবরাজ নিযুক্ত করলেও মৃত্যুর পূর্বে নিজ পুত্র বড়ঠাকুর রামগঙ্গার হাতেই ত্রিপুরা ও জমিদারির শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। এর ফলে রামগঙ্গা ঠাকুর বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে রাজধরমাণিক্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বড়ঠাকুর রামগঙ্গা যুবরাজ দুর্গামণির দাবি অগ্রাহ্য করে ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করে নেন এবং মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন। এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে ভয়ানক গোলযোগের সৃষ্টি হল। রাজপরিবারের লোকেরা এবং রাজকর্মচারীরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে একপক্ষ যুবরাজ দুর্গামণিকে এবং অপর পক্ষ রামগঙ্গামাণিক্যকে সমর্থন করেন। এমনকী ত্রিপুরা জেলার তদানীন্তন জেলা জজ মিঃ ইলিয়ট

মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য

রামগঙ্গামাণিক্যের পক্ষে এবং ত্রিপুরা জেলার কালেক্টর দুর্গামণির পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। যুবরাজ দুর্গামণি কুকিদের সাহায্য নিয়ে রামগঙ্গামাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন ও রামগঙ্গামাণিক্যকে ব্যতিব্যস্ত করতে থাকেন। এই অবস্থায় গভর্নর জেনারেল ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই আগস্ট এক পত্রে যুবরাজ দুর্গামণিকে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না থেকে দেওয়ানি আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেন। পত্রে গভর্নর জেনারেল জানান যে দুর্গামণি ঠাকুর আদালতে জমিদারির উপর নিজ দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে ত্রিপুরা রাজ্যের উপরও তাঁর দাবি সরকার মেনে নেবেন। যুবরাজ দুর্গামণি তখন রামগঙ্গামাণিক্যের বিরুদ্ধে আদালতে এক মোকদ্দমা করেন। রামগঙ্গামাণিক্যও তখন আদালতের নিজের অধিকার প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হন। এই মোকদ্দমায় জগন্নাথ ঠাকুরের বংশধর রামচন্দ্র ঠাকুরও নিজ দাবি উত্থাপন করেছিলেন। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য রামগঙ্গামাণিক্যই পূর্বের মতো ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারির শাসনকার্য চালাতে থাকেন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে একবার কুকিদের আক্রমণে তিনি এতই ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন যে সময়মতো ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য না এলে সপরিবারে তিনি নিহত হতেন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জুলাই ঢাকা প্রভিন্সিয়াল কোর্টে এই মামলার রায় প্রকাশ হয়। তাতে বলা হয় যে যেহেতু রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজই রাজা হবার অধিকারী সেইহেতু যুবরাজ দুর্গামণিই আইনত ত্রিপুরার রাজ্য ও জমিদারির অধিকারী। এই রায়ের বিরুদ্ধে রামগঙ্গামাণিক্য সদর দেওয়ানি আদালতে আপিল করেন। কিন্তু সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক মিঃ হেরিংটন ও ফ্রেমিং ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মার্চ রামগঙ্গামাণিক্যের আপিল খারিজ করে দেন। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের আদালতের রায় অনুসারে দুর্গামণি চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি প্রাপ্ত হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই মহারাজ দুর্গামাণিক্য নাম নিয়ে ত্রিপুরার রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হন। দুর্গামাণিক্যের সময় থেকেই ইংরেজ সরকার সিংহাসন প্রাপ্তির অনুমোদন হিসাবে ত্রিপুরার রাজাদের কাছ থেকে নজরানা আদায় করতে শুরু করেন। দুর্গামাণিক্য বারাণসীতে এক মন্দির নির্মাণ করে তাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তীর্থ ভ্রমণকালে পাটনা শহরের সন্নিকটে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল দুর্গামাণিক্য মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রামগঙ্গামাণিক্য

দুর্গামাণিক্যের পুত্র সন্তান ছিল না। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে আইনসম্মত ও কুলাচার অনুযায়ী নির্ধারিত যুবরাজের অভাবে ইংরাজ সরকার রামগঙ্গামাণিক্যকে ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারির উত্তরাধিকারী বলে মেনে নেন। সেই অনুসারে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে রামগঙ্গামাণিক্য পুনরায় রাজদণ্ড ধারণ করেন। কিন্তু তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান হতে কিছু বিলম্ব হয়। কারণ রামগঙ্গামাণিক্যের বিরুদ্ধে রাজ পরিবারের কোনো কোনো সদস্য

মামলা উত্থাপন করেন। ত্রিপুরার সিংহাসনের অন্যতম প্রধান দাবিদার ছিলেন রামচন্দ্র ঠাকুরের পুত্র শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর। দুর্গামাণিক্য শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে যুবরাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও দুর্গামাণিক্যের জীবিতকালে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হতে পারেন নি। ফলে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের ত্রিপুরার সিংহাসনের দাবি অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এইসব মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পর ইংরাজ সরকার রামগঙ্গামাণিক্যকে খেলাত প্রদান করেন এবং ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে মহাসমারোহে রামগঙ্গমাণিক্যের অভিষেক সম্পন্ন হয়। রামগঙ্গামাণিক্য তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং নিজপুত্র কৃষ্ণকিশোরকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন।

শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর আদালতের বিচারে অকৃতকার্য হয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ত্রিপুরার সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি কুকিদের সঙ্গে বসবাস করছিলেন। তাঁরই প্ররোচনায় একদল কুকি সহ হালাম উপজাতিরা রামগঙ্গামাণিক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এদের সাহায্য নিয়ে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর আগরতলা আক্রমণ করেন। রামগঙ্গামাণিক্য এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেও ১৮২৪ থেকে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের নেতৃত্বে হালাম ও কুকি বিদ্রোহীদের সঙ্গে রামগঙ্গামাণিক্যের অনবরত সংঘর্ষ চলতে থাকে। শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর শুধুমাত্র ত্রিপুরারাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষান্ত হন নি তিনি ইংরাজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুমচাষকারী উপজাতীয় প্রজারা ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে কোনোপ্রকার খাজনা দেওয়া থেকে বিরত থাকে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এবং ত্রিপুরা জেলায় শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং গ্রেপ্তারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের এতই প্রিয় ছিলেন যে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করতে পারেন নি। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর পুনরায় রামগঙ্গামাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে সুবা ধনঞ্জয়ের হাতে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর পরাজিত হন।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে লেফটেন্যান্ট ফিশার পার্বত্য ত্রিপুরা এবং শ্রীহট্টের সীমা নির্ধারণ করেন। এ ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় রামগঙ্গামাণিক্য ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় রামগঙ্গামাণিক্য ইংরাজ সরকারকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। বর্মি সৈন্যরা যাতে পার্বত্য ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে কাছাড় ও শ্রীহট্টে প্রবেশ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর পূর্ব সীমান্তে সৈন্য স্থাপন করেন।

এক সরকারি রিপোর্টে রামগঙ্গামাণিক্যকে "দুর্বল ও নির্বোধ রাজা যিনি এক বা দুই বাঙ্গালি কর্মচারীর নির্ভরশীল ছিলেন" বলে মন্তব্য করা হয়েছে। তিনি পারসিক ভাষা ও

ভূমি পরিমাপবিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি শস্ত্র ও মল্লযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে তিনি গোপীনাথ মন্দির নির্মাণ করে সেবার জন্য উড়িষ্যায় দেবোত্তর সম্পত্তি দান করে পান্ডাদের ভার দেন। রামগঙ্গামাণিক্য বৃন্দাবনে একটি কুঞ্জ নির্মাণ করে তাতে রাসবিহারী দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই দেবসেবার ব্যয় নির্বাহের জন্য বামুটিয়া পরগনা দেবোত্তর স্বরূপ দান করেন। তিনি ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

কাশীচন্দ্রমাণিক্য

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই নভেম্বর রামগঙ্গামাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন। রাজা হবার চার মাস পর তিনি (১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাস) ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে খেলাত লাভ করেন ও রাজ্যাভিষেক হয়। ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকারে ব্যর্থ হয়ে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর পার্বত্য ত্রিপুরা অধিকারের জন্য এক আশ্চর্য উপায় অবলম্বন করেন। পঁচিশ হাজার টাকা রাজস্ব দানের বিনিময়ে পার্বত্য ত্রিপুরা বন্দোবস্ত নেওয়ার জন্য তিনি গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু পার্বত্য ত্রিপুরা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলে ইংরাজ সরকার তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করেন। কাশীচন্দ্রমাণিক্য বুদ্ধিমান রাজা ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের শত্রুতা রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর উপলব্ধি করে তিনি শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে আহ্বান করে তাঁর সঙ্গে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করেন। তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য মাসিক পাঁচশত টাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর কুমিল্লায় শান্তভাবে জীবন যাপন করেন।

নিয়মিত রাজস্ব ও দক্ষভাবে জমিদারি পরিচালনার উদ্দেশ্যে কাশীচন্দ্রমাণিক্য এফ. কোরজোন নামে এক সাহেবকে চাকলা রোশনাবাদের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় থেকেই ত্রিপুরা সরকারের কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিজ্ঞ সাহেব কর্মচারী নিয়োগ শুরু হয়।

কাশীচন্দ্রমাণিক্যের আমলে ত্রিপুরা শ্রীহট্ট কাছাড় জেলার সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়। সীমান্ত পুনর্গঠনের নামে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েকশো বর্গমাইল সমতল ও চাষের জমি দখল করে নেয়।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে মণিপুরের রাজা ইংরাজ সরকারের কাছে এক আবেদনে জানান যে ত্রিপুরার রাজা মণিপুরের সীমানার অন্তর্গত থাঙ্গুম অঞ্চল দখল করে নিতে উদ্যত হয়েছেন, যেখানে মণিপুর রাজের একটি থানা ছিল। এই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য ইংরাজ সরকার শ্রীহট্টে ডেপুটি কমিশনারকে নির্দেশ দেন। থাঙ্গুম অঞ্চলটি বরাক নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই অঞ্চলটি দীর্ঘকাল ধরে মণিপুর রাজ্যের অধিকারে ছিল বলে শ্রীহট্টের ডেপুটি

কমিশনার অঞ্চলটি মণিপুর রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত রাখার প্রস্তাব দেন। ইংরাজ সরকার অঞ্চলটি দখল না করার জন্য কাশীচন্দ্রমাণিক্যকে নির্দেশ দেন।

কাশীচন্দ্রমাণিক্য মণিপুর রাজকন্যা কুটিলাক্ষী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। কুটিলাক্ষী দেবীর গর্ভজাত পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরকে বড়ঠাকুর এবং রামগঙ্গামাণিক্যের পুত্র কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর পিতার জীবিতকালে পরলোক গমন করেন। কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা থেকে জানা যায় যে মামলা মোকদ্দমা বাবদ রামগঙ্গামাণিক্যের যে প্রচুর ঋণ হয়েছিল, তার অধিকাংশ রামগঙ্গামাণিক্য নিজে এবং বাকি অংশ কাশীচন্দ্রমাণিক্য পরিশোধ করেছিলেন।

শেষ জীবনে কাশীচন্দ্রমাণিক্যের সঙ্গে যুবরাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের মতবিরোধ দেখা দিলে কাশীচন্দ্র উদয়পুরে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানেই ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য

কাশীচন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর রামগঙ্গামাণিক্যের পুত্র কৃষ্ণকিশোর ত্রিপুরার শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ইংরেজ সরকার থেকে খেলাত প্রাপ্ত হয়ে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য তৎকালীন তেষট্টি টাকা আট আনা মূল্যের কিছু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ইংরেজ সরকারকে নজর প্রদান করেছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁর আড়াই বৎসর বয়স্ক পুত্র ঈশানচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পুরাতন হাবেলি বা আগরতলা থেকে নতুন হাবেলি বা বর্তমান আগরতলায় রাজধানী স্থাপন। কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে শিকারের সুবিধার জন্য বহু অর্থব্যয় করে কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য নতুন হাবেলি নামক নগর নির্মাণ করে সেখানে রাজপাট স্থাপন করেছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে ও চাকলা রোশনাবাদ এলাকায় কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য বাঁশ, তুলা ইত্যাদির উপর শুল্ক আদায়ের চেষ্টা করলে স্থানীয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মত বিরোধ দেখা দেয়। চট্টগ্রামের কমিশনার মিঃ হার্ভে পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বলে দাবি করেন এবং ত্রিপুরা রাজ্য খাস দখল করার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠান। রাজা এবং তাঁর কলিকাতাস্থ এজেন্ট বিগনেল সাহেব এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর বাংলার ডেপুটি গভর্নর হার্ভেকে এক চিঠিতে জানান যে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল রাজার স্বাধীন এলাকা। এটি অধিকার করে নেবার প্রস্তাব একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। রাজা তাঁর পার্বত্য এলাকায় যে কোনো শুল্ক ইচ্ছামতো আদায়ের অধিকারী।

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ পরিবারের রামকানু ঠাকুর তিনচারশত কুকি, চাকমা, মঘ ও ত্রিপুরিদের গঠিত একটি দল নিয়ে ত্রিপুরা জেলার খণ্ডলের এক সম্পন্ন ভূমধ্যকারী মেরকি চৌধুরির বাড়ি আক্রমণ করে ভস্মীভূত করে। এই আক্রমণে পনেরো ব্যক্তি নিহত হয়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকলে কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য রামকানু ঠাকুরকে বন্দি করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। এর পর ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের পুত্র ভগবানচন্দ্র ঠাকুর ত্রিপুরা জেলার ছাগলনাইয়া থানার একটি গ্রাম কুকিদের সাহায্যে লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যকে এই ঘটনার জন্য দোষারোপ করেন। কারণ ত্রিপুরার সীমান্তে উপযুক্ত রক্ষী না রাখার ফলেই ভগবানচন্দ্র ঠাকুরের নেতৃত্বে কুকিরা ত্রিপুরারাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করে ব্রিটিশ এলাকায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল লালচোকলার নেতৃত্বে কিছু কুকি সম্প্রদায়ের লোক কোচাবাড়ি নামে এক মণিপুরি অধ্যুষিত অঞ্চলে লুঠতরাজ ও ব্যাপক নরহত্যা শুরু করলে ইংরেজ সরকার কুকিদের দমন করার জন্য কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের সাহায্য চান। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করতে অক্ষম হওয়ায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ক্যাপ্টেন ব্লেকউডের অধীনে শ্রীহট্ট থেকে একদল সৈন্যকে কুকিদের দমন করতে প্রেরণ করেন। লালচোকলার গ্রাম অবরোধ করা হলে ৪ঠা ডিসেম্বর লালচোকলা ক্যাপ্টেন ব্লেকউডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। অবশ্য কৈলাস সিংহ তাঁর রাজমালা গ্রন্থে লিখেছেন যে ত্রিপুরার রাজার জনৈক সেনাপতি কেলিফিরিঙ্গি লালচোকলাকে গ্রেপ্তার করে ব্লেকউডের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। লালচোকলা তাঁর অপরাধ স্বীকার করেন। চাকচোকলাকে দ্বীপান্তরিত করা হয়।

কৃষ্ণমাণিক্য আসাম ও মণিপুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর কয়েকজন পত্নী ও উপপত্নী ছিল। তিনি বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি শিকার, ক্রীড়ানুষ্ঠান ও আমোদপ্রমোদে জীবন অতিবাহিত করায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর রাজত্বকালে রাজমালার ষষ্ঠ খণ্ড দুর্গামণি উজির কর্তৃক সংকলিত হয়। দুর্গামণি উজির বাংলায় সমগ্র রাজমালাকে সংশোধিত ও পরিবর্তিত করে সংকলিত করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিক বজ্রাঘাতে কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের মৃত্যু হয়।

ঈশানচন্দ্রমাণিক্য

পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ ঈশানচন্দ্র ত্রিপুরার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইংরেজ সরকারের খেলাত প্রাপ্ত হয়ে ঈশানচন্দ্রমাণিক্য ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের অভিষেককালে ইংরেজ সরকার একশো পঁচিশটি স্বর্ণমুদ্রা নজর হিসাবে দাবি করেন। অনেক তর্কবিতর্কের পর একশো এগারোটি স্বর্ণমুদ্রা

নজর হিসাবে গৃহীত হয়। অভিষেককালে ঈশানচন্দ্রমাণিক্য তাঁর পরবর্তী ভ্রাতা উপেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুরকে যুবরাজ নিযুক্ত করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুরকে বড়ঠাকুর নিযুক্ত করা হয়।

সিংহাসনে আরোহণ করেই ঈশানচন্দ্রমাণিক্য কঠিন আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন। পিতার এগারো লক্ষ টাকার ঋণভার তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। এই অবস্থায় তিনি বলরাম হাজারি নামে এক কঠোর প্রকৃতির লোককে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। বলরাম হাজারি ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীদাম হাজারি কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় করতে থাকলে ত্রিপুরি প্রজারা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের তিপ্রা বিদ্রোহ নামে পরিচিত। শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ সেনাবাহিনীর সাহায্যে দমন করা হয়। শ্রীদাম হাজারি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। বলরাম হাজারি রাজার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাজ্য থেকে নির্বাসিত হন।

বলরাম হাজারি পদচ্যুত হবার পর ঈশানচন্দ্রমাণিক্য ব্রজমোহন ঠাকুরকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কিন্তু ব্রজমোহন ঠাকুরও ঋণশোধে ব্যর্থ হন। ইংরেজ সরকারকে রাজস্ব দেবার কোনো উপায় নেই দেখে চাকলা রোশনাবাদ বিক্রয় করে দেবার প্রস্তাবও উঠলো। এই অবস্থায় কলিকাতা থেকে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে চাকলা রোশনাবাদের ম্যানেজার করে আনা হল। তিনি ঈশানচন্দ্রমাণিক্যকে জানান যে তাঁকে মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি সব ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করবেন। রাজা তাঁকে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ কবতে উদ্যত হলে রাজগুরু প্রভু বিপিনবিহারী গোস্বামী এতে আপত্তি জানান। এই অবস্থায় 'প্রভুভক্ত ঈশানচন্দ্রমাণিক্য গুরু বিপিনচন্দ্র গোস্বামীর হাতেই ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারির ভার অর্পণ করেন। গুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী বিশেষ বুদ্ধিবলে ও সুকৌশলে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। তিনি ত্রিপুরার রাজাদের দেওয়া বহু নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অনেকটা মজবুত করেন। ঋণের পরিমাণও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কিন্তু গুরুর অপ্রতিহত ক্ষমতায় রাজপরিবারের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়।

ঈশানচন্দ্র মাণিক্য আরো একটি সমস্যার সম্মুখীন হলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মহাবিদ্রোহ শুরু হলে একদল বিদ্রোহী সিপাহি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে রাজার সাহায্য প্রার্থী হয়। রাজা তাদের কোনোরূপ সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন এবং কয়েকজন সিপাহিকে বন্দি করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। তা সত্ত্বেও কিছু ইংরেজ কর্মচারী রাজা বিদ্রোহী সিপাহিদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন এই অভিযোগ করে শাস্তি স্বরূপ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে স্বাধীন ত্রিপুরার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার দাবি জানান। শেষ পর্যন্ত বিচারক ম্যাটকাফের মধ্যস্থতায় এই প্রচেষ্টা কার্যকর হয় নি এবং রাজা এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসিত ত্রিপুরা জেলা সংলগ্ন ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্দিষ্ট করা হয়। সীমা নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ত্রিপুরারাজের পক্ষে মিঃ ক্যাম্বেল এবং ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে মিঃ লিস্টার মধ্যস্থতা করেন।

১৮৬০-১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে একদল কুকি ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুরের বাজার লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে এবং ত্রিপুরা সীমান্ত অতিক্রম পূর্বক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ত্রিপুরা রাজ্যের জমিদারি খণ্ডল পরগনার ছাগলনাইয়া গ্রামে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও কিছু লোককে হত্যা ও বন্দি করে। ত্রিপুরারাজের কিছু রিয়াং ও ত্রিপুরি প্রজা মহাজনদের দ্বারা উত্ত্যক্ত হয়ে এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল। সীমান্তরক্ষায় অবহেলার ফলেই এ ধরনের আক্রমণ সম্ভব হয়েছিল বলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরার রাজাকে অভিযুক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত রাজা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো রাজ্যসীমান্তে চৌকি স্থাপন করেন যাতে এ ধরনের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুরের মৃত্যু হওয়ায় ঈশানচন্দ্রমাণিক্য নিজপুত্র ব্রজেন্দ্র চন্দ্রকে যুবরাজ ও নবদ্বীপচন্দ্রকে বড়ঠাকুর নিযুক্ত করতে মনস্থ করলে ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের ভ্রাতা নীলকৃষ্ণ ঠাকুর ও বীরচন্দ্র ঠাকুর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এই পদলাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে রাজা সম্পূর্ণ স্বাধীন এই যুক্তিতে তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন।

ঈশানচন্দ্রমাণিক্য আগরতলায় একটি নতুন রাজপ্রসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদে প্রবেশের একদিন পর মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে বাতব্যাধিতে আক্রান্ত রাজা পরলোক গমন করেন।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের তিপ্রা বিদ্রোহ

কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্রমাণিক্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁর পরবর্তী ভ্রাতা উপেন্দ্রচন্দ্র এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র যথাক্রমে যুবরাজ এবং বড়ঠাকুর নিযুক্ত হন। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের নয়টি পুত্র ছিল। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য ঈশানচন্দ্রমাণিক্যকে রাজা মনোনীত করায় এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা স্বীকৃত হওয়ায় কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের অপর পুত্রেরা প্রকাশ্যে ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের সিংহাসন প্রাপ্তিতে বিরোধিতা করতে সাহসী না হলেও অনেকেই তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় এবং গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের পিতা কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য ছিলেন বিলাসী এবং অমিতব্যয়ী, যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্য এবং জমিদারি দেনায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রায় এগারো লক্ষ টাকা দেনা ছিল। ঈশানচন্দ্রমাণিক্য রাজা হওয়ার ফলে তাঁকে এই দেনার ভার বহন করতে হল। ঈশানচন্দ্রমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর অনুগত অনুচর বলরাম হাজারিকে রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। বলরাম হাজারি ছিলেন

ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের পিতামহী মহারানি চন্দ্রতারার এক দাসীর পুত্র। সুতরাং রাজপরিবারের অনেকেই বলরামকে দেওয়ান নিযুক্ত করায় ক্রুদ্ধ হন। অবশ্য যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র বলরামের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

দেওয়ান বলরামের প্রধান কাজ হল প্রথমত রাজাকে আর্থিক সংকট থেকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয়ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের ক্রমাগত আর্থিক চাহিদা পূরণ করা। এই উদ্দেশ্যে বলরাম হাজারি শুধু কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় করেই ক্ষান্ত হলেন না। নানাভাবে প্রজাদের করভারে জর্জরিত করতে লাগলেন। এ বিষয়ে তাঁর ভ্রাতা শ্রীদাম হাজারি তাঁর প্রধান সহায় হলেন। এই দুই ভাই-এর অত্যাচারে প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হল। রাজপরিবারের অনেকে যাঁরা বলরামের দেওয়ান নিযুক্তি পছন্দ করেন নি এবং ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন তাঁরা গোপনে প্রজাদের বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাতে লাগলেন।

দেওয়ান বলরাম হাজারি ও তাঁর ভাই শ্রীদাম হাজারির শাসন ও শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে একদল তিপ্রা ও কুকি সম্প্রদায় কীর্তি ও পরীক্ষিৎ নামে দুজন সর্দারের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয় এবং ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে একদিন রাত্রে বলরাম হাজারির বাসভবন আক্রমণ করে। বলরাম হাজারির রক্ষীরা বাধা দিতে গিয়ে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হল। বলরাম হাজারি পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করলেন। কিন্তু শ্রীদাম হাজারি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের এই বিদ্রোহ তিপ্রা বিদ্রোহ নামে পরিচিত। শেষ পর্যন্ত রাজার সেনাদলের তৎপরতায় এই বিদ্রোহ দমন করা হল। বিদ্রোহীদের অনেককেই বন্দি করা হল এবং বিদ্রোহীদের অন্যতম নায়ক কীর্তি যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র প্রেরিত গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হলেন।

এই বিদ্রোহ দমনের পর কোনো এক কারণে বলরাম হাজারি রাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং গোপনে একদল সৈন্য দ্বারা বিদ্রোহ সংঘটিত করে যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সৌভাগ্যক্রমে এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। রাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্য বলরাম হাজারিকে পদচ্যুত করেন এবং অনুচর সহ তাঁকে রাজ থেকে নির্বাসিত করেন। কিছুদিন পর যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ ও ত্রিপুরা

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মহাবিদ্রোহ শুরু হলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর ৩৪নং পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা চট্টগ্রামে বিদ্রোহ করে এবং সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন করে ২২শে নভেম্বর ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে। রাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের পিতা কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের আমল থেকেই ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের

সম্পর্ক বিশেষ ভালো ছিল না। কিন্তু সেই সময় ত্রিপুরার সামরিক শক্তি খুবই দুর্বল ছিল এবং রাজার আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় ছিল। তাছাড়া রাজপরিবারের মধ্যে তখন নানারকম ষড়যন্ত্র চলছিল। এই অবস্থায় বিদ্রোহী সিপাহিদের সাহায্য ও আশ্রয় দিয়ে ইংরাজদের সঙ্গে প্রকাশ্য শত্রুতা করার মতো শক্তি সামর্থ্য ত্রিপুরার রাজার ছিল না। সম্ভবত সেইজন্য তিনি বিদ্রোহী সিপাহিদের ত্রিপুরা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন। বিদ্রোহী সিপাহিরাও রাজার কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাবার আশা নেই জানতে পেরে ত্রিপুরায় কিছুদিন অবস্থানের পর ত্রিপুরা পরিত্যাগ কবে কাছাড় অভিমুখে যাত্রা করে। ত্রিপুরারাজের আদেশ অমান্য করে কয়েকজন সিপাহি আগরতলার কাছাকাছি বসবাস করতে থাকলে ঈশানচন্দ্রমাণিক্য তাদের বন্দি করে কুমিল্লাস্থ ইংরাজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। বিদ্রোহী সিপাহিরা বিনা বাধায় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ ও কিছুদিনের অবস্থান করার ফলে কিছু ইংরাজ কর্মচারী ত্রিপুরাজের বিদ্রোহী সিপাহিদের প্রতি সহানুভূতি ছিল বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এর শাস্তি হিসাবে ত্রিপুরার বাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে স্বাধীন ত্রিপুরার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার দাবিও তাঁরা পেশ করেন। এই অবস্থায় ঈশানচন্দ্রমাণিক্য নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করাব জন্য গোলকচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে প্রতিনিধি হিসাবে কুমিল্লায় ইংরাজ কর্তৃপক্ষেব কাছে প্রেরণ করেন। তৎকালীন ইংরাজ জজ মেটকাফ নিছক সন্দেহ বশে ত্রিপুরার স্বাধীনতা বিলুপ্ত করা সঙ্গত হবে না বলে অভিমত পোষণ করেন। চট্টগ্রামের কমিশনার মিঃ বাকল্যান্ড মন্তব্য করেন যে ত্রিপুরা রাজ্যেব সামবিক দুর্বলতার জন্যই সিপাহিরা ত্রিপুরায় অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করা থেকে বিরত থাকেন। ঈশানচন্দ্রমাণিক্যও শাস্তি থেকে অব্যাহতি পান।

বিদ্রোহী সিপাহিদের প্রতি ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের গোপন সহানুভূতি বা সমর্থন ছিল কি-না তা জানা না গেলেও ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের প্রজারা যে বিদ্রোহী সিপাহিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তা সিপাহিদের পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে নির্বিঘ্নে কিছুদিন বসবাসের মধ্যেই প্রমাণিত হয়। সিপাহিদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত এবং ত্রিপুরার উপজাতীয় প্রজারা রাজার সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে সিপাহিদের বন্দি করা খুব একটা কঠিন কাজ হত না। অবশ্য ত্রিপুরার রাজা তাদের বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছিলেন, বন্দি করার ইচ্ছা রাজার ছিল না। ডক্টর শশিভূষণ চৌধুরি মন্তব্য করেছেন, ''তবু বিদ্রোহী সেনাবাহিনী ত্রিপুরা অতিক্রম করিয়া তাহাদিগের লক্ষ্য ও গন্তব্যের পথে যাইতে, ত্রিপুরার জনসাধারণ হইতে সমর্থন কিছুটা পাইয়া ছিল বলিয়' মনে হয়। কোনো কোনো পার্বত্য শ্রেণী বা জাতি বা সর্দার বিদ্রোহিগণকে সাময়িক আশ্রয় দিয়া তাদের অভিযান অগ্রগামী করিবার সুবিধা দিয়াছিল। রাজ্যের মধ্যবর্তী অমরপুর অঞ্চলে কোনো প্রতাপশালী সর্দার কর্তৃক বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিবার অজুহাতে লাঞ্ছিত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল।''

১৮৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দের কুকি উপদ্রব

ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা চলছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। এই আর্থিক সংকটে ত্রিপুরার উপযুক্ত সংখ্যায় সৈন্য রাখাও সম্ভব ছিল না। মনোনীত কোনো যুবরাজ না থাকায় রাজপরিবারের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র চলেছে। সেই সময় রাজ্যের প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের গুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী। সুদক্ষভাবে রাজস্ব বিভাগ পরিচালনা করে রাজাকে তিনি আর্থিক সংকট থেকে অনেকটা মুক্ত করতে সক্ষম হন। এর ফলে রাজার উপব তাঁর প্রভাব আরো বেড়ে যায়। রাজ্য শাসন ব্যাপারে তাঁর প্রতি রাজা একেবারে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। গুরু বিপিনবিহারী গোস্বামীর কঠোর শাসনে রাজপরিবারের অনেকেই তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং নিজেদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে গভীর অরণ্যে কুকিদের সঙ্গে বসবাস শুরু করন এবং সেখানকার অধিবাসীদের রাজার বিরুদ্ধে নানাভাবে বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাতে থাকেন।

এই সময় পার্বত্য প্রজাদের করের বোঝা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। শুধু ঘর চুক্তি করই বৃদ্ধি পেল না, বাঁশ, রবার, তিল ও কার্পাসের উপরও শুল্ক বৃদ্ধি পেল। এর ফলে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হল রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রজারা। অমিতব্যয়ী হওয়ার ফলে এদের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। তার ওপর অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় এদের ঘর চুক্তি করের হার ছিল বেশি। এজন্য এরা বারবার আবেদন করেও কোনো প্রতিকার পায় নি। এদের অনেকেই মহাজনদের কাছ থেকে ঋণগ্রহণ করতে বাধ্য হত। ক্রমাগত কয়েক বছর বৃষ্টি না হওয়ায় পার্বত্য অঞ্চলের ফসল উৎপাদন ব্যাহত হল। ফলে মহাজনদের কাছে ঋণের বোঝাও বেড়ে গেল। মহাজনদের মধ্যে অনেকেই খণ্ডল পরগনায় বাস করতেন। মহাজনেরা ঋণশোধের জন্য তাগাদা দিতে থাকায় রিয়াং প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে কুকিদের আক্রমণে সাহায্য করে।

এদিকে ত্রিপুরার রাজার কিছু লোক ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য দুপথুং সম্প্রদায়ের কুকিদের আক্রমণ করলে ঐ সম্প্রদায়ের কুকিদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। এই বিক্ষোভকে কাজে লাগালেন কুকিদের মধ্যে আত্মগোপনকারী ত্রিপুরার রাজপরিবারের কিছু সংখ্যক ঠাকুর শ্রেণীর লোকেরা। এঁরা এই সুযোগে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কুকিদের ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করতে প্রলুব্ধ করতে লাগলেন। কুকিদের এই আক্রমণে ত্রিপুরা রাজ্যের করভারে জর্জরিত বেশ কিছু সংখ্যক প্রজা সাহায্য করে এবং তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে লুণ্ঠন কার্যে অংশগ্রহণ করে।

ত্রিপুরা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবাধ লুঠতরাজের পর রতন পুইয়ার নেতৃত্বে আনুমানিক চারশত থেকে পাঁচশত কুকি খণ্ডল পরগনায় প্রবেশ করল। তারা ছাগলনাইয়া থানার অন্তর্গত পনেরখানি গ্রাম ভস্মীভূত, একশত পঁচাশি জনকে হত্যা এবং একশত

জনকে বন্দি করে নিয়ে যায়। এই সমস্ত গ্রামগুলি ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত হলেও এগুলির অধিকাংশই ছিল ত্রিপুরারাজের জমিদারি অর্ন্তভুক্ত। ঐ সময়ে গুমাগাজি নামে একজন সাহসী ব্যক্তি কিছু সংখ্যক বন্দুক ও লোক সংগ্রহ করে কুকিদের অগ্রগতিতে বাধা দেন। এদিকে ত্রিপুরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই আক্রমণের খবর পেয়ে সশস্ত্র পুলিশ প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের আসার আগেই কুকিরা গভীর জঙ্গলে পলায়ন করে। কুকিরা গ্রামগুলি থেকে সোনা, রুপা ও লোহা লণ্ঠন করে নিয়ে যায়।

কুকিরা এবং তাদের সহযোগী রিয়াংরা তাদের আক্রমণ কেবলমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্রিটিশ এলাকা কেন আক্রমণ করেছিল তা অনেকটা রহস্যাবৃত থেকে গেছে। সম্ভবত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে ত্রিপুরার রাজাকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করার জন্য। ত্রিপুরার রাজার বিরোধী পক্ষীয়রা কুকিদের ত্রিপুরা বাজ্য অতিক্রম করে ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত ত্রিপুরারাজের জমিদারিতে আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ করে। ত্রিপুরা রাজার জমিদারি বহির্ভূত ব্রিটিশ এলাকার কয়েকটি আক্রমণ হয়ত ভুলবশত ঘটে থাকবে। তাছাড়া খগুলের মহাজনদের আক্রমণে কুকিদের ঋণগ্রস্ত রিয়াংরাই প্ররোচিত করেছিল।

এই আক্রমণের পর পার্বত্য অঞ্চলের জন্য ইংরাজ সবকার একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত করেন। সুপারিনটেন্ডেন্টের প্রধান কাজ ছিল এই সমস্ত হামলা সম্পর্কে ইংরাজ সামরিক বাহিনীকে বিস্তারিতভাবে খোঁজ খবর দিয়ে সাহায্য করা। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ক্যাপ্টেন রাবানের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্য কুকিসর্দার রতন পুঁইয়াকে শাস্তি দেবার জন্য তার গ্রামে অভিযান করে। কুকিরা অবশ্য তাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ না করে নিজেদের গ্রাম অগ্নিদগ্ধ করে গভীর জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্যাপ্টেন বাবান যখন কুকি গ্রামের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় একদল কুকি উদয়পুর আক্রমণ করে। তারা উদয়পুরের নিকটবর্তী চন্দ্রপুরের একটি বড়ো বাজার ধ্বংস করে এবং তিনটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। তাদের আক্রমণে দেড়শত লোক নিহত এবং দুইশত লোক বন্দি হয়। ত্রিপুরার তথাকথিত রাজভক্ত কিছুসংখ্যক রিয়াং প্রজা গোপনে লুণ্ঠনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। এই ঘটনার সংবাদ পেয়ে ত্রিপুরার রাজা আগরতলা থেকে একদল সৈন্য উদয়পুর প্রেরণ করেন। ত্রিপুরা জেলা থেকেও একদল ব্রিটিশ ফৌজ ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে উদয়পুর রওনা হয়ে যায়। পলাতক কুকিদের সঙ্গে ব্রিটিশ ফৌজের একটা খণ্ডযুদ্ধে কিছু কুকি নিহত হয়। বাকিরা গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের কুকি আক্রমণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহী ভ্রাতা নীলকৃষ্ণ ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে শেষ পর্যন্ত তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের উদয়পুরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কিছু ব্যক্তি কুমিল্লায় আটক করা হলেও ত্রিপুরা

সরকার এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করায় তাদেরও ছেড়ে দেওয়া হল।

এইসব ঘটনার জন্য ব্রিটিশ সরকার ত্রিপুরার রাজার প্রতি খুবই বিরক্ত হন। তাঁর শাসনের অযোগ্যতার ফলেই এইসব উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সীমান্তে উপযুক্ত রক্ষী বাহিনী না রাখায় কুকিরা ত্রিপুরার রাজ্যের সীমাও অতিক্রম করে ব্রিটিশ এলাকায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এমন ধরনের কথাও শোনা যেতে লাগল যে এ ধরনের ঘটনা ক্রমাগত চলতে থাকলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পার্বত্য ত্রিপুরাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের খাস এলাকাভুক্ত করতেও বাধ্য হবেন। ব্রিটিশ এলাকাস্থিত ত্রিপুরারাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষিত করার ব্যাপারে ত্রিপুরা সবকার যাতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এই উদ্দেশ্যে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত সুপারিনটেণ্ডেন্ট ক্যাপ্টেনগ্রাহামকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আগরতলায় প্রেরণ করেন। ক্যাপ্টে ন গ্রাহাম আগরতলায় ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সীমান্ত রক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা করেন এবং কুমিল্লায় কমিশনারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। ত্রিপুরার রাজা সীমান্ত সুরক্ষার ব্যাপারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সম্মত হলেন। এই ব্যবস্থা ছাড়াও কুকিদের শান্ত রাখার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সুপারিনটেন্ডেন্ট ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কুকি সর্দার রতন পুঁইয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এই যুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে সীমান্ত প্রদেশে শান্তি রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রতিবছর রতন পুঁইয়াকে চারিশত টাকা পুরস্কার স্বরূপ দেবেন। রতন পুঁইয়ার মাধ্যমে হাউলাং এবং সাইলো কুকি সর্দারদের সঙ্গেও চুক্তি করা হল এবং এদের প্রত্যেককে শান্তি রক্ষার পুরস্কার স্বরূপ আটশত টাকা করে দেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়। এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ব্রিটিশ শাসিত এলাকার উত্তর অঞ্চল কিছুটা নিরাপদ হলেও ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি।

১৮৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দের কুকি আক্রমণকে নিছক আক্রমণ বললে ভুল হবে। এই আক্রমণের সঙ্গে জড়িত ছিল মহাজনি ঋণগ্রস্ত ত্রিপুরার রিয়াং প্রজা এবং করভারে জর্জরিত ত্রিপুরা রাজ্যের এক শ্রেণীর প্রজা, যারা কুকিদের ত্রিপুরা আক্রমণে আহ্বান জানিয়েছিল। এ ছাড়াও রাজপরিবারের কিছু বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এদের সম্মিলিত অভিযান কুকি আক্রমণকে প্রজা বিদ্রোহে রূপান্তরিত করল।

পঞ্চম অধ্যায়

আধুনিক যুগের সূচনা

বীরচন্দ্রমাণিক্য

ঈশানচন্দ্রমাণিক্য ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট পরলোক গমন করলে তাঁর ভ্রাতা বীরচন্দ্র ত্রিপুরার রাজা হন। কিন্তু তাঁর অপর দুই ভ্রাতা চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণ ঠাকুর ত্রিপুরার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসাবে দাবি করে বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হন। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর বীরচন্দ্রকে ডিফেক্টো বা কার্যত রাজা বলে স্বীকার করেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মার্চ প্রিভিকাউন্সিল বীরচন্দ্রের স্বপক্ষে রায় দিলে ইংরেজ সরকারের অনুমতি লাভ করে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৯ই মার্চ মহাসমারোহে বীরচন্দ্রমাণিক্যের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তিনি ১২৫টি স্বর্ণমুদ্রা ব্রিটিশ সরকারকে নজর প্রদান করেছিলেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দেব ২৮শে নভেম্বর ব্রিটিশ সরকার বীরচন্দ্রমাণিক্যকে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। অবশ্য মহারাজা উপাধিটি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হয়, তাঁর বংশধরদের জন্য নয়। খেলাত ও মহারাজা উপাধি প্রাপ্তির জন্য বীরচন্দ্রমাণিক্যকে ব্রিটিশ সরকারকে তিন হাজার টাকা নজর প্রদান করতে হয়োছল।

ইতিমধ্যে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হয়ে জামাতিয়া সম্প্রদায় সর্দার পরীক্ষিতের নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু করে। বীরচন্দ্রমাণিক্য দুর্দান্ত কুকিদের সাহায্যে কঠোরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেন।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে 'স্বাধীন ত্রিপুরার' স্থলে 'পার্বত্য ত্রিপুরা' সরকারি কাগজ পত্রে লিখিত হতে থাকে। এর ফলে ত্রিপুরার রাজ্যের ক্ষেত্রে সম্মানজনক 'স্বাধীন' কথাটির বিলোপ ঘটে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চের ভারত সরকারের 'নজরানা রিজলিউশন' অনুযায়ী ত্রিপুরার রাজার মৃত্যুর পর পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করলে ত্রিপুরা রাজ্যের এক বৎসরের রাজস্বের অর্ধাংশ এবং পুত্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হলে এক বৎসরের সমস্ত রাজস্ব নজর প্রদান করতে হবে বলে স্থির হয়।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দুইশত থেকে তিনশত কুকি সম্প্রদায়ের লোক

ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণ করে মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং হত্যা ও লুঠতরাজ চালায়। এর পর তারা কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলায় প্রবেশ করে কিছু ইংরেজ হত্যা, লুঠতরাজ ও কিছু লোককে বন্দি করে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ব্রিটিশ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা ও কুকি বা লুসাই উৎপাত স্থায়ীভাবে বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কুকিদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান চালান। বীরচন্দ্রমাণিক্য এই অভিযানে নানাভাবে সাহায্য করেন। ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধক্রমে সীমান্তে কয়েকটি চৌকি স্থাপন করেন এবং একদল সৈন্য সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত রাখেন। এই অভিযানের সময় ত্রিপুরার পূর্ব সীমান্তের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্রিটিশদের তত্ত্বাবধানে আনা হয় এবং তা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘোষণা বলে স্থায়ী ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়।

ব্রিটিশ সরকারের সীমান্তে স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জুলাই এ. ডবলিউ বি. পাওয়ার আগরতলায় ত্রিপুরার প্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন। এ ব্যাপারে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ত্রিপুরা রাজকে এই বলে আশস্ত করেছিলেন যে পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থের কোনো হানি হবে না। ত্রিপুরার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। বীরচন্দ্রমাণিক্য অবশ্য এই নিযুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের আগরতলায় পলিটিক্যাল এজেন্টের নিয়োগ রদ করা হয় এবং জেলা ত্রিপুরার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এক্স অফিশিও বা পদাধিকার বলে পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উমাকান্ত দাসকে আগরতলায় সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে স্থির হয় যে মহারাজা পলিটিক্যাল এজেন্টের পরামর্শ নিয়ে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরার মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এরপর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজকে প্রশাসনিক ক্ষমতা ফেরত দেওয়া হয় এই শর্তে যে তিনি প্রতি বৎসর বার্ষিক রিপোর্ট সরবরাহ করবেন এবং কমিশনার কুমিল্লা এলে প্রতি বৎসর নিজে অথবা যুবরাজ ও বড়ঠাকুর কুমিল্লায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আগরতলায় সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্টের পদ বিলোপ করা হল।

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরা আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। আইন, প্রশাসন, শিক্ষা, সমাজ, সংস্কার প্রভৃতি সকল দিক থেকেই ত্রিপুরাকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। এ ব্যাপারে মহারাজার ব্যক্তিগত আগ্রহের চাইতে ত্রিপুরায় নিযুক্ত ব্রিটিশ প্রশাসনে অভিজ্ঞ কিছু কর্মচারী ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রচেষ্টায় তা কার্যকর করা সম্ভব হয়। আগরতালয় পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হবার পর তাঁর উপদেশ অনুসারে

বিচার বিভাগের সংস্কার সাধিত হয়। চাকলা রোশনাবাদের দেওয়ান ঈশানচন্দ্র গুপ্তের তত্ত্বাবধানে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী (আইন) প্রণীত হয়। পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে সুসংবদ্ধভাবে লিখিত আইন ছিল না। পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি সংক্রান্ত বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি রাজা নিজে করতেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই সব মোকদ্দমার বিচারের জন্য প্রিভি কাউন্সিলের অনুকরণে খাস আদালত নামে একটি বিচারালয় স্থাপিত হয়। মঞ্জুরি দানের ক্ষমতা রাজার হাতে রাখা হয়। খাস আদালতের জন্য দুজন বিচারক নিযুক্ত হন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে নীলমণি দাস ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব-ক্ষমতাযুক্ত দেওয়ান নিযুক্ত হলে আইন ও প্রশাসনিক সংস্কারের গতিবেগ আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি কার্যভার গ্রহণ করে ব্রিটিশদের অনুকরণে আবগারী (মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত) বিভাগ, স্ট্যাম্প ব্যবহারের প্রচলন, দলিল রেজিস্টারি নিয়ম প্রবর্তন করেন। তিনি দেওয়ানি ও ফৌজদারি সংক্রান্ত আইন সংশোধন এবং তামাদি আইন প্রণয়ন করেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরায় নরহত্যাকারীকে প্রথম ফাঁসি দ্বারা প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি উকিলদের পরীক্ষার প্রথাও প্রবর্তন করেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার পার্বত্য প্রজার জন্য 'পাহাড় আদালত' নামক বিচারালয় রদ করে রাজ্যের সকল প্রজাকে একই বিচার ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মোহিনীমোহন বর্ধন মন্ত্রী নিযুক্ত হলে (দুই বৎসরের শাসনকালে) তাঁর সময়ে চিফ জাস্টিসের পদ সৃষ্টি করে যুবরাজকে খাস আপিল আদালতের প্রধান বিচারপতি মনোনীত করা হয়। মোহিনীবাবু প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, কর্মচারীদের বিদায় সম্বন্ধীয় আইন ও নাবালকদের সম্পত্তি রক্ষা বিষয়ক বিধান প্রভৃতি আইন চালু করেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সংস্কার সাধিত হল। তিনি মন্ত্রিপদের সৃষ্টি করে তাঁকেই প্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দান করেন। রাজ্যের ব্যয় সীমিত করার জন্য বাজেট প্রবর্তনের চেষ্টা করা হল। প্রশাসনের সুবিধার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যকে তিনি ভাগে বিভক্ত করা হল। উত্তর বিভাগ, মধ্য বিভাগ ও দক্ষিণ বিভাগ। বিভাগগুলির প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল যথাক্রমে কৈলাসহর, আগরতলা ও উদয়পুর (পরে সোনামুড়া)। সেনাবাহিনীকেও আধুনিকভাবে সুশিক্ষিত করা হল। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে আগরতলায় মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হল ত্রিপুরার পলিটিক্যাল এজেন্ট। সারা ভারতের সঙ্গে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্রিপুরাতেও লোকগণনা বা সেন্সাস কার্য আরম্ভ হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর স্থাপিত হয় আগরতলায় ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম পোস্ট অফিস। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে স্থাপিত হয় আগরতলায় নতুন হাবেলি দাতব্য চিকিৎসালয়। ইংরেজি শিক্ষার জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম হাইস্কুল ''আগরতলা সরকারি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়'' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর। এই স্কুলটিই পরবর্তী কালে (১৯০৪ খ্রিঃ অব্দ থেকে) উমাকান্ত একাডেমি নামে পরিচিত হয়। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যই প্রথম রাজ্যবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব সরকারি ভাবে গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে

উল্লেখযোগ্য এই যে বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে ত্রিপুরায় দাস ও সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হয়। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের আইনে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হলেও ত্রিপুরায় তা অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকাবের অনুরোধ ক্রমে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুরায় ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করে দেন। সতীদাহ প্রথাও ত্রিপুরায় অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এক ঘোষণা বলে ভারতে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথা অব্যাহত থাকে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের নির্দেশ অনুসারে চট্টগ্রামের কমিশনার লায়াল ত্রিপুরার এসিস্ট্যান্ট উমাকান্ত দাসকে এ ব্যাপারে চিঠি লেখেন। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য সতীদাহ প্রথা বিলোপের পক্ষপাতী ছিলেন না। রাজদরবারের সঙ্গে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দীর্ঘ বাক্‌বিতণ্ডার পর এসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট উমাকান্ত দাসের মধ্যস্থতায় ও মন্ত্রী মোহনীমোহন বর্ধনের উদ্যোগে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মে এক ঘোষণা দ্বারা ত্রিপুরায় সতীদাহ প্রথান নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ত্রিপুরি সম্প্রদায়কে রাজপরিবারের মতো হিন্দু ক্ষত্রিয় পর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টা হলে মহারাজা এতে বিশেষ উৎসাহ দেন। বাঙালি হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ কবেন। যেসব কর্মচারী এর বিরোধিতা করেছিল তাদের চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। বিক্রমপুব থেকে কিছু পণ্ডিত এনে অর্থেব প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করা হয়। শেষ পর্যন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি বাংলা, উর্দু, মণিপুরি এবং ত্রিপুরি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতনে। ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তকাদি নিয়মিত পাঠ করতেন। তিনি একজন সুনিপুণ চিত্রকর ও ফটোগ্রাফার ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি একজন কবি ও কাব্য রসিক ছিলেন এবং বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'প্রেমমরীচিকা', 'আকালকুসুম', 'উচ্ছ্বাস', ''ঝুলন' ইত্যাদি। তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন, ''তিনি নিজে যেমন গুণী ছিলেন তেমনি জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদেরও সমাদর করতেন। তাঁর দরবারে বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গায়ক যদুভট্ট তাঁর দরবারে সমাদৃত হয়েছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগী বীবচন্দ্রমাণিক্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেন এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থখানি তাঁরই অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। রাজমহিষ ভানুমতী দেবীর

মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য

অকালমৃত্যুতে মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য যখন শোকে আচ্ছন্ন সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নহৃদয় কাব্য গ্রন্থ পাঠ করে তিনি সান্ত্বনা লাভ করেন। তিনি রাধারমণ ঘোষকে ব্যক্তিগত দূত হিসাবে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রেরণ করে অভিনন্দন জানান এবং রবীন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত কবি হবেন সে সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেন। সেই সময় থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁর কন্যা অনঙ্গমোহিনী দেবীও 'কণিকা' 'লোকগাথা', 'প্রীতি' নামে কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। পুত্র সমরেন্দ্রও কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও জ্ঞানীগুণীর পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ করে ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন বীরচন্দ্রমাণিক্যকে বাংলার বিক্রমাদিত্য বলে অভিহিত করেছেন। হান্টার মন্তব্য করেছেন যে বীরচন্দ্রমাণিক্য প্রশাসনিক কার্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। এগুলি তিনি দেওয়ান ও আমলাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক চর্চার দিকে অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতায় মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য পরলোক গমন করেন।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের জমাতিয়া বিদ্রোহ

ত্রিপুরার রাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্য ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের পয়লা আগস্ট পরলোক গমন করলে তাঁর ভ্রাতা বীরচন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন। কিন্তু ত্রিপুরার সিংহাসনে আরো অনেক দাবিদার ছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বীরচন্দ্রমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নীলকৃষ্ণ ঠাকুর। বীরচন্দ্রমাণিক্য ইংরাজ সরকারকে ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ঈশানচন্দ্রমাণিক্য মৃত্যুর পূর্বে বীরচন্দ্রমাণিক্যকে যুবরাজ নির্বাচিত করেন এবং ত্রিপুরার নিয়ম অনুসারে রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজই রাজা হন। ইংরাজ সরকারও বীরচন্দ্রমাণিক্যকে ত্রিপুরার রাজা হিসাবে মেনে নেন। ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তার বিস্তীর্ণ জমিদারি ছিল এবং সেখানকার জমিদার হিসাবে ইংরাজ সরকারের মতামত গ্রহণ করতে ত্রিপুরার রাজারা বাধ্য হতেন। নীলকৃষ্ণ ঠাকুর ইংরাজ সরকারের কাছে আবেদন জানালেন যে বীরচন্দ্রমাণিক্যকে রাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্য কোনোদিনই যুবরাজ নির্বাচিত করেননি। বরং বয়সের দিক থেকে বিচার করলে নীলকৃষ্ণ ঠাকুর ত্রিপুরার সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। এই দাবি তিনি আদালতেও পেশ করলেন। এদিকে রাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের গুরু বিপিনবিহারী গোস্বামীকে বীরচন্দ্রমাণিক্য হঠাৎ নজরবন্দি করে রাখলেন। ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালে ইনিই রাজ্যের সর্বেসর্বা ছিলেন। এঁর কঠোর শাসনে রাজপরিবারের অনেকেই অসন্তুষ্ট হন। এই সমস্ত লোকদের সন্তুষ্ট করে নীলকৃষ্ণের বিরুদ্ধে স্বপক্ষে আনার জন্যই সম্ভবত বীরচন্দ্রমাণিক্য গুরুকে ক্ষমতাচ্যুত করে নজরবন্দি করে রাখেন। বিপিনবিহারী গোস্বামী ক্ষমতাচ্যুত হলে রাজপরিবারের সকলেই আবার

আগের মতো ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। তাঁদের অনেকেই নিজ স্বার্থ সাধনের দিকে মন দিলেন। প্রজাদের ওপর শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। এমনি এক পরিবেশে সংঘটিত হল ১৮৬৩ সালের জমাতিয়া বিদ্রোহ।

ত্রিপুরার উপজাতিদের অন্যতম জমাতিয়া উপজাতি যুদ্ধের সময় রাজার সেনাবাহিনীতে কাজ করত আর শান্তির সময়ে কৃষিকার্যে ব্যস্ত থাকত। বাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য সংবাদ পেলেন এই জমাতিয়ারা নীলকৃষ্ণ ঠাকুর ও তাঁর অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্ররোচনায় খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিতে এবং খাজনা আদায় করতে ওয়াখিয়ার হাজারি নামে একজন রাজকর্মচারীকে তিনি জমাতিয়া অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ওয়াখিয়ার হাজারি ছিলেন রাজদরবারে জমাতিয়াদের প্রতিনিধি বা মিসিপ এবং তাদের স্বজাতি। ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের নিয়ম অনুসারে রাজকর্মচারীদের এবং তাদের মালপত্তর স্থানীয় লোকদের বিনা পারিশ্রমিকে বহন করতে হত। এই প্রথাকে বলা হত তৈথুং। জমাতিয়াদের অবশ্য এই ধরনের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হত। কিন্তু ওয়াখিয়ার হাজারি ও তাঁব সঙ্গীরা জমাতিয়াদের কাছ থেকে এই সুযোগ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করলে উভয়পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হল এবং শেষ পর্যন্ত খাজনা আদায় স্থগিত রেখে ওয়াখিয়ার হাজারি রাজধানী আগরতলায় এসে রাজাকে জানালেন জমাতিযারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ঠাকুর নীলকৃষ্ণের সঙ্গে বীরচন্দ্রমাণিক্যের মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জমাতিয়ারা খাজনা দিতে যে ইতস্তত কবছিল এটা সত্যি কথা। রাজাও এ বিষয়ে আর কোনো অনুসন্ধান না করে একদল সৈন্যকে জমাতিয়াদের গ্রামে পাঠালেন জোর করে খাজনা আদায় করতে। বন্দুকধারী সৈন্যদের দেখে জমাতিয়ারা আরো খেপে যায়। ফলে দুপক্ষের মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই সংঘর্ষে দুজন জমাতিয়া নিহত হলে তাদের মস্তক ছেদন করে সৈন্যরা রাজার কাছে নিয়ে যায়। এরপর জমাতিয়ারা সর্দার পরীক্ষিৎ-এর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হল।

রাজা বীরচন্দ্র সেইসময় কার্যোপলক্ষে উদয়পুরে অবস্থান করছিলেন। বিদ্রোহীদের আবাসস্থলও ছিল উদয়পুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে। বিদ্রোহীরা উদয়পুরের প্রাসাদ আক্রমণ করলে রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য উদয়পুর পরিত্যাগ করে আগরতলা চলে আসেন এবং বিদ্রোহ দমন করতে একদল সেনা উদয়পুরে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীরা সেই সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে।

সেনাবাহিনী দ্বারা এই বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হলে রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য কৈলাসহরের কুকিদের শরণাপন্ন হলেন। কুকি সর্দার মরছুই লালা ও হাপপুই লালা যথাক্রমে চংকুয়ালা ও চণ্ডঅকার নামে দুই সেনাপতির অধীনে মোট ছয়শত কুকিকে রাজার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। কুকিরা জমাতিয়াদের গ্রামগুলি ঘিরে ফেলে এবং ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে

জমাতিয়াদের যুদ্ধে আহ্বান করে। দুইশত জমাতিয়া যুবক সর্দার পরীক্ষিৎ-এর নেতৃত্বে কুকিদের বাধা দিতে এগিয়ে যায়। যুদ্ধে দুইশত জমাতিয়া প্রাণ বিসর্জন দেয়। বহুগ্রাম কুকিরা জ্বালিয়ে দিয়ে আহত পরীক্ষিৎ সর্দার সহ কিছু জমাতিয়াকে বন্দি করে আগরতলায় রাজার কাছে নিয়ে আসে। কুকিরা যুদ্ধে নিহত দুইশত জমাতিয়া যুবকের মস্তক ছিন্ন করে তা বর্শফলকে বিদ্ধ করে আগরতলায় নিয়ে এসেছিল এবং জনসাধারণের মনে ভীতিসঞ্চারের জন্য সেই ছিন্ন মস্তকগুলি গাছে ঝুলিয়া রাখা হল। এছাড়াও কুকিরা জমাতিয়া গ্রাম থেকে নয় থেকে তেরো বছর বয়সের বহু বালিকা ধরে নিয়ে এসেছিল। রাজা পার্বত্য প্রথা অনুযায়ী কিছু অর্থের বিনিময়ে কুকিদের কাছ থেকে জমাতিয়া বালিকাদের মুক্ত করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য শেষ পর্যন্ত পরীক্ষিৎ সর্দার ও অন্যান্য বন্দিদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করে মুক্তি দেন। সেই সময় থেকে অনেকেই মাংস ও মদ্যপান পরিত্যাগ করে এবং রাজার প্রতি অনুগত থাকে।

এই ঘটনায় ব্রিটিশ সরকার বেশ বিব্রত বোধ করেছিল কারণ জমাতিয়া বিদ্রোহের সময় অনেক জমাতিয়াই ভীত হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ব্রিটিশ রাজ্যে আশ্রয় নেয়। ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ব্রিটিশ রাজ্যে এই বিদ্রোহের যাতে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে না পারে সেজন্য ব্রিটিশ সরকার বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করে। রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যকেও এ বিষয়ে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে উপদেশ দেয়। বীরচন্দ্রমাণিক্য ইংরাজ সরকারকে জানালেন যে তিনি জমাতিয়াদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছেন। ভবিষ্যতে এরকম আর বিদ্রোহ হবে না। এইভাবে ত্রিপুরায় জমাতিয়া বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

জমাতিয়া বিদ্রোহ পার্বত্য বা স্বাধীন ত্রিপুরায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ উল্লেখযোগ্য প্রজাবিদ্রোহ। এরপরে উল্লেখযোগ্য প্রজাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে ১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহ। অবশ্য জমাতিয়া বিদ্রোহের পর ত্রিপুরা বেশ কয়েকবার কুকিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে দুইশত থেকে তিনশত কুকি ত্রিপুরা রাজ্যের বেশ কয়েকটি গ্রাম আক্রমণ করে লুণ্ঠন ও হত্যা করে। ত্রিপুরা রাজার গুর্খা সেনাপতি লালবাহাদুর মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনী নিয়ে বীরত্ব সহকারে কুকিদের অগ্রগতিতে বাধা দান করে এবং বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়।

ছাগলনাইয়া অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন

১৮৭০ এর দশকে পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকেরা এক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। বিভিন্ন সংঘের মধ্য দিয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্থির করে যে তারা আর খাজনা দেবে না। কৃষকদের প্রতি জমিদারদের অত্যাচার খাজনার মাত্রা বৃদ্ধি এবং জমির উপর কৃষকদের যাতে অধিকার না জন্মে তার জন্য যথেচ্ছ বল

প্রয়োগ ছিল এই কৃষক আন্দোলনের প্রধান কারণ। ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দের পাবনার বিখ্যাত কৃষক বিদ্রোহ ছাড়াও কৃষক আন্দোলন পূর্ববাংলার ঢাকা, ময়মনসিং, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, বগুড়া এবং রাজশাহি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। এইসব কৃষক আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম ছিল তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার ছাগলনাইয়া অঞ্চলের কৃষক আন্দোলন।

ব্রিটিশ শাসিত ত্রিপুরা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পার্বত্য ত্রিপুরার রাজাদের জমিদারি ছিল। এইসব সমতল অঞ্চলের জমিদারি ত্রিপুরার রাজারা নিজেদের অনুগত কয়েকজন সামরিক কর্মচারীকে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারা দিতেন। রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে মেজর ভৈরব সিংহ এবং ক্যাপ্টেন ধরণী ধর প্রমুখ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের এই সব জমি ইজারা দেওয়া হয়। তাঁরাও আবার তাঁদের ইজারাপ্রাপ্ত জমিগুলি নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ রাজস্বের বিনিময়ে ছোটো ছোটো ইজারাদারদের মধ্যে বিলিই করে দেন। নিলামের সময় জমির পূর্বকালের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কোনো নথিপত্র দেওয়া হত না। সুতরাং নতুন ইজারাদারেরা পূর্বরাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতেন। এই অজ্ঞতার ফলে তাঁরা অনেক সময় পূর্বরাজস্বের পরিমাণ থেকে অনেক বেশি পরিমাণ রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হতেন। তাঁরা এই অধিক পরিমাণ রাজস্ব তাঁদের নবলব্ধ জমির প্রজাদের কাছ থেকে আদায়ের চেষ্টা করতেন। ফলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, প্রজা এবং ইজারাদারদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

জমিদার বা ইজারাদারদের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের কৃষকেরা সংঘবদ্ধভাবে এক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে এবং ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। নতুন ইজারাদার কর্তৃক কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় এবং কঠোর প্রকৃতির জমিদার সুলভ মনোভাবের ফলে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এইসব অঞ্চলের কৃষকেরা ছিল তৎকালীন চট্টগ্রামের কমিশনারের ভাষায়, 'দুর্দান্ত এবং অবাধ্য প্রকৃতির', সুতরাং দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে সোনামুড়া অঞ্চলে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ইজারাদার কর্তৃক বনজ সম্পদের উপর অতিরিক্ত মাশুল আদায়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটে গেছে। ছাগলনাইয়ার কৃষক আন্দোলনকারীরা ইজারাদারদের বর্ধিতহারে খাজনা আদায়ের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করে ব্যর্থ করে দেয়। ইজারাদারেরা বল প্রয়োগ করে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করলে কৃষক আন্দোলনকারীরাও সংঘবদ্ধভাবে বল প্রয়োগ করে তার প্রতিরোধ করে। এমনকী ইজারাদারেরা বা তাঁদের নায়েব গোমস্তারা গ্রামগুলিতে খাজনা আদায় করতে এলে আন্দোলকারীরা তাদের বিতাড়িত করে দেয়। এর ফলে ঐসব অঞ্চলে বেশ কিছু সংঘর্ষ চলতে থাকে। এইসব সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য স্থানীয় পুলিশের সংখ্যা

যথেষ্ট না থাকায় ত্রিপুরার জেলাশাসক সেখানে আরও পুলিশবাহিনী পাঠাতে মনস্থ করেন। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারও বাংলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত পত্রে এ ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

খাজনা বন্ধ আন্দোলনে যাতে সকলে অংশ গ্রহণ করে তার জন্য ছাগলনাইয়ার আন্দোলনকারীরা একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে। যে ব্যক্তি এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে চাইত না তার বাড়ির সামনে আন্দোলনকারীরা একটা বাঁশের সঙ্গে এক গুচ্ছ শুকনো খড় বেঁধে এমনভাবে রাত্রে রেখে দিত যাতে ভোরবেলা উঠেই তার এই বাঁশ সহ খড়গুচ্ছ চোখে পড়ে। এর তাৎপর্য হল এই যে, যদি উক্ত ব্যক্তি এর পরেও আন্দোলনকারীদের দলভুক্ত না হয় তবে তার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। তাদের এই খাজনা বন্ধের আন্দোলন খণ্ডল, জুলাই, চন্দ্রনগর, রুথনগর, জুলাই গঙ্গানগর, জগৎপুর প্রভৃতি এলাকা অতিক্রম করে সমগ্র ত্রিপুরা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তর অংশেও এ ধরনের প্রতিরোধ সংঘ গড়ে উঠেছিল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। বাবু নীলমণি দাস ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত হলে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি এইসব অঞ্চল পরিদর্শন করে ইজারাদার ও কৃষকদের মধ্যে একটা আপসের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই আন্তরিক প্রয়াস আংশিক সফল হয়েছিল মাত্র এবং ১৮৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরার রাজা বা তাঁর অধীনস্থ খাজনা আদায়কারীদের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্কের তখনো বিশেষ উন্নতি হয় নি। ত্রিপুরা জেলাসহ পূর্ববাংলার সংঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইংরাজ সরকার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমি রাজস্ব আইন বিধিবদ্ধ করেন। এতে কৃকদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিলে ধীরে ধীরে এই আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পায়।

রাধাকিশোরমাণিক্য

বীরচন্দ্রমাণিক্য ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করলে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাকিশোর ত্রিপুরার শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের পাঁচই মার্চ ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের উপস্থিতিতে আগরতলায় মহাসমারোহে রাধাকিশোরমাণিক্যের রাজ্যাভিষেক হয়। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তিনি রাজা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি পুত্র বীরেন্দ্রকিশোরকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুবরাজ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে রাধাকিশোরমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন আদালতের শরণাপন্ন হন। কিন্তু মামলায় তাঁর পরাজয় ঘটে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার একটি সনদের মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে রাজা তাঁর পরিবারভুক্ত ব্যক্তিকে যুবরাজ বা সিংহাসনের

উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতে পারেন তবে তা ভারত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ হতে হবে।

যুবরাজ থাকাকালে রাধাকিশোরমাণিক্য শাসনকার্যে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। রাজা হবার পর তিনি প্রশাসনকে আরো গতিশীল করেন। রাজ্য ও জমিদারি সংক্রান্ত কাজ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে একটি কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হয়। আইন প্রণয়ন ইত্যাদি কাজের জন্য ঐ বৎসর ব্যবস্থাপক সভাও পুনর্গঠিত হয়। প্রশাসনের সুবিধার জন্য পূর্বের তিনটি বিভাগের স্থলে পাঁচটি (বর্তমানের মহকুমাতুল্য) বিভাগ সৃষ্টি করা হয় এবং এই নতুন দুটি বিভাগের কর্মকেন্দ্র হল বিলোনিয়া ও খোয়াই। পুলিশ বিভাগকে তহশিল ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। রাজস্ব ও বিচার বিভাগকেও পুনর্বিন্যাস করা হয়। কৃষি ও শিল্পের জন্য পৃথক বিভাগ গঠিত হয়। রাজ্যের খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য একটি ভূতাত্ত্বিক বিভাগ গঠিত হয়। বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিগত' ও 'রাজ্যগত' এই দুইভাগে বরাদ্দ করার প্রথা চালু করা হয়। জঙ্গল ও পতিত জমিতে চাষ আবাদে উৎসাহ দেওয়া হয়। ব্যাপক ভূমিসংস্কারের ফলে রাজস্বও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সারা রাজ্যে জরিপও শুরু হয় তাঁর আমলেও। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে রেশম ও তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য কাশীপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

রাধাকিশোরমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণের পর এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যে উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের অভাব হেতু কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দেওয়ায় পার্বত্য অঞ্চলে প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। রাধাকিশোরমাণিক্য বিনামূল্যে দুঃস্থ প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করেন। তাছাড়া তিনি কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করেন এবং বীজধান বিনামূল্যে দুঃস্থ জুমিয়াদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে খরা হেতু ধান ও তুলা উৎপাদন কমে গেলে তিনি কিছুদিনের জন্য পার্বত্য প্রজাদের খাজনা মকুব করেন। প্রজাদের উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি আগরতলায় একটি অবৈতনিক কলেজ স্থাপন করেন। কিন্তু কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায়। কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপনে তিনি অর্থসাহায্য দিয়েছিলেন। আগরতলায় প্রজাদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালের সূচনা করেন। মন্ত্রী পদে উমাকান্ত দাসের দক্ষতার স্বীকৃতি হিসাবে 'আগরতলা সরকারি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়'' এর নামকরণ করা হয় ''উমাকান্ত একাডেমী' (২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে)। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে আগরতলার রাজপ্রাসাদটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত এক নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন যা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ নামে পরিচিত। প্রাসাদপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরটি তাঁরই আমলে নির্মিত হয়। বর্তমান আগরতলার তিনিই ছিলেন যথার্থ রূপকার।

রাধাকিশোরমাণিক্য ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। প্রশাসনিক কাজে যাতে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয় সেদিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন। সরকারি মুখপত্র রূপে 'ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট' প্রকাশ তাঁরই একটি স্মরণীয় কীর্তি। সম্ভবত স্বাধীন ত্রিপুরার সরকারি মুখপত্র রূপে বাংলা ত্রৈমাসিক 'ত্রিপুরা গেজেট' এর সূচনা হয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে। পর বৎসর অর্থাৎ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে 'ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট' মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিতপ্রবর চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ চার খণ্ডে রাজমালা সম্পাদনা করেন এবং 'শিলালিপি সংগ্রহ' নামে এক আকরগ্রন্থ প্রকাশ করেন। রাজ্যের আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বহু পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক বিভিন্নভাবে তাঁর আর্থিক সাহায্য লাভ করেছিলেন। সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর কাছ থেকে মাসোহারা পেতেন। চিত্রশিল্পী শশীকুমার হেশকেও তিনি পরোক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধ হয়ে অর্থাভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হলে রাধাকিশোরমাণিক্য কবির জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। কলিকাতার বেঙ্গল 'টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটকে' তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। রাধাকিশোরমাণিক্যের আমন্ত্রণক্রমে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কবিগুরুর প্রথম আগরতলায় শুভাগমন ঘটে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কবিগুরুর দ্বিতীয় বার আগরতলায় পদার্পণ ঘটেছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কবিগুরু তৃতীয় বার আগরতলা আসেন এবং ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। কবিগুরু শান্তিনিকেতনে একটি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নিলে রাধাকিশোরমাণিক্য তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন এবং আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রও তিনি ত্রিপুরা থেকে সরকারি ব্যয়ে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। কবিগুরু তাঁর 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থটি রাধাকিশোরমাণিক্যের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। ত্রিপুরার আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়েও কবিগুরু রাধাকিশোরমাণিক্যকে পরামর্শ দিতেন। বাংলার তৎকালীন বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়, রাধাকিশোরমাণিক্যের তাতেও পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে ভারত সঙ্গীত সমাজের পক্ষ থেকে রাধাকিশোরমাণিক্যকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'মহারাজা' খেতাব না দিলেও কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসী তাঁকে মহারাজার সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। কাশীর পণ্ডিতসমাজ রাধাকিশোরমাণিক্যকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর মহানুভবতার জন্য তিনি ত্রিপুরার ইতিহাসে 'রাজর্ষি' নামে অভিহিত হয়েছেন।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সারনাথ যাত্রাকালে এক মোটর দুর্ঘটনায় রাধাকিশোরমাণিক্যের মৃত্যু ঘটে।

বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ রাধাকিশোরমাণিক্যের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর ত্রিপুরার সিংহাসনের অধিকারী হন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের রাজ্যাভিষেক হয়। তাঁর রাজ্যাভিষেকে ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ববাংলা ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ল্যান্সলট। পিতার মতো বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যও ছিলেন দক্ষ প্রশাসক ও শিল্প সংস্কৃতির পূজারি।

বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য অমাত্যসভার পুনর্গঠন করেন। এটি ছিল একাধারে শাসন ও আইন পরিষদ। দক্ষ প্রশাসক ও রাজকুমারদের নিয়ে এটি গঠিত হয়। রাজা ছিলেন এই পরিষদের সভাপতি। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে স্টেট কাউন্সিলের শাখা হিসাবে দরবার নামে পরিচিত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা শাসন পরিষদ গঠন করা হয়। দক্ষ প্রশাসক যাতে নিযুক্ত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে স্টেট সিভিল সার্ভিস গঠন করা হয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসাবে প্রিভি কাউন্সিল গঠিত হয়। তাঁর আমলে অভিজ্ঞ আইনজীবী পাবলিক প্রসিকিউটর এবং ভ্রাম্যমাণ অডিটর নিয়োগ করা হয়।

কৃষির উন্নতির জন্য বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য আগরতলায় একটি কৃষি শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। রেশম শিল্প প্রসারের জন্য তিনি একটি রেশম বয়ন স্কুলও স্থাপন করেন। ত্রিপুরার ভূগর্ভে খনিজ পদার্থের গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য একজন ভূতাত্ত্বিককে নিয়োগ করেন এবং ত্রিপুরায় খনিজ তৈলের অনুসন্ধান চালাবার জন্য ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বার্মা অয়েল কোম্পানিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরায় চা শিল্পের সূচনা হয়। তাঁর শাসনকালে ত্রিপুরার চল্লিশটি চা বাগান গড়ে ওঠে। এর ফলে রাজ্যের রাজস্ব যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি অন্যদিকে অনেকের চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধি পায়। পূর্বে বনকে ইজারা দেওয়া হত। তাঁর আমলে বনকে পুরোপুরি খাস ব্যবস্থায় এনে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করা হয়। বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের শাসনকালে বাংলার দুই গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ও লর্ড রোনাল্ডসে আগরতলায় আগমন করেন। তাঁদের নাম অনুসারে আগরতলার একটি সেতুর নাম রাখা হয় কারমাইকেল সেতু এবং একটি রাস্তার নাম রাখা হয় রোনাল্ডসে রোড।

বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর চিত্রকর। তাঁর অঙ্কিত বিখ্যাত তৈলচিত্র 'সন্ন্যাসী', 'ঝুলন' , বংশীবাদন' ইত্যাদি চিত্রশিল্প-রসিকদের প্রশংসা লাভ করেছিল। আগরতলায় নির্মিত কুঞ্জবন প্রাসাদ, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, দুর্গাবাড়ির চত্বর, মালমহল ইত্যাদিতে তাঁর স্থাপত্য শিল্পে রুচিবোধের পরিচয় দেয়। বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের আমলেও

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার আন্তরিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করলে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মনের উদ্যোগে ও বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় আগরতলায় একটি অভিনন্দন সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে আগরতলায় শুভ আগমন করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য ইংরেজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং যুদ্ধ তহবিলে এক লক্ষ টাকা দান করেন এবং সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার এক আদেশ বলে Hill Tippera শব্দের পরিবর্তে কেবল Tripura শব্দ ব্যবহারের অনুমতি দেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গভর্নর বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যকে 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই মহারাজা উপাধি ত্রিপুরাধিপতিদের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক বলেও ঘোষণা করা হয়। মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই আগস্ট মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য পরলোক গমন করেন।

বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র যুবরাজ বীরবিক্রমকিশোর পিতার সিংহাসনের অধিকারী হন। সেইসময় তিনি নাবালক থাকায় তাঁর পক্ষে শাসন পরিচালনার জন্যে একটি শাসন পরিষদ গঠিত হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী মহাসমারোহে তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। ইতালির ফাসিস্ট নেতা মুসোলিনি, জার্মানির নাৎসি নেতা হিটলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। বিদেশের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি আধুনিক জগৎ সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন।

বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেন। পার্বত্য প্রজাদের জুম চাষের পরিবর্তে হাল চাষে উৎসাহিত করেন। এজন্য কিছুটা জমি সংরক্ষিত রাখা হয়। মৌখিক ভাবে জমি ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রতি মহকুমায় উন্নয়ন বিষয়ক নগরসমিতি ও 'পূর্তবর্ত্ম-সংক্রান্ত উন্নয়ন সমিতি' গঠিত হয়। আগরতলার বিমান বন্দরটি তাঁর আমলেই স্থাপিত হয়। আগরতলাকে পরিকল্পিত শহর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সরকারি অনুমোদন ছাড়া যেখানে সেখানে

পাকাবাড়ি নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। গ্রামের উন্নয়নের ভার গ্রামগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়। আগরতলার ট্রেজারিতে ব্যাংক স্থাপন ছাড়াও আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'ত্রিপুরা স্টেট ব্যাংক' স্থাপিত হয়। তিনি 'বিদ্যাপত্তন'' নামে একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে আগরতলায় একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি 'বিদ্যাপত্তন'-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রিপুরায় এমন একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যার অধীনে থাকবে সাধারণ ডিগ্রি কলেজ, মেডিকেল কলেজ, কৃষি, চারুকলা ও ইনজিনিয়ারিং কলেজ। এজন্য আগরতলা শহরের পূর্ব প্রান্তে কলেজটিলায় জমিও নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য তাঁর জীবিতকালে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর এই পরিকল্পনার আংশিক রূপদান করা হয় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ঢাকা জেলার রায়পুরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপন্ন মানুষ দলে দলে ত্রিপুরায় আগমন করলে বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য তাদের আশ্রয় দেন ও নানাভাবে সাহায্য করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুরা উদ্‌বাস্তু হয়ে ত্রিপুরায় এলে তাদেরও আশ্রয় দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সদরে উপযুক্ত হিন্দু ও মুসলমান সদস্য নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় প্রীতিবিধায়ক সমিতি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়।

বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের আমলে বৃহত্তর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ত্রিপুরাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ত্রিপুরাতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন এবং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে এই ঘোষণা অনুযায়ী 'ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র বা ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন' নামে এক শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এতে স্থির হয় যে রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল মন্ত্রণা সভা হিসাবে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে রাজাকে উপদেশ দেবে। খাস আদালত বা হাইকোর্টের উন্নতি বিধান করা হবে। প্রধানমন্ত্রী ও অনধিক চারজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে। এর হাতে প্রশাসনের অনেক দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য এবং বাজেট আলোচনা ও তৎ সম্পর্কে অভিমত প্রদানের জন্য একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠন করা হয়। রাজ্যের সর্বত্র পল্লী অঞ্চলের কতিপয় গ্রামের সমবায়ে গ্রাম্যমণ্ডলী বা গ্রাম্য ইউনিয়ন সমূহ গঠিত হবে এবং প্রতি গ্রামের অধিবাসী কর্তৃক নিজ নিজ মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড নির্বাচিত হবে। এই বোর্ড সমূহ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পরিচালনা, নির্দেশিত ট্যাক্স বা কর আদায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার-ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে। ভারপ্রাপ্ত জনৈক উপযুক্ত ফাইন্যান্স মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে নতুন প্রণালীতে রাজ্যের আয়ব্যয়ের হিসাব ও অডিটাদি কার্য নিয়ন্ত্রিত হবে এবং মহারাজ

ও তাঁর নিজ পরিবারের বাজেট রাজ্যের বাজেট থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে রাজ্যের আয়ের শতকরা দশ অনুপাতে ব্যয় নির্দিষ্ট করা হয়। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য এই শাসনব্যবস্থা বাস্তব রূপায়ণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ''ত্রিপুরা দরবার'' শব্দের পরিবর্তে ''ত্রিপুরা সরকার'' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য ইংরেজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় একটি করে বিভাগীয় যুদ্ধ কমিটি এবং রাজধানী আগরতলায় একটি কেন্দ্রীয় যুদ্ধ কমিটি গঠন করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে একটি যুদ্ধ ভাণ্ডার বা যুদ্ধ তহবিলও গঠিত হয়। উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা যাতে সেনাদলে যোগদান করে, সেজন্য তিনি বিশেষ উৎসাহ দেন। 'প্রথম ত্রিপুরা রাইফেল বাহিনী' আরাকান ও বর্মা যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল।

বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে একদিকে যেমন ত্রিপুরায় ক্রমশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠছিল তেমনি অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও আর্থসামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং সম্প্রদায় এক আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন অবশ্য কঠোর হস্তে দমন করা হয়।

বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং অনেক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি 'জয়াবতী' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলা ১৩৪৮ সালের ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৮০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আগরতলায় রবীন্দ্র জয়ন্তী দরবার আহ্বান করে এই দরবারে কবিকে 'ভারতভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের আনুকূল্যে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে আগরতলায় 'বেণুবন বিহার' নামে একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়। মেলাঘরে রুদ্রসাগর নামক হ্রদের মধ্যে নির্মিত নীরমহল নামক প্রাসাদটি তাঁরই একটি অক্ষয় কীর্তি।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মে মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে মহারাজার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে সংযুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দের রিয়াং বিদ্রোহ

ত্রিপুরায় যখন বিভিন্ন সংঘ ও সমিতির দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠেছিল সেই সময় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও আর্থসামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং সম্প্রদায় এই আন্দোলন শুরু করে। ত্রিপুরার ইতিহাসে এই রিয়াং আন্দোলন রিয়াং বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

রিয়াং সর্দারদের বলা হত চৌধুরি। জমিদারদের মতো তাঁরা অনেক সুযোগ সুবিধা

ভোগ করতেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন অত্যাচারী। নানাভাবে দরিদ্র রিয়াংদের কাছ থেকে জরিমানা বা অন্যায়ভবে অর্থ আদায় করতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। দরিদ্র রিয়াংদের অভাব অভিযোগ এই সমস্ত চৌধুবিদের মাধ্যমেই মহারাজের কাছে পেশ করা হত। সুতরাং রিয়াংদের অত্যাচারের প্রতিকার সম্ভব হত না। চৌধুরিদের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রিয়াংদের এই দুর্দিনে ত্রিপুরায় আবির্ভাব ঘটল রতনমণির। অন্যায অত্যাচারের বিরুদ্ধে রিয়াংরা সংঘবদ্ধ হল। নেতৃত্ব দিলেন তাদের ধর্মগুরু রতনমণি।

রতনমণির আদি বাসস্থান ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড মহকুমার দেওয়ান বাজারের কাছে রামচিরা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম নীলকমল নোয়াতিয়া। তিনি লোকমান সাধু নামে পবিচিত ছিলেন। সম্প্রদায়গতভাবে তিনি নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সম্ভবত রতনমণি ত্রিপুরায় আসেন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি অমরপুরের চেলাগং নতুন বাজারের মাঝামাঝি একছড়ি মৌজায় 'তাওফম'-এ প্রথম আশ্রম করেন। শিষ্য সংখ্যা বাড়তে থাকলে ধীরে ধীরে অমরপুরের ডম্বরুর প্রেমতল আশ্রম, সামখুম ছড়া ও উদয়পুরের দক্ষিণ মহারানি প্রভৃতি স্থানে আশ্রম তৈরি হতে থাকে। প্রচুর সংখ্যক রিয়াং ছাড়াও কিছু সংখ্যক নোয়াতিয়াও তাঁব শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তিনি শিষ্যদেব হরিনামের মন্ত্র দিতেন 'ওঁ প্রাণঃ রাম' বলে। তিনি নামগান ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে গল্প বলে শিষ্যদের মধ্যে ধর্মীয় ভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন।

পৌষ সংক্রান্তির সময় অমরপুরের তীর্থমুখে হিন্দু উপজাতিরা পুণ্যস্নানের জন্য সমবেত হত। তাদের মধ্যে অনেকেই ঐ সময়ে মৃত আত্মীয়স্বজনের পুণ্য অস্থি গোমতী নদীব জলে বিসর্জন দিয়ে তাদেব আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা জানাত। এই সুযোগে পূর্ববাংলা থেকে আগত কিছু বাঙালি ব্রাহ্মণ তাদের মন্ত্রপাঠ করিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। রতনমণির শিষ্যরা রিয়াং চৌধুরিদের সহায়তায় ব্রাহ্মণদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই মন্ত্রপাঠের দাযিত্ব নেয়। সংগৃহীত অর্থ রতনমণির অনুচর ও চৌধুরিরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অর্থের বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে রতনমণির শিষ্যদের সঙ্গে চৌধুরিদের বিবাদ শুরু হয়ে যায়। তীর্থমুখের ব্রাহ্মণরা এবং চৌধুবিরা রতনমণির বিরুদ্ধে মহারাজকে নালিশ জানালে রতনমণিকে গ্রেপ্তার করে আগরতলায় নিয়ে আসা হয় এবং আলং বা বন্দিশিবিরে আটক রাখা হয়। কিন্তু রতনমণি বিনিন্দিয়া বা রক্ষীদেব চোখে ধূলি দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সম্ভবত বতনমণি বা তাঁর দলের প্রতি আগরতলায় ঠাকুর শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোকের সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। এর ফলে শিষ্যদের কাছে রতনমণির প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনার পর তিনি স্থায়ী ভাবে তীর্থমুখ অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে অন্যান্য স্থানের মত ত্রিপুরাতেও খাদ্যসংকট দেখা দেয়। এই

অবস্থার মধ্যে সরকার পক্ষ কৃষকদের কাছ থেকে শস্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। এই সমস্ত খাদ্য শস্য সৈন্যদের জন্য মজুত করা হত। যা কিছু ভোগ্য পণ্য জনসাধারণের জন্য বরাদ্দ করা হল তা বণ্টনের দায়িত্ব চৌধুরিদের হাতে দেওয়া হয়। অন্যায় মজুতকারীর বিরুদ্ধে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও খগেন্দ্র চৌধুরি সহ কিছু চৌধুরি খাদ্যশস্য মজুত করে কালোবাজারে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করতে থাকেন। একদিকে সরকার থেকে সৈন্যদের জন্য খাদ্যশস্য মজুত করা অন্যদিকে চৌধুরিদের খাদ্যশস্য মজুত করে কালোবাজারে বিক্রির ফলে দরিদ্র রিয়াং সম্প্রদায় আরও বিপর্যস্ত হয়। ফলে দক্ষিণ ত্রিপুরার অমরপুর, উদয়পুর, বিলোনিয়া ও সাব্রুম মহকুমার পার্বত্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই অবস্থায় রতনমণির শিষ্যরা বিভিন্ন স্থানে ধর্মগোলা স্থাপন করে দরিদ্র রিয়াংদের খাদ্য বিতরণ করতে থাকে।

অমরপুরের দেবী সিং ছিলেন রিয়াং সম্প্রদায়ের রায়কাঞ্চন বা রাজা। বগাফার খগেন্দ্র চৌধুরি ত্রিপুরার রাজ দরবারকে প্রভাবিত করে মহারাজ কর্তৃক দেবী সিং-এর পরিবর্তে রায়কাঞ্চন মনোনীত হলেন। অথচ একজন রায়ের জীবিতকালে রিয়াং সমাজে রায় পরিবর্তনের বিধান ছিল না। এতে রিয়াং সম্প্রদায়ের অনেকেই ক্রুদ্ধ হন এবং খগেন্দ্র চৌধুরিকে রায়কাঞ্চন হিসাবে মানতে অস্বীকার করে। খগেন্দ্র চৌধুরি ও তাঁর সমর্থকরা প্রতিশোধ নিতে রিয়াংদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করেন। রিয়াং সম্প্রদায় মহারাজের কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করতে থাকে। কিন্তু 'মিসিপ' বা মহারাজ কর্তৃক মনোনীত রাজদরবারে রিয়াংদের প্রতিনিধি হরচন্দ্র ঠাকুর খগেন্দ্র রায়ের সমর্থক হওয়ায় রিয়াংদের অভিযোগের কোনো প্রতিকার হয় নি। রতনমণির শিষ্যরাই প্রধানত খগেন্দ্র রায়ের বিরোধিতা করেছিল বলে তাদের উপরই অত্যাচারের মাত্রা বেশি ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ত্রিপুরা সরকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য পার্বত্য প্রজাদের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন এবং জাপানের আক্রমণ থেকে ত্রিপুরাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বিভিন্ন স্থানে সৈন্য ঘাঁটি প্রস্তুত রাখেন। খগেন্দ্র রায়কে রিয়াংদের মধ্য থেকে সৈন্য বিভাগের জন্য যুবক সংগ্রহের অনুরোধ করা হয়। রিয়াং যুবক সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে খগেন্দ্র রায় মহারাজকে জানান যে রতনমণি ও তাঁর শিষ্যরা বাধা দেওয়ায় সৈন্য দেওয়ায় সৈন্য সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে না। খবর আসতে লাগল যে রতনমণির শিষ্যরা নিজেদের মধ্য থেকে মন্ত্রী, সেনাপতি নির্বাচন করছে এবং প্রতিরক্ষার জন্য একদল সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলছে। খগেন্দ্র রায়ের অনুগত চৌধুরিদের বন্দি করে তাদের অত্যাচারের বিচার নিজেরাই করতে শুরু করেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে গরু, ছাগল প্রভৃতি লুঠতরাজের খবরও আসতে লাগল।

উৎপীড়িত রিয়াংরা বহুদিনের পুঞ্জীভূত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য নিজেরাই এখন

সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং যে কোনো উপায়ে রায় ও চৌধুরিদের বিচার ও শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা নিজেরাই করেছে। যে অন্যায় অবিচার এতদিন তারা সহ্য করে এসেছে গুরু রতনমণির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সে অন্যায়কে তারা আর সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। তারা সমাজকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যেখানে রায় বা চৌধুরিদের অত্যাচার থাকবে না। গুরু রতনমণিকে আশ্রয় করেই তারা তাদের আন্দোলন শুরু করল। এজন্য তারা একটি সশস্ত্র দলও তৈরি করেছে। তাদের প্রধান দুটি ঘাঁটি ছিল উদয়পুরের তুইনানি এবং অমরপুরের তৈছারবুহা। রতনমণি সেসময় তৈছারবুহা ঘাঁটিতে অবস্থান করছিলেন। মহারাজের কর্তৃত্ব তারা অস্বীকার করে নি কিন্তু মহারাজা কর্তৃক মনোনীত রায়কাঞ্চনকে অস্বীকার করে, নিজেরা মন্ত্রিপরিষদ ও সশস্ত্র বাহিনী তৈরি করে, চৌধুরিদের বিচারের ভার নিজেদের হাতে নিয়ে তারা কার্যত বিদ্রোহী হিসাবে পরিচিত হয়েছে। চৌধুরিদের বাড়ি লুঠতরাজের জন্য সরকারি রিপোর্টে রতনমণির শিষ্যদের ডাকাতদল এবং রতনমণিকে দস্যু আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সময়কার জনসাধারণ এমনকী কোনো কোনো সরকারি রিপোর্টে রতনমণির শিষ্যদের স্বদেশি বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। অনেকেই, এমনকি কিছু সংখ্যক চৌধুরিও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। একটি সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে কেহ তাদের বাড়িঘর পর্যন্ত দেখিয়ে দেয় না। সেখানকার চৌধুরিরাও তাদের অনুসন্ধান দিত না বরং গোপনে লোক পাঠিয়ে প্রায় সমস্ত স্বদেশিদের সাবধান করে দিত। অমরপুরের দারোগার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে রাজরক্ষী বাহিনীর লোকেরাও রতনমণির দলে যোগ দিয়েছিলেন।

উদয়পুর থানার নায়ের দারোগা দীনেশচন্দ্র দাসের সঙ্গে রতনমণির সাক্ষাৎ হয় তৈছারবুহা ক্যাম্পে ২৯শে জুলাই ১৯৪৩-খ্রিস্টাব্দের বিকালবেলা। মধুর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ও উদারতা নিয়ে রতনমণি তাঁকে যা বললেন তার মর্মার্থ এই —আদিবাসীদের মধ্যে রিয়াং সম্প্রদায় অত্যন্ত নিরীহ ও সরল প্রকৃতির। ধর্ম সম্পর্কে অর্থাৎ ভগবান যে আছেন এ জ্ঞান তাদের নেই। এই অবস্থা দেখে তিনি রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবান বা ধর্মজ্ঞান যাতে হয় তার জন্য নাম প্রচার করতে আরম্ভ করেন। এ পর্যন্ত বহুলোক নাম নিয়েছে এবং ক্রমেই ধর্মপিপাসা দেখা দিচ্ছে। এ নিয়ে রাজ দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক নালিশ গেছে। নাম নেওয়ার বা দেওয়ার কার্য থেকে তিনি বিরত হন নি। এই কারণে খগেন্দ্র রায় ও তার সমর্থক চৌধুরিরা তাঁর শিষ্যদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও অবিচার করেছে। তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে ২০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। তিনি তাদের ডেকে জানতে চান যে, ওই টাকা দিয়ে খগেন্দ্র রায় কী কী করেছেন? রিয়াং সম্প্রদায়ের উপকারের জন্য এ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে কী না, যদি না করে থাকেন তাহলে এ অর্থ দিয়ে কী করেছেন? ভগবান দরিদ্রের বন্ধু। গরিবকে রক্ষা করাই ধর্ম। ভগবান অন্যায় সহ্য করেন না। রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ থেকেও অনেক দৃষ্টান্ত দেখান। তিনি আক্রোশ

বশে চৌধুরিদের ধরে আনবার কথা চিন্তা করেন নি। কাউকে অযথা হয়রানি না করার জন্যই তিনি শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহারে দীনেশবাবু মুগ্ধ হয়েছিলেন। মহারাজা বা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কথাই রতনমণি তাঁর সামনে বলেন নি। রতনমণিকে প্রকৃত সাধু বলেই দীনেশবাবুর মনে হয়েছিল। তাঁর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে রতনমণির কাছে যেতে হলে সাতটি গেট পার হতে হত এবং তাদের পাঁচটি ঘাঁটি ও গুপ্তচর ব্যবস্থা বেশ শক্তিশালী ছিল। তারা যে কোনো সময় দুই হাজার লোকের সঙ্গে প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখত। তাদের সংগঠনে বারো হাজার রিয়াং ও সাত হাজার নোয়াতিয়া ছিল।

সীমান্তে জাপানি সৈন্যের আগমন আর তাদের দেশের অভ্যন্তরে দক্ষিণের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহ মহারাজা ও ভারতবর্ষের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করল। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে জুলাই মহারাজা বীরবিক্রম আন্দোলন দমনের জন্য আন্দোলনকারীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া ও গ্রেপ্তারের আদেশ জারি করেন। স্থানে স্থানে অভিজ্ঞ সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হল। উদয়পুর অঞ্চলে আন্দোলন দমনের জন্য শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মাকে নিযুক্ত করা হয়। একদল সৈন্য সহ ক্যাপ্টেন নগেন্দ্র দেববর্মা রাজ্যের পূর্বসীমান্তের দিকে রওনা হলেন। লেফটেন্যান্ট হরেন্দ্র -কিশোর দেববর্মার নেতৃত্বে একদল সৈন্য বিলোনিয়া বিভাগে পাঠানো হল। এছাড়াও পাঁচশত জমাতিয়া যোদ্ধা ও ছোটোখাটো আরো কয়েকটি দল বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হল। বিভিন্ন অঞ্চলে খণ্ডযুদ্ধ হলেও রতনমণির শিষ্যরা সুশিক্ষিত রাজকীয় সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হল। বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী রাজকীয় বাহিনীর গুলিতে নিহত হল। অমরপুর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর অঞ্চলে পঞ্চাশটি গ্রাম ভস্মীভূত করা হল। বিদ্রোহী নেতাদের মতে কুড়ি হাজার চারশো পঁচিশ জনের মতো গ্রেপ্তার হয়। যদিও সরকারি হিসাবে গ্রেপ্তারের সংখ্যা তিন হাজার এর কম এবং এদের মধ্যে দুইশত জন মহিলা এবং বার জন শিশু ছিল। মহারাজার আদেশে এদের মস্তক মুণ্ডন করে পৈতা গ্রহণ করিয়ে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করা হল। কয়েক জনের একবছর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রতনমণি ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করে চট্টগ্রামে প্রবেশ করলে ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কোনো কোনো লেখকের মতে রতনমণি বার্মা যাবার পথে গ্রেপ্তার হন। তাঁকে কিছুদিন রাঙ্গামাটি জেলে আটক রাখার পর ত্রিপুরা সরকারের অনুরোধক্রমে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে রতনমণি ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে ত্রিপুরা সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। তাঁকে প্রথমে আগরতলার সেন্ট্রাল জেলে রাখা হলেও সেখান থেকে তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে শারীরিক নির্যাতনের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে বলে প্রকাশ। সরকার পক্ষ থেকে কোনো কঠিন রোগে রতনমণির মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়। ইতিপূর্বে তাঁর বেশ কয়েকজন

অনুগামী গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এরপরে উদয়পুরের দক্ষিণ মহারানি অঞ্চলের কিছু সংখ্যক রিয়াং যুবকের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ডাকাতির অভিযোগ আগরতলা কোর্টে আনা হলেও সরকার প্রথম স্তরেই তাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা তুলে নেন।

রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ও আন্দোলনের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পববর্তী কালে স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহের সময় রতনমণির অন্যতম অনুগামী তছলমফা ওরফে রাজপ্রসাদ চৌধুরি ত্রিপুরার পূর্ণমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বর্তমানে রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা দেওয়া হয়।

ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের অবসান

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর দেববর্মন মাণিক্য বাহাদুর উনচল্লিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করলে তাঁর পুত্র কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্মন মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরা রাজ্য ও চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। তিনি নাবালক থাকায় ভারত সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী রাজমাতা মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে রাজপ্রতিনিধি শাসন পরিষদ বা কাউন্সিল অব রিজেন্সি গঠিত হয়। মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী এই পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মন বাহাদুর ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। মেজর বঙ্কিমবিহারী দেববর্মন ও মন্ত্রী রাজরত্ন সত্যব্রত মুখার্জি এই পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন।

ভারত স্বাধীনতা লাভের অল্পদিনের পরেই ত্রিপুরা রাজ্য এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়। ত্রিপুরার সীমান্তস্থিত কুমিল্লার মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের উদ্যোগে ও আগরতলার কতিপয় ব্যক্তির সহযোগিতায় পাকিস্তান ত্রিপুরা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। ত্রিপুরার রাজপরিবার সেই সময় দ্বিধাবিভক্ত এবং তৎকালীন ত্রিপুরার দেওয়ান রাজরত্ন সত্যব্রত মুখার্জিও এ ব্যাপারে ততটা তৎপর ছিলেন না। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ জনসাধারণ ত্রিপুরার পাকিস্তানভুক্তির বিরোধিতা করেন এবং পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করতে সংঘবদ্ধ হন। ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডল পাকিস্তানের আক্রমণের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনীও গড়ে তোলে। আগরতলার চারজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রভাত রায়, জয়সিংহ দেববর্মা, কালুচন্দ ও প্রফুল্ল রায় শিলং-এ মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। ইতিপূর্বে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানের ত্রিপুরা আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে ৪ঠা নভেম্বর স্বরাষ্ট্র ও উপ-প্রধানমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলকে ত্রিপুরা সম্পর্কে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। ইতিপূর্বে তিনি আসাম সরকারকে এ

মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য

সম্বর্কে অবহিত করেন ও পাকিস্তান সরকারকে টেলিগ্রাম মারফত সতর্ক করে দেন। পাকিস্তানের ত্রিপুরা আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য ভারত সরকার আসাম থেকে উপযুক্ত সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। এর ফলে পাকিস্তানের ত্রিপুরা আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং ত্রিপুরা একটি বিপদ থেকে মুক্তি পায়। রাজরত্ন সত্যব্রত মুখার্জির পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় এবং নিরাপত্তার খাতিরে স্বর্গীয় মহারাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারাজকুমার দুর্জয়কিশোর দেববর্মনকে কিছুদিনের জন্য রাজ্যান্তর করা হয়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি কাউন্সিল অব রিজেন্সি রহিত হবার পর থেকে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী একক রিজেন্ট বা রাজপ্রতিনিধিরূপে ত্রিপুরার শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। মহারানিকে রাজ্য পরিচালনার সাহায্যের জন্য যথাক্রমে অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ আচার্য এবং রণজিৎকুমার রায় ভারত সরকার কর্তৃক দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে নাবালক পুত্রের পক্ষে মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী ত্রিপুরার ভারতভুক্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুসারে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে 'গ' শ্রেণীর রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ত্রিপুবার দেওয়ান শ্রীরণজিৎকুমার রায় চিফ কমিশনার নিযুক্ত হন। ত্রিপুরার ভারতভুক্তি চুক্তিতে চাকলা রোশনাবাদের জমিদারির উল্লেখ ছিল না এবং চাকলা রোশনাবাদের জমিদাবি পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অন্তর্ভুক্ত হয়। 'Tripura in Transition' গ্রন্থের লেখক শ্রীত্রিপুরচন্দ্র সেন এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি সম্পর্কে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি চুক্তিতে মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবীর নীরবতা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেয় না। যদি চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি ত্রিপুরার সঙ্গে যুক্ত থাকত তাহলে উদ্বাস্তু সমস্যা এতটা প্রকট হত না।

এইভাবে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক মাণিক্য রাজবংশের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ত্রিপুরার ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পরবর্তী কালে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণ রাজ্যের মযাদা লাভ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপরেখা

(বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)

ভারতের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশ লাভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। সুসংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশও ঘটে এই যুগে। ত্রিপুরায় রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ ঘটে আরো কিছু পরে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এর প্রধানত দুটি কারণ ছিল। ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের মতো কোনো বিদেশি শক্তি ত্রিপুরায় রাজত্ব করে নি। ত্রিপুরার রাজারা ছিলেন স্থানীয় অধিবাসী। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত থাকলেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে ত্রিপুরার প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাই ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন প্রথম দিকে এখানে প্রসার লাভ করে নি। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারায় ভারতে এবং বিশেষ করে তৎকালীন বাংলাদেশে যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয় এবং যার ফলে ভারতে জাতীয় চেতনা এবং জাতীয় আন্দোলন জোরদার হয় তার প্রভাব ত্রিপুরায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিস্তার লাভ করতে পারে নি। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা কিছুটা প্রবেশ করতে সক্ষম হলেও তা ছিল নিতান্ত রাজপরিবারের মধ্যে সীমিত। ১৮৭৪-৭৫ সালের বাংলা শাসনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে পঁচাত্তর হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত ত্রিপুরা রাজ্যে সে সময় মাত্র দুটি স্কুল ছিল এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল একশো তিনজন। উচ্চতর শিক্ষা স্বভাবতই আরো সীমিত ছিল।

কিছুটা দেরিতে হলেও একসময় ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগল ত্রিপুরার বুকে। ত্রিপুরার রাজারা এবং রাজপরিবারের লোকেরা ছিলেন বঙ্গসংস্কৃতি ও বঙ্গভাষার পৃষ্ঠপোষক। বঙ্গসংস্কৃতি ও বঙ্গভাষার মাধ্যমে বাংলার নবজাগরণের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হতে লাগলেন। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী জেলা কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে ত্রিপুরার গণজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে লাগল। বাংলাদেশের বিপ্লবী কর্মীদের অনেকে ত্রিপুরায় গোপনে আশ্রয় নিতেন কারণ পার্বত্য ত্রিপুরা ব্রিটিশ ভারতের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল না। তাঁদের বিপ্লবী কার্যকলাপের দ্বারা ত্রিপুরাবাসী স্বভাবতই প্রভাবিত হতে থাকেন। প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাবাসীদের আন্দোলন শুরু হয়

এবং কালক্রমে সেই আন্দোলন ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল সরকার গঠনের আন্দোলনে বিস্তৃতি লাভ করে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ত্রিপুরা

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে যখন শুরু হল স্বদেশি আন্দোলন সে সময় ত্রিপুরার সিংহাসনে ছিলেন মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও স্বদেশি যুগেব অনেক খ্যাতিমান পুরুষদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য স্বভাবতই স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। শ্রীসত্যরঞ্জন বসু তাঁর 'দেশাত্মবোধ ও মহারাজা রাধাকিশোর' প্রবন্ধে লিখেছেন যে সেইসময় "এই শহরে (আগরতলায়) জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলি প্রমুখ অনেকেই আসিয়া উদ্দীপনা দিয়া যাইতেন। রাজসরকার হইতে কোনো সময় অননুমোদনের আভাসও শুনিতে পাওয়া যায় নাই। অপরপক্ষে সেই সমস্ত দেশ সেবকদের বিধিব্যবস্থায় পরোক্ষ সাহায্য রাজাদেশে পাওয়া যাইত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ও রাখীবন্ধন উৎসব ত্রিপুরার রাজধানীতে রাজপ্রাসাদ হইতে জনসাধারণ কি নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হইত তাহা আজও অনেকেব মনে জাগরূক আছে।" এই প্রবন্ধে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বসুব ফাঁসির সংবাদে রাজপরিবারের অনেকেই আগরতলাবাসীব সঙ্গে শোকাচ্ছন্ন হলে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যও এই শোকের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের ফলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক যাদবপুরে যে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল তাতে তিনি এককালীন অর্থসাহায্য ছাড়াও বার্ষিক অর্থবরাদ্দের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে মৌলবি বাজারে স্বদেশি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিদেশি দ্রব্য বর্জন নীতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে বিশাল জনসভা বসে তাতে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরারাজ স্টেটের সহকারী ম্যানেজার বরদাকান্ত সেন মহাশয়। বিদেশি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন সেই সময় ত্রিপুরার অভ্যন্তরে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবত ভারতের অন্য অঞ্চলের তুলনায় ত্রিপুবা সে সময় অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। শ্রীবিজয়কুমার সেন তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি ত্রিপুরার বিলোনিয়া অঞ্চল পরিদর্শন করেন সেই সময় সেখানে স্বদেশি দ্রব্যাদির দোকানের সঙ্গে ব্রিটিশজাত দ্রব্যাদিও শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছিল।

স্বদেশি যুগের প্রখ্যাত দেশভক্ত মুকুন্দ দাশ প্রৌঢ় বয়সে আগরতলা এসেছিলেন। অভিনয়ের ফাঁকে বক্তৃতা করে তরুণদের তিনি দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করতেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঢাকায় যে অনুশীলন সমিতি গঠিত হল তার সদস্যদের শিক্ষাদানের জন্য পার্বত্য ত্রিপুরার বিলোনিয়া ও উদয়পুরে দুটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বাইরে থেকে দেখতে এবং অংশত সত্যিই, এগুলি ছিল চাষবাসের খামার বাড়ি, কিন্তু এগুলি ছিল প্রধানত বিপ্লবীদেব শিক্ষাদানের কেন্দ্র। দিনের বেলায় এখানকার সদস্যরা মাঠে কৃষকদের কাজ করত কিন্তু বাত্রে কাছের পাহাড়ে এদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার এবং গুলি চালনার শিক্ষা দেওয়া হত। কঠোর পরিশ্রম ও কঠিন সামরিক নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে তাদের থাকতে হত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অনুশীলন সমিতি তাদের একটি কেন্দ্র ত্রিপুরায় স্থাপন করে। স্থানীয় একদল যুবক গোপনে হলেও সক্রিয়ভাবেই এই সমিতির কাজে যোগদান করে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি তারা এড়াতে পারে নি। স্থানীয় বিশিষ্ট কনট্রাকটার অক্ষয় ব্যানার্জির পুত্র ক্ষিতীশ ব্যানার্জি সম্ভবত ৩নং রেগুলেশনের শিকার হন। নিশিকান্ত ঘোষ মহাশয়ও কিছুদিন বন্দি জীবনযাপন করেন। প্রিয়নাথ ব্যানার্জি মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার হস্তক্ষেপের ফলে জেলের হাত এড়াতে সক্ষম হন। তাদের দলে লালু দাসগুপ্ত, সুরেশ ভরদ্বাজ প্রমুখ অনেক ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন।

ব্রিটিশ ভারত থেকে বিতাড়িত ও পলাতক বিপ্লবীরা ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়ে এখান থেকে তাদের অনেকেই যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করতেন সে বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার অবহিত ছিল। ব্রিটিশ সরকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ত্রিপুরা সরকার যাতে সাপ্তাহিক রিপোর্ট সহ ত্রিপুরায় বিপ্লবীদের গতিবিধি নিয়মিত ব্রিটিশ সরকারকে জানায় যে ধরনের নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গে নিশিকান্ত ঘোষের ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের বরিশাল ষড়যন্ত্রের মামলায় জড়িত হওয়ায় ভারত থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। ত্রিপুরা সরকার ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শ নিয়ে তাঁকে ত্রিপুরার অস্থায়ী ভাবে বসবাসের অনুমতি দেয়। নিশিকান্তবাবু ত্রিপুরায় তাঁর বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকলে ত্রিপুরা সরকার নিয়মিত এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করত।

ভারতে যে সমস্ত বৃটিশ বিরোধী পুস্তক ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হত এবং প্রচার নিষিদ্ধ করা হত, সেইসব পুস্তক যাতে ত্রিপুরাতেও প্রচারিত হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার পুস্তকগুলির তালিকা নিয়মিত ভাবে ত্রিপুরা সরকারকে প্রেরণ করে সতর্ক করে দিত। বাজেয়াপ্ত পুস্তকাদি সংক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা ত্রিপুরার জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ত্রিপুরা স্টেট গেজেটে প্রকাশিত হত।

অনেকসময় বিপ্লবীদের প্রতি ত্রিপুরা সরকারের গোপন নৈতিক সমর্থনও থাকত। কারণ তখনও ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে ওঠে নি, বিপ্লবীদের

কার্যকলাপ কেবলমাত্র ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কুমিল্লার পুলিশ পিস্তল চুরির সন্দেহে দুজন বিপ্লবীকে আটক করার জন্য সোনামুড়া অঞ্চলে প্রবেশ করলে মহারাজা তার আগেই ঐ দুজনকে নিজ লোকজনের সহায়তায় পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নিরাপদে আগরতলায় নিয়ে আসেন। বিপ্লবীদের প্রতি মহারাজার যে গোপন সহানুভূতি ছিল সে সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার অবহিত ছিল এবং এ নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ করত।

খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে ত্রিপুরা

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ভারতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ত্রিপুরাতেও এর প্রভাব প্রসারিত হয়। কিছু কর্মী এই আন্দোলনের জন্য চাঁদা সংগ্রহার্থে আগরতলা উপস্থিত হলে ত্রিপুরা সরকার তাদের বহিষ্কারের আদেশ দেয়। চাঁদপুরে কুলিদের উপর সরকারি হামলার প্রতিবাদে সেখানে রেল ধর্মঘট ও সাধারণ হরতাল পালিত হয়। চাঁদপুরের রেল ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে আখউড়া বাজারে দুদিন ধরে হরতাল প্রতিপালিত হয়। উকিল ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে সেখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় স্থির হয় ব্রিটিশ কর্মচারীদের জন্য ত্রিপুরা দরবার কর্তৃক আগরতলা বাজার থেকে দ্রব্যাদি সরবরাহ করার প্রতিবাদে আগরতলা বাজার বয়কট করা হবে। মোগরা অঞ্চলের দোকানদাররা ২৯শে মে আগরতলা বাজার বয়কট করে। ৩০শে মে ত্রিপুরা দরবারের নায়েব কর্তৃক ক্রীত মাছ লুণ্ঠিত হয় এবং একজন মন্ত্রী আগরতলা আসার পথে মোগরায় নৌকা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন। কৈলাসহর বিলোনিয়া এবং ধর্মনগর অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ। কৈলাসহরের গঙ্গানগর, মুক্তাইল ও মানিকভাণ্ডারে বিভিন্ন সভাও অনুষ্ঠিত হল। ব্রিটিশ এলাকার চা বাগানগুলির সাতমাইলের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানায় যাতে এ ধরনের সভাসমিতি না করা হয় সে সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার ত্রিপুরা সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলে।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল সরকারি বিচারবিভাগকে বয়কট করা। এই উদ্দেশ্যে কৈলাসহরে সতীশচন্দ্র চৌধুরি ও আবদুল মুজাহির মজুমদারের নেতৃত্বে একটি ধর্মসভা স্থাপিত হল। এই অঞ্চলের গ্রামগুলির জনসধারণ যাতে সরকারি আদালতে না গিয়ে ধর্মসভার মাধ্যমে নিজেদের বিবাদের নিষ্পত্তি করে ফেলে সেজন্য আবেদন করা হয়। অবশ্য ত্রিপুরা সরকার ধর্মসভাকে এই কার্য থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেয় এবং এর কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়।

গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পরই ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের

বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ। সেখানেই বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবীরা একত্রিত হয়ে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের নতুন কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবী ও মাস্টারদার শিষ্য অনন্ত সিংহ সম্ভবত ১৯২২ সালে আগরতলার রাজপ্রাসাদের অস্ত্রাগার থেকে উমেশলাল সিংহ সহ কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তির সহায়তায় প্রচুর পরিমাণে পিস্তলের গুলি সংগ্রহ করেন। প্রায় চৌদ্দ বছর বয়স্ক উমেশলাল সিংহ ছিলেন অনন্ত সিংহের মামাতো ভাই।

ত্রিপুরায় অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টি

আগরতলায় যে অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হল তার দায়িত্ব যথাক্রমে উপেন্দ্রচন্দ্র লস্কর, রাসমোহন ভট্টাচার্য, নারায়ণ ব্যানার্জি ও কুঞ্জেশ্বর দেববর্মার উপর ন্যস্ত হয়। কুমার শচীন দেববর্মনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রশান্তকুমার দেববর্মন, প্রফুল্লকুমার বসু, শচীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশলাল সিংহ প্রভৃতি এই সমিতির সদস্য ছিলেন। অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রধান কার্য ছিল ব্রিটিশ ভারত থেকে পলাতক এবং বিতাড়িত বিপ্লবীদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া। পরবর্তী কালে যে সব জায়গায় কুমিল্লার অনুশীলন সমিতির গোপন বৈঠক হত সেগুলির মধ্যে আগরতলার কৃষ্ণনগরে রাজাবাবুর বাড়ি এবং আগরতলার মটরস্ট্যাণ্ডের নিকট নরসিং আখড়া অন্যতম। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে অনুশীলন সমিতির সদস্য বীরেন দত্ত, সুকুমার ভৌমিক, ধীরেন্দ্র দত্ত, গোপাল দত্ত, জিতেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভেটিনিউ হিসাবে বন্দি হন। অনন্ত দে, অনন্ত দেববর্মা অস্ত্র সহ কুমিল্লার নিকটে বন্দি হয়ে কারাগারে দণ্ডিত হন। প্রভাত দেববর্মা আগরতলা জেলে আটক থাকেন। দেবপ্রসাদ সেন আত্মগোপন করেন পরে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৩৩ সালে অনুশীলন সমিতির অন্যতম সদস্য সুশীলকুমার দেববর্মাকে আগরতলা জেলে আটক রাখা হয় পরে তাকে রাজ্যান্তর করা হয়।

যুগান্তর দলের একটি শাখা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হেম ঘোষ ও ললিত বর্মনের অধীনে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯২৮ সাল থেকে কাজ করতে থাকে। যুগান্তর দলের অন্যতম কর্মী ছিলেন সনৎ দত্ত। গোপনে নানাভাবে সংবাদ ও উপদেশ দিয়ে বিপ্লবীদের অন্তত জেল এড়াতে সাহায্য করেছেন। সনৎ দত্ত তাঁর বাড়িতে বসেই বোমা তৈরি করতেন। সম্ভবত হবিগঞ্জের নিকট মেল ডাকাতি ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে তিনি আত্মগোপন করেন এবং পরে বার্মা ও মালয়ে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য চলে যান। হররঞ্জন গাঙ্গুলি ও অমূল্যভূষণ মজুমদার তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। যুগান্তরের অন্য একটি শাখা ছিল, যারা পৃথকভাবে সংঘ গঠন করেন। সেই দলের কর্মী বঙ্কিম চক্রবর্তী ও অন্য একজন পিস্তল সহ ত্রিপুরার বাইরে গ্রেপ্তার হন ও আন্দামানে বন্দি জীবনযাপন করেন। এই দলের মণি বিশ্বাস এবং ক্ষীরোদ সেন গ্রেপ্তার হয়ে বন্দি জীবনযাপন করেন।

ছাত্র সংঘ ও ভ্রাতৃ সংঘ

১৯২৭ সালে যে প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করল তার নাম ছাত্র সংঘ। নীলু মুখার্জি, অখিল দত্ত, অনিল চক্রবর্তী প্রভৃতি এর উদ্যোক্তা ছিলেন। ব্যায়াম, লাঠি খেলা, ছোরা খেলার মাধ্যমে ছাত্র সংঘের সদস্যরা সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ছাত্র সংঘ অনুশীলনদলের সমর্থক ছিল।

শহীদ লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু সংবাদে কিছু সংখ্যক ছাত্র তাঁর স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ আগরতলায় ১৯২৮ সালে ভ্রাতৃসংঘ নামে একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক সমিতি হলেও ভ্রাতৃসংঘ ত্রিপুরায় বিপ্লবীদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। যুগান্তর সমিতির ভাবাদর্শে গঠিত এই ভ্রাতৃসংঘের শাখাপ্রশাখা ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রসংঘের অধিকাংশ সদস্যই এই সমিতির সদস্যভুক্ত হলেন। অবৈতনিক নৈশ বিদ্যলায় স্থাপন, রোগী ও আর্তের সেবা, মৃতের সৎকার প্রভৃতি কার্যের দ্বারা এই সমিতি জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন হয়ে পড়ে। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি ভ্রাতৃসংঘের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। স্কুলে সাধারণ ধর্মঘট ও স্কুল প্রাঙ্গণে সভা করার জন্য ভ্রাতৃসংঘের বহু ছাত্রকর্মীকে সে সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুল থেকে বহিস্কৃত করে। স্কুলের সেই সব ছাত্রের অভিভাবকদের উপর পারিবারিক বহিষ্কারের, চাকুরি যাওয়ার ও পেন্সন বন্ধ করে দেওয়া প্রভৃতি নানা প্রকার ভীতিপ্রদ আদেশ ত্রিপুরা রাজ্য সরকার থেকে জারি করা হয়। ভ্রাতৃসংঘ সংগঠনের বিস্তৃতি সাধন করে অস্ত্র সংগ্রহে মনোযোগী হয়। ভ্রাতৃসংঘের সভ্যরা রাজবাড়ির অস্ত্রশালা থেকে গোপনে কয়েকটি ছোটো অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে। কর্মীদের সাহস ও শক্তি যোগাবার জন্য গোপনে শহর থেকে দূরে নিয়ে আগ্নেয় অস্ত্র পরিচালনা ও চাঁদমারি শিক্ষা দেওয়া হত। কিছু বোমা তৈরি করে সম্ভবত চট্টগ্রামে পাঠানো হয় এবং অর্থ সাহায্য করা হয়। অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে নলিনী সেনগুপ্ত কলিকাতায় ধৃত হন এবং পরে আন্দামানে বন্দি জীবনযাপন করেন। উমেশলাল সিংহ আত্মগোপন করে কলিকাতায় অবস্থানকালে ধৃত হয়ে বিনা বিচারে আটক থাকেন। শচীন্দ্রলাল সিংহ, সৌমেন্দ্র সেন, ও হরিগঙ্গা বসাক প্রভৃতি বন্দি হন এবং রাজ্যান্তরে তাদেরকে ডেটিনিউ হিসাবে বন্দি রাখা হয়। নরেশ চ্যাটার্জির বাড়িতে পিস্তল ও বাজেয়াপ্ত বই পাওয়া গেলে আগরতলায় কয়েক বৎসরের জন্য তিনিও দণ্ডিত হন। মহিলাদের মধ্যেও সংগঠনের কিছু বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তাঁরা গোপনে বাজেয়াপ্ত বই পড়ে যেমন অনুপ্রেরণা পেতেন, তেমনি গোপনে ছোরা খেলা ও লাঠিখেলা শিক্ষা করতেন। এঁদের মধ্যে শ্রীমতী বীণা দত্ত ও শ্রীমতী পানু দত্তের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

গান্ধিবাদের আদর্শে মাতৃসংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় ১৯৩০/৩১ সালে। তাঁরা ব্যায়াম শিক্ষার অবসরে চরখা ও সুতাকাটার শিক্ষা করতেন ও শিক্ষা দিতেন।

এছাড়াও মিলন সংঘ নামে একটি সংঘের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৩১ সালে পূর্ব আগরতলা থানার অন্তর্গত বনমালীপুরে এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন সুকুমার ভৌমিক। প্রভাতচন্দ্র রায়, জিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, দেবপ্রসাদ সেন, অনন্তকুমার দে প্রভৃতি এই সংঘের সদস্য ছিলেন। তিনসুকিয়া মেলে স্বদেশি ডাকাতির সময় যে বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা মিলন সংঘের কতিপয় সদস্য ত্রিপুরার রাজপরিবারের জনৈক ব্যক্তির হেফাজত থেকে অপহৃত করেছিলেন বলে জানা যায়। দীর্ঘকাল কারাজীবন যাপন করার পর ১৯৩৮ সালের শেষভাগে রাজনৈতিক কর্মিবৃন্দের অনেকেই জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। ১৯৩৮ সালে ডিসেম্বর মাসে আগরতলায় ভ্রাতৃসংঘের সভ্যবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সবরকম হিংসাত্মক কর্মপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার সিদ্ধান্ত করেন এবং সকলে কংগ্রেস ও গান্ধিজির নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আগ্রহী হন। এই সভাতেই ভ্রাতৃসংঘের অস্তিত্ব চিরকালের জন্য বিলোপ করা হল বলে সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করা হয়।

স্বদেশি ডাকাতি

১৯৩২ সালের ২৩শে চৈত্র রাত্রি আটটায় আগরতলা মিউনিসিপ্যালটির কাছে অমর ভট্টাচার্যের দোকানে স্বদেশি ডাকাতি হয়। ঐ দোকান থেকে কিছু টাকা ও গহনা লুঠ করা হয়েছিল। পাঁচ জন স্বদেশি ডাকাতের মধ্যে তিনজনকে মেলার মাঠের একটি বাড়ি থেকে গোলাগুলি বিনিময়ের পর গ্রেপ্তার করা হল। এঁরা হলেন ঢাকা জেলার কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, কসবা থানার শচীন্দ্র দত্ত এবং দেবীদুয়ার থানার পবিত্র পাল। এরা সকলেই ছিলেন অনুশীলন সমিতির ঢাকা জেলার সতীশ পাকড়াশির দলের সদস্য। ব্রিটিশ সরকার এঁদের বিচারের জন্য কুমিল্লা নিয়ে যেতে চাইলে ত্রিপুরা সরকার আপত্তি করে। যেহেতু তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যে অপরাধ করেছেন সেইহেতু ত্রিপুরা সরকার তাঁদের বিচারের ভার নেয়। এঁদের বিচারের জন্য একটি বিশেষ আদালত ২৭-৮-১৯৩২ তারিখে গঠিত হল। বন্দিদের আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হল। কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীর নয় বছর এবং বাকি দুজনের সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেন্ট্রাল জেলে অবস্থানকালে তাঁরা বিশেষ শ্রেণীর বন্দি হিসাবে দাবি জানিয়ে সাতদিনের অনশন ধর্মঘট পালন করলে ত্রিপুরা সরকার তাঁদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। বন্দিদশা অতিবাহিত হলে তাঁদের ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি

ভ্রাতৃসংঘের অধিকাংশ নেতা কারারুদ্ধ হলে আরো একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আগরতলায় একদল যুবক জনমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে এই সমিতির বিভিন্ন শাখা ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়। রাজানুগত্যে দায়িত্বশীল

শাসন প্রবর্তনের দাবিই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতির প্রতিষ্ঠার সঠিক সময় নিয়ে লেখকদের মধ্যে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ত্রিপুরচন্দ্র সেনের মতে এই সমিতি ১৯৩৮ সালে আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আগরতলার খোসবাগানে এর প্রথম অধিবেশনে বসে এবং সেখানে কুমিল্লার এক প্রসিদ্ধ উকিল কামিনীকুমার দত্ত বক্তৃতা দেন। বীরেন দত্তের মতে ১৯৩৭ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে জনমঙ্গল সমিতি কয়েকজন কম্যুনিস্ট কর্মীর উদ্যোগে গঠিত হয়। আবার কোনো কোনো লেখকের মতে ১৯৩৫ সালে পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার সভাপতিত্বে স্থানীয় দুর্গাবাড়িতে এক জনসভা হয় এবং রাজানুগত্যে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তনের দাবিতে জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হয়। বংশী ঠাকুর, বীরেন দত্ত, প্রভাত রায়, সুকুমার ভৌমিক, কীর্তি সিংহ প্রভৃতি সদস্য বিশিষ্ট জনমঙ্গল সমিতি ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল শাসনের দাবি জানাতে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলেও এর কর্মপন্থা বিস্তার করে। রাজ্যের অভ্যন্তরে শিক্ষার প্রসার ও গণচেতনা জাগরণও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই সংগঠনের আন্দোলন জোরদার হলে ১৯৩৮ সালে প্রভাত রায়, বীবেন দত্ত, নিমাই দেববর্মা, বংশী ঠাকুর, প্রভৃতি আগরতলায় রাজবন্দি হিসাবে কারারুদ্ধ হলেন।

ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ

১৯৩৮ সালের শেষ ভাগে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কার্যোপলক্ষে কুমিল্লা পরিদর্শন করতে গেলে ত্রিপুরা রাজ্যের সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত রাজবন্দি ও অন্যান্য কর্মিবৃন্দ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রজাদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে উপদেশ প্রার্থনা করেন। ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস কমিটি গঠন করার বিষয়ে সভাপতিকে অনুরোধ করা হলে তিনি জানান যে হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস কমিটি করা নিষিদ্ধ। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস কমিটি গঠন সম্ভব নয়। এরপর কর্মিবৃন্দ মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ডাঃ পট্টাভি সীতারামাইয়া প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পত্র মারফত যোগাযোগ করেন। মহাত্মা গান্ধী কর্মিবৃন্দকে ত্রিপুরা রাজ্যে গঠনমূলক আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য প্রজাসাধারণের দ্বারা গঠিত একটি শক্তিশালী প্রজা প্রতিষ্ঠান গঠন করার উপদেশ দেন। তাঁর উপদেশ ও নির্দেশ অনুসারে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আগরতলায় ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস আদর্শে বিশ্বাসী প্রজাবৃন্দের এক সাধারণ সভায় ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মিলনী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং সেই বছর লুধিয়ানায় পণ্ডিত নেহরুর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মিলনীর ষষ্ঠ অধিবেশনে গণপরিষদ প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এই সম্মেলনে প্রত্যেক প্রজা প্রতিনিধি আপন দেশীয়

রাজ্যের সমস্যার বিষয় খোলাখুলিভাবে আলোচনা করায় সম্মেলন খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়। প্রতিনিধিবৃন্দ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রকার প্রজা সমস্যা ও প্রজা আন্দোলনের অবস্থা ও তার পরিণতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে শচীন্দ্রলাল সিংহ, হরিগঙ্গা বসাক, উমেশলাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত, ক্ষীরোদ সেন, আশু মুখার্জি ও ত্রিপুরচন্দ্র সেন অন্যতম। ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন, প্রজাবৃন্দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগ এবং শাসন ব্যাপারে সর্বত্র দুর্নীতি দূরীকরণ, অন্যায় অত্যাচার, বলপূর্বক জমি থেকে প্রজাদের উচ্ছেদসাধন ইত্যাদি ব্যবস্থা রহিত করার দাবি নিয়ে সর্বত্র সভাসমিতি কার্যে ব্রতী হন এবং দাবি আদায়ের জন্য জনমতকে শিক্ষিত করতে যত্নবান হন। গণপরিষদ গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন করা, গ্রাম্য বৈঠক, আর্তের সেবা, মৃতের সৎকার ইত্যাদি জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করে। রামনগরের পাঁচশত মুসলিম পরিবারের উৎখাতের আদেশের বিরুদ্ধে এই সংগঠন একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯৩৯ সালে গণপরিষদের অনেকে ত্রিপুবা রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ত্রিপুরা সীমান্তে বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন এবং ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে চলেন। ১৯৩৯ সালের শেষ ভাগে গান্ধিজি ঢাকা জেলার মালিকান্দায় আগমন করলে গণপরিষদের নেতৃবৃন্দ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করেন। গান্ধিজি নেতৃবৃন্দকে শান্ত, বৈধ ও অহিংস উপায়ে প্রজা আন্দোলনের ঘটনাবলী জানাতে নির্দেশ দেন। ১৯৪০ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হলেও তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের সঙ্গেই জনসাধারণ অধিক পরিচিত ছিল।

ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ, নিখিল মণিপুর প্রজামণ্ডলের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে কাজ করত কারণ উক্ত প্রজা মণ্ডল নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য সম্মিলনীর নির্দেশে পরিচালিত হত।

ঘাসুরি কর রদ আন্দোলন

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের কিছু নেতা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তের প্রজাদের মধ্যে থেকে ঘাসুরি কর রদ করার জন্য এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের জমিদারি চাকলারোশনাবাদ অঞ্চলের প্রজাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তের মধ্যে গোচারণের জন্য যে বার্ষিক কর দিতে হত তাকে ঘাসুরি কর বলা হয়। এই কর রদের জন্য চার হাজার ব্যক্তি সোনামুড়ার ডাক্তার আবদুল রহমান এবং ধর্মনগরের রুদ্রনাথ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে মহারাজার প্রাসাদের প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত

হয়। কিন্তু তাঁদের আবেদন সফল হয় নি।

এর কিছুদিন পূর্বে ১৯৩৮ সালে রোশনাবাদের প্রজারা খাজনাসংক্রান্ত সুদ মাপ করার জন্য মহারাজার নিকট একটি ডেপুটেশন প্রেরণ করেছিলেন এবং এ বিষয়ে আলোচনার জন্য মহারাজা তাঁদের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে মহারাজা সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশ করলেও সুদ সম্পূর্ণভাবে রহিত করা সম্ভব নয় তা জানিয়ে দেন। মহারাজার দৃষ্টিভঙ্গী সহানুভূতিপূর্ণ থাকায় সম্মেলন শান্তিপূর্ণ ছিল।

ধর্মনগর পূর্তবর্ত্মকর বন্ধ আন্দোলন

১৯৩৭ সালে ধর্মনগর এলাকায় সকল শ্রেণীর জনসাধারণ সংঘবদ্ধভাবে পূর্তবর্ত্মকর নামে এক বিশেষ কর বন্ধ করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। বেশ কয়েকমাস ধরে এই আন্দোলন চলছিল এবং সেইসময় ত্রিপুরা সরকার এই কর আদায় করতে সক্ষম হন নি। শেষ পর্যন্ত সুদক্ষ নেতৃত্বের অভাবে এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

ধর্মনগর হিতসাধনী সমিতি

ধর্মনগরে পূর্ববর্ত্মকর বন্ধ আন্দোলনের পর হিন্দু মুসলিম ঐক্যের উপর ভিত্তি করে হিতসাধনী সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা হলেন কালাচন্দ্রনাথ চৌধুরি ও মকবুল আলি ভূঁইয়া। জ্যোতির্ময় গুপ্ত এবং গয়াপ্রসাদ ত্রিবেদী এই সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ধর্মনগর হিতসাধনী সমিতির সঙ্গে প্রথমে ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতির যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে ধর্মনগরে ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠিত হলে এই সমিতি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়।

হরিজন আন্দোলন

১৯৩৮-৩৯ সালে সুখময় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে হরিজন সংগঠন সংগঠিত হয়। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আগরতলার মিউনিসিপালিটির হরিজন কর্মীরা ধর্মঘট করেন। পরবর্তী কালে নীলু মুখার্জি এবং শান্তি দাশগুপ্তের চেষ্টায় হরিজনদের জন্য আগরতলার ইন্দ্রনগরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা যাতে হরিজনদের মধ্যে বৃদ্ধি পায় তার জন্য সংগঠনকারীরা বিশেষ তৎপর হন।

ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশন

লুধিয়ানার নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে অভিজ্ঞতা লাভের পর ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশন গঠন করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশন সুর্মা ভ্যালি ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করে এবং আসামে বহু ছাত্র সম্মেলন করে। অপর একটি মত অনুসারে

সম্ভবত ১৯৪৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্র ফেডারেশনের কোনো কমিটি গড়ে ওঠে নি ; বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্যভুক্ত কিছু ছাত্র ছিল মাত্র।

১৯৩৯ সালের আন্দোলন

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্যগণপরিষদ, জনমঙ্গল সমিতি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ত্রিপুরায় গণ-আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠল। এই সময় উমাকান্ত একাডেমিতে ও তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন কবলে তারা ত্রিপুরা থেকে বহিষ্কৃত হয়। এইসময় শচীন্দ্রলাল সিংহকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ ও বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের জন্য ত্রিপুরা থেকে এক বছরের জন্য বহিষ্কারদণ্ড দেওয়া হয়। উক্ত দণ্ডাদেশের প্রতিবাদে সভা ও শোভাযাত্রা হতে থাকে। শচীন্দ্রলাল সিংহ সহ অনেকেই বহিষ্কৃত হয়ে ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী ব্রিটিশ এলাকায় ত্রিপুরা সরককারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন, ফলে ব্রিটিশ সরকার এঁদের বন্দি করে ত্রিপুরা সরকারের হাতে তুলে দেয়। ত্রিপুরা সরকাব এঁদেব আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখেন। শচীন্দ্রলাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত, আশু মুখার্জি, নীবোদ ভট্টাচার্য এবং উমেশলাল সিংহ আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে আটক থাকার পর ১৯৪৫ সালে মুক্তি পান। বীরেন দত্ত ও প্রভাত বায়ও সেই সময় মুক্তি লাভ করেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে প্রজা আন্দোলনের ব্যাপকতা লক্ষ করে মহারাজা বীরবিক্রমমাণিক্য ত্রিপুরায় শাসন সংস্কার করতে মনস্থ করেন। ইতিপূর্বে ১৯৩৮ সালে মহারাজা প্রজামণ্ডলী আইন দ্বারা প্রজাদের কিছুটা স্বায়ত্ত শাসন দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং এই আইন অনুযায়ী কয়েকটি গ্রাম মণ্ডলী স্থাপন করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ত্রিপুরার প্রজা আন্দোলন প্রশমিত হয় নি। এর পর ১৯৩৯ সালেব ১৩ই এপ্রিল কর্মচারিবৃন্দের এক সাধারণ সভায় নূতন শাসনব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়। উক্ত শাসন ব্যবস্থায় একটি রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল, একটি মন্ত্রী পরিষদ এবং একটি ব্যবস্থাপক সভার পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৪১ সালে একটি নূতন শাসনতান্ত্রিক আইন পাশ করে পূর্বের উল্লিখিত শাসনব্যবস্থা চালু করা হল বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার ফলে এই শাসনব্যবস্থা আংশিক ভাবে চালু হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবাসীর মনোভাব ব্যক্ত করে যে বিবৃতি প্রচার করে তা নিখিল ভারত দেশীয় রাজা প্রজা সম্মিলনী সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করে এবং আরো বিস্তারিতভাবে এক প্রস্তাব

গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে দেশীয় রাজ্যের রাজারা নিজ প্রজাদের মতামত গ্রহণ না করে তাদের অজ্ঞাতে নানাভাবে এই হিংসাত্মক যুদ্ধে সাহায্য করছেন তা খুবই অন্যায় এবং অযৌক্তিক কারণ প্রজাদের ধনপ্রাণ বিনষ্ট করার আগে তাদের মতামত অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। নিখিল ভারত দেশীয় রাজা প্রজা সম্মিলনীর যুদ্ধ প্রস্তাব অনুসারে গণপরিষদ ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র উক্ত যুদ্ধ প্রস্তাব বাংলা ভাষায় বহু কপি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে। এছাড়াও যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সমস্ত কার্য নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনীর নির্দেশ মতো করতে থাকে।

এদিকে গণআন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ত্রিপুরা সরকারএক আদেশ বলে ত্রিপুরায় সমস্ত রাজনৈতিক সভাসমিতি নিষিদ্ধ করে দেয়। এই আদেশ বলে ঘোষণা করা হল, "বর্তমান ইউরোপীয় মহাসমরের স্থিতিকাল পর্যন্ত বা দ্বিরাদেশ তরে এ রাজ্যে কোনো প্রকার অবাঞ্ছনীয় রাজনৈতিক উত্তেজনা বা বিক্ষোভ সৃষ্টি না হইতে পারে এতদুদ্দেশ্যে অতঃপর মন্ত্রীপরিষদের বিনা অনুমতিতে এ রাজ্যে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কোনো সভাসমিতি বা শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই নির্দেশের প্রতিকূলাচরণ উক্ত ৫৬ ধারায় ব্যবস্থিত তিন বৎসর কাবাদণ্ড ও অর্থদণ্ডযোগ্য হইবে। যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কার্যকারক উক্তপ্রকার বেআইনী সভাসমিতি নিয়ন্ত্রণ এবং এই নির্দেশ কার্যে পরিণতকল্পে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন ও তজ্জন্য আবশ্যকীয় বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে। মন্ত্রী পরিষদ প্রয়োজনানুসারে এই নির্দেশোক্ত নিজ ক্ষমতা কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কার্যকারকের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবে।"

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসেব ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রভাব ত্রিপুরার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ত্রিপুরায় সেইসময় অনেকেই গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই আন্দোলন বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার যে আদেশ জারি করে তারই অনুকরণে ত্রিপুরা সরকার ১৯৪২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর এক ঘোষণা বলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, এবং সর্বপ্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটি নিষিদ্ধ করে দেয়।

ঐ সময় ত্রিপুরার গণ আন্দোলন রোধ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার যে দমননীতি গ্রহণ করেছিল তার প্রতিবাদ জানিয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৫ সালে ত্রিপুরার মহারাজকে নিম্নলিখিত পত্রটি লেখেন। পত্রটি থেকে তৎকালীন গণআন্দোলনের প্রতি সরকারি নীতির একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়।

৩৬, ওয়েলিংটন স্ট্রিট
কলিকাতা
ডিসেম্বর ৯, ১৯৪৫

হিজ হাইনেস মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর
ত্রিপুরা স্টেট, ত্রিপুরা (বেঙ্গল)

প্রিয় মহারাজা সাহেব,

আমি জ্ঞাত হইয়াছি যে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ এবং কংগ্রেসের অনেক সদস্য বিনা বিচারে দীর্ঘকাল ধরে কারাগাবে আছেন। যুদ্ধের শুরুতে স্পষ্টতই তাদের বহুসংখ্যক বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা বাংলা সরকারের না ত্রিপুরা রাজ্যের বন্দি আমি জানি না। আরো সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে যে, এই বন্দিদের প্রতি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তাঁদের কয়েকজন মারাত্মক অসুখে ভুগছেন। আমি আরো জানতে পেরেছি যে ১৯৪০ এর আরম্ভ থেকেই সমস্ত সভা এবং মিছিল এবং অন্যান্য বিক্ষোভ প্রদর্শন রাজ্যটিতে নিষিদ্ধ এবং কোনো প্রকার স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই। আমি আশ্চর্য হই যে আজকের ভারতবর্ষে কোনো রাজ্যে ঘটনাবলীর এমন অবস্থার অস্তিত্ব থাকতে পারে। আমার তথ্যগুলি যদি ভুল হয়, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শুধরিয়ে দিলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। যদি সেগুলি ভুল না হয়, আমি বিশ্বাস করি আপনি অনুগ্রহপূর্বক রাজ্য প্রশাসনের এই কলঙ্ক অপনোদন করবেন। আমি খুশি হব যদি একটি উত্তর, আনন্দ ভবন, এলাহাবাদ, আমার বাড়ির ঠিকানায়, আমার নিকট প্রেরিত হয়।

ভবদীয় স্বাঃ জওহরলাল নেহরু।

মহারাজা অবশ্য ১৯৪৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অভিযোগ অস্বীকাব করে একটি উত্তরপত্র প্রেরণ করেন।

ত্রিপুরা রাজ্য মজদুর সমিতি

১৯৩৯ সালের পর ত্রিপুরা বাজ্য মজদুর সমিতি নামে একটি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এই সমিতি ত্রিপুরা রাজ্যের চা বাগিচায়, আগরতলা মিউনিসিপ্যালটির হরিজনদের মধ্যে ও রাজধানী আগরতলায় যাতায়াতকারী একমাত্র রাস্তা আগরতলা আখউড়া রোড মোটর সার্ভিসের শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনমূলক কাজ কবে তাদের অভাব অভিযোগের জন্য আন্দোলন করে। ১৯৪১ সালে ত্রিপুরা রাজ্য মজদুর সমিতির নেতৃত্বে আগরতলা মিউনিসিপ্যালটিব ধাঙ্গড়রা যুদ্ধকালীন ভাতা, বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, চাকুরির স্থায়িত্ব ইত্যাদির দাবি আদায়ের জন্য একযোগে তিনদিন অবস্থান ধর্মঘট করে। সরকার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। এর কিছুদিন পর ত্রিপুরা রাজ্য থেকে মজদুর সমিতির নেতৃবৃন্দকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কার করা হয়। ধাঙ্গড় ধর্মঘটের সাফল্য লক্ষ করে মজদুর সমিতি ত্রিপুরা রাজ্যের চা বাগানের শ্রমিকদের ও স্টেটম্যাচ ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার কাজে বিশেষ যত্নবান হয়।

ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক সংঘ

১৯৪০ সালে ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক সংঘ নামে একটি সংগঠন আগরতলায় মোটর শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় মনোহর ব্যানার্জি, অজামিল দাস ও গিরিজা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গঠিত হয়। ১৯৪১ সালে আগরতলা ও আখউরা রোডে মোটর চালনার একচেটিয়া অধিকার ত্রিপুরা রাজ্যের এক ভ্রাতাকে বিজ্ঞাপন ছাড়াই দেওয়ায় এবং সমস্ত বেসরকারি মোটরচলাচল নিষিদ্ধ করায় মোটর শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের কর্মীরা মোটর শ্রমিক সংঘকে সমর্থন করে এবং সর্বত্র প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা সরকার এ ব্যাপারে নিষ্পত্তির জন্য গণপরিষদে এক প্রস্তাব প্রেরণ করে। কিন্তু উক্ত প্রস্তাবে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষিত না হওয়ায় গণপরিষদ মোট শ্রমিকদের সমর্থনে আন্দোলন চালাতে থাকে। অবশ্য ত্রিপুরা সরকার এই আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হয়।

কিশোর সংঘ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হলে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি রাশিয়ার যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে অভিহিত করে। এরই ফল স্বরূপ সম্ভবত ১৯৪৩ সালে আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত হল কিশোর সংঘ। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা এর সদস্য ছিল। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য পরিচালিত 'কিশোর বাহিনী' দ্বারা আগরতলায় কিশোর সংঘ প্রভাবিত হয়েছিল। আদর্শ চরিত্র গঠন, গ্রামাঞ্চলে পাঠাগার স্থাপন, যুদ্ধ বিপর্যস্ত পরিবারকে খাদ্য বিতরণ প্রভৃতি এই সংঘের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই উদ্দেশ্যে এই সংঘ আগরতলায় একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করে।

মিলন সমিতি

কৈলাসহরের কিছু যুবক যাঁরা কুমিল্লা কলেজের ছাত্র ছিলেন তাঁরা ১৯৪২ সালে কৈলাসহরের বাজার এলাকায় মিলন সমিতি গড়ে তোলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারীদের অন্যতম অম্বিকা চক্রবর্তী দুবার এই অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং এই সমিতির সদস্যদের উৎসাহিত করেন। সমাজতন্ত্রবাদের ভাবাদর্শে গঠিত এই সমিতি আসামের কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে।

১৯৪২-৪৩ সালের রিয়াং বিদ্রোহ

১৯৪২-৪৩ সালে রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং ও নোয়াতিয়া সম্প্রদায় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু মহারাজার সেনাবাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়।

ত্রিপুরায় খ্রিস্টান মিশনারি

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ত্রিপুরায় যে কিছু সংখ্যক ফিরিঙ্গি বা ভারতে পর্তুগিজ বংশোদ্ভব ব্যক্তি বসবাস করতেন তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এঁদের অনেকেরই পূর্বপুরুষেরা ত্রিপুরার রাজার সামরিক বাহিনীতে কাজ করতেন। এঁরা রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সওদাগরের মাঠ বা মরিয়ামনগরে একটি খ্রিস্টান কলোনি গড়ে তোলেন। এই অঞ্চলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জন্য একটি গির্জাও স্থাপিত হয়। ১৯৩০ সালে এঁদের উদ্যোগে আগরতলায় একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক স্কুল স্থাপন, ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সমবায় ভিত্তিক ছোটো ছোটো বিক্রয় কেন্দ্র এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ঋণসংক্রান্ত সমবায় সমিতি গঠন এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কাজগুলির অন্যতম।

নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি ১৯৩৭ সাল থেকে ত্রিপুরায় ধর্মপ্রচারে তৎপর হয়ে উঠে। অরুন্ধতীনগরে তাদের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ত্রিপুরা ব্যাপ্টিস্ট খ্রিস্টান ইউনিয়ন গঠিত হলে তাদের মাধ্যমে নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি ধর্মপ্রচার ছাড়াও নানাধরনের জনকল্যাণমূলক সেবার কাজে নিয়োজিত থাকে। অরুন্ধতী-নগরে তাদের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ত্রিপুরা ব্যাপ্টিস্ট খ্রিস্টান ইউনিয়ন গঠিত হলে তাদের মাধ্যমে নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটি ধর্মপ্রচার ছাড়াও নানাধরনের জনকল্যাণমূলক সেবার কাজে নিয়োজিত থাকে। অরুন্ধতীনগরে হাসপাতাল এবং বিভিন্ন গ্রামে উপজাতিদের জন্য প্রাথমিক স্কুল স্থাপন এদের উল্লেখযোগ্য অবদান। ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের আমলে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ না থাকলেও পরবর্তী কালে খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত কিছু উপজাতির যুবকদের মধ্যে সচেতনতা বোধে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য ত্রিপুরায় খ্রিস্টান উপজাতিদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

আঞ্জুবন ইসলামিয়া ও ত্রিপুরা রাজ্য মুসলিম প্রজা মজলিস

আবদুল বারিক বা গেদু মিয়ার নেতৃত্বে ১৯৪৫ সালে আগরতলায় আঞ্জুবন ইসলামিয়া নামে একটি সমিতি মুসলিম সম্প্রদায়ের সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য গঠন করা হয়। মুসলিম অধ্যুষিত প্রতিটি জায়গায় এর একটি করে শাখা স্থাপন করা হয়। 'নবজাগরণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা গুলাম নবির সম্পাদনায় আগরতলা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এই সমিতি আগরতলা মসজিদ কামালিয়া মাদ্রাসা এবং কাঞ্চিপুর ও বৃন্দাবন গ্রামে আরো মাদ্রাসা স্থাপন করে। আবদুল বারিক আগরতলার শিবনগর এলাকায় একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৯৫২ সালে এই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে এই সমিতিরও বিলুপ্তি ঘটে।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য

প্রায় একই সময়ে আরমন আলি মুন্সী ও উদয়পুরের ফরিদ মিয়াঁর নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য মুসলিম প্রজা মজলিস নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান মুসলিম কৃষকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় এবং আঞ্জুবন ইসলামিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কাজ করতে থাকে। আগরতলা ধলেশ্বর এলাকার সিরাজুল ইসলাম এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'ফরিয়াদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভারত বিভাগের পর অনেকেই পূর্বপাকিস্তানে চলে গেলে এই প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটে।

জামায়েত উলেমা হিন্দ

১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লির জামায়েত উলেমা হিন্দের একটি শাখা আগরতলায় স্থাপিত হয়। বিশালগড়ের উকিল আমেদ হুসেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবোধ বৃদ্ধি করা এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ১৯৬২ সালের পর এই প্রতিষ্ঠানটি লুপ্ত হয়ে যায়।

ত্রিপুরা রাজ্য জনশিক্ষা সমিতি

১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর (১১ পৌষ ১৩৫৫ ত্রিং) সদর বিভাগের দুর্গাচৌধুরী পাড়ায় মাত্র ১৯ জন শিক্ষিত যুবকের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানেই ত্রিপুরা রাজ্য জনশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। জনশিক্ষা সমিতির উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জজ হৃদয়রঞ্জন দেববর্মা। ঠাকুর ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা ছিলেন এই কমিটির সহ সভাপতি। পরবর্তী কালের অনেক কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ এই সমিতির সদস্য ছিলেন। বীরেন দত্ত, অঘোর দেববর্মা, দশরথ দেববর্মা, নীলমণি দেববর্মা, সুধন্বা দেববর্মা এবং আরো অনেকে এই সমিতির সদস্য ছিলেন। ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী ব্রাউন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সমিতি ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করতে সক্ষম হয়। স্কুলগুলি সরকারি অর্থ সাহায্য লাভ করে। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক গণপ্রতিষ্ঠান হলেও এই সমিতি ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন গতিবেগ সৃষ্টি করেছিল এবং ত্রিপুর জাতীয় মুক্তি পরিষদের গোড়াপত্তন ঘটেছিল সেইদিনই।

মণিপুরি শিক্ষা সমিতি

ত্রিপুরা রাজ্য জনশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৪৫ সালে মণিপুরি শিক্ষা সমিতি গঠিত হয়। রণজিৎ সিংহ এবং রাজকুমার মাধবজিৎ সিংহ এই সমিতির যথাক্রমে

প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ এই সমিতির উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন। মণিপুরিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করাই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

১৯৪৬ সালের নিষেধাজ্ঞা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে রাজনৈতিক বন্দিদের অনেককেই মুক্তি দেওয়া হলে আবার নূতন উদ্যমে অন্দোলন শুরু হল। বিভিন্ন সমিতিও সৃষ্টি হতে লাগল এই সময়ে। এই আন্দোলন রোধকল্পে ত্রিপুরা সরকার ১৯৪৬ সালে এক ঘোষণা বলে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে দেন। ঘোষণায় বলা হল, "যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষার্থে কোনোরূপ অবাঞ্ছনীয় রাজনৈতিক উত্তেজনা বা বিক্ষোভ সৃষ্টি নিবারণ করা আবশ্যক, অতএব ত্রিপুরা শাসনতন্ত্রের ৪৪(ক) ধারা এবং রাজ্যেশ্বর স্বরূপে এ পক্ষের স্বাধিকার বলে এতদ্বারা আদেশ করা যায় যে অতঃপর এ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনো কর্মচারীর সাধারণ বা শর্তাধীন লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ রাজ্যে রাজনীতি সংসৃষ্ট কোনো সভা সমিতি বা শোভাযাত্রা হইতে পারিবে না। উক্ত লিখিত অনুমতির অভাব স্থলে বা অনুমতির শর্তের বা নিষেধবিধির ব্যতিক্রমে সভা বা শোভাযাত্রা বে-আইনি বলিয়া গণ্য হইবে এবং যেকোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কার্যকারক উক্তপ্রকার বেআইনি সভাসমিতি বা শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। বে-আইনি সভাসমিতি বা শোভাযাত্রার উদ্যোক্তা, অনুষ্ঠাতা বা যোগদানকারীগণ বিচারে সশ্রম বা বিনাশ্রমে অনধিক তিন বছর কারাদণ্ড কিংবা উভয় প্রকার দণ্ডাদিষ্ট হইবে। এরূপ অপরাধ পুলিশ ধর্ত্তব্য ও জামিন যোগ্য হইবে।"

ত্রিপুরা রাজ্য প্রজা মণ্ডল

জনমঙ্গল সমিতি, জনশিক্ষা সমিতি এবং এবং আরো কিছু কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন কর্মীরা মিলে ১৯৪৬ সালে ত্রিপুরা রাজ্য প্রজা মণ্ডল নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় আগরতলার কৃষ্ণনগরে স্থাপিত হয়। যোগেশচন্দ্র দেববর্মা এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট এবং বীরচন্দ্র দেববর্মা সেক্রেটারি ছিলেন। জনগণের নির্বাচনের দ্বারা দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য এঁরা যে আন্দোলন করেন তা গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তরেও প্রসার লাভ করে। ১৯৪৬ সালে গোয়ালিয়র অখিল ভারতীয় প্রজা মণ্ডলের অধিবেশনে বীরচন্দ্র দেববর্মা, বীরেন দত্ত ও সুধন্বা দেববর্মা ত্রিপুরা রাজ্য প্রজা মণ্ডলের প্রতিনিধিত্ব করতে প্রেরিত হলেও শেষপর্যন্ত বীরচন্দ্র দেববর্মা অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন ও কেবলমাত্র বীরেন দত্ত ও সুধন্বা দেববর্মা উপস্থিত থাকেন। এই অধিবেশনে

ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ থেকে সুখময় সেনগুপ্ত ও তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত প্রতিনিধিত্ব করায় গোয়ালিয়রের অধিবেশনের কর্মকর্তারা ত্রিপুরার প্রকৃত প্রতিনিধি কারা এটা ঠিক করতে না পারায় উভয় সমিতির প্রতিনিধিদের 'দেশীয় রাজ্য প্রজামণ্ডল' এই নাম নিয়ে একত্র হয়ে সভায় যোগদানের অনুমতি দেয়। বীরেন দত্তের সম্পাদনায় এই সমিতি 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। সরকার অবশ্য ১৯৪৮ সালে এই পত্রিকা প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেয়।

ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ

১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে জনশিক্ষা সমিতি ও ত্রিপুরা রাজ্য প্রজা মণ্ডলের কম্যুনিস্ট পন্থী সদস্যদের গ্রেপ্তার করা শুরু হলে দশরথ দেববর্মা, বীরেন দত্ত, অঘোর দেববর্মা প্রমুখ কয়েকজন কম্যুনিস্টপন্থী ব্যক্তি রাজঘাট গ্রামে লক্ষ্মীকান্ত দেববর্মার বাড়িতে মিলিত হন এবং একটি জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা জাতীয় মুক্তি পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদ পরবর্তী কালে ধাপে ধাপে নাম পরিবর্তিত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ, ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ নামে পরিচিত হয়। ওই বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কমিটি গঠিত হয় নি। এর কয়েক মাস পরে ১৯৪৮ সালের ভাদ্র মাসে সদর মহকুমার উত্তরের কুমারীবিল গ্রামে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানেই পাঁচজন সদস্য নিয়ে মুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এই পাঁচজন সদস্য হলেন দশরথ দেববর্মা, সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মা। দশরথ দেববর্মা মুক্তি পরিষদের সভাপতি এবং অঘোর দেববর্মা সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পূর্বেই মুক্তি পরিষদ পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের বিশেষ করে দেববর্মা গোষ্ঠীয় ত্রিপুরি উপজাতিদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরায় ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠিত হলে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের নেতৃবৃন্দ ত্রিপুরায় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যভুক্ত হন।

ত্রিপুরা রাজ্য কমুনিস্ট সংগঠন

ত্রিপুরা রাজ্য কম্যুনিস্ট পার্টির শাখা কিছুটা দেরিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও কম্যুনিস্ট আদর্শ ১৯৩৮/৩৯ সাল থেকে কুমিল্লার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রসার লাভ করতে থাকে। উমাকান্ত স্কুলের কিছু সংখ্যক ছাত্র মার্কসীয় ভাবাদর্শ ছাত্রদের মধ্যে প্রচারের জন্য একটি আলোচনা কেন্দ্র স্থাপন করে। এই কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য সদস্যরা হলেন বীরেন দত্ত, অনন্ত দে, প্রেমাংশু চৌধুরি, নিমাই দেববর্মা, উষারঞ্জন দেববর্মা, শান্তি দত্ত, কানু সেন, নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, রবি দত্ত এবং দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ত্রিপুরার কিছু সংখ্যক কর্মী কুমিল্লা জেলায় পি. সি. যোশির সভাপতিত্বে ১৯৪৫ সালে কিষান সংগঠনের নির্বাচনী

সভায় অংশগ্রহণ করেন। যোশির উপদেশ অনুযায়ী এইদল বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে আন্দোলনে সাহায্য করতে থাকেন। সুধন্বা দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মা এই সময় উল্লেখযোগ্য কমুনিস্টকর্মী ছিলেন।

ত্রিপুরার কমুনিস্টকর্মীদের উদ্যোগে এবং আসামের প্রসিদ্ধ কমুনিস্টনেতা প্রাণেশ বিশ্বাসের সহযোগিতায় ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে ভারতীয় কমুনিস্ট পার্টির ত্রিপুরা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি বীরেন দত্ত তেজপুর জেল থেকে মুক্তি লাভ করে আগরতলায় আসেন এবং তাঁর সম্পাদিত এবং ত্রিপুরা সরকারের নিষিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা', 'ত্রিপুরার কথা' এই নামে পুনরায় প্রকাশ করতে থাকেন।

ত্রিপুর সংঘ

১৯৪৭ সালের মধ্যে ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও সমিতির কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে আগরতলায় ঠাকুর লোকসমাজের (রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত) কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 'সেবা সমিতি' নামে একটি সংগঠন গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন। জনশিক্ষা সমিতির মতো গ্রামে গ্রামে উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজকর্ম করাই এই 'সেবা সমিতি'র উদ্দেশ্য ছিল। মহারাজা বীরবিক্রমের অনুপস্থিতিতে এবং বিনা অনুমতিতে শহরের ঠাকুর শ্রেণীর দ্বারা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা কবায মহারাজা 'সেবাসমিতি' বাতিল করে দেন। এরপর ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে (১১-১২ ৫৬ ত্রিং) মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অর্থানুকূল্যে আগরতলায় ত্রিপুর জাতীয় সম্মেলনীব এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় ত্রিপুরি, জমাতিয়া, রিয়াং, হালাম, নোয়াতিয়া প্রভৃতি উপজাতির প্রায় দশ হাজার লোক উপস্থিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকুমার দেববর্মা। ললিতমোহন দেববর্মা এবং জিতেন্দ্রমোহন দেববর্মা বিভিন্ন বক্তব্য রাখেন এবং ত্রিপুবার উপজাতিদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে মহারাজার কাছে একটি আবেদন পত্র পেশ করেন। মহাবাজা এই সভার আবেদনগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এই সম্মিলনীর সভাতেই সর্বসম্মতিক্রমে 'ত্রিপুর সংঘ' নামে একটি সংঘ গঠিত হয়। ত্রিপুর সংঘের কমিটিতে প্রথমে জনশিক্ষা সমিতির সদস্যরা প্রাধান্য লাভ করলেও মহারাজা তাঁদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে ত্রিপুর সংঘে জনশিক্ষার সদস্যদের প্রাধান্য খর্ব করেন। পরবর্তী কালে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে কমুনিস্ট সংগঠন গণমুক্তি পরিষদের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে 'ত্রিপুর সংঘের' সমর্থকদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে।

বীরবিক্রম ত্রিপুর সংঘ

মহারাজা বীরবিক্রমমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও তৎকালীন মন্ত্রী

দুর্জয়কিশোর দেববর্মার সভাপতিত্বে 'বীরবিক্রম ত্রিপুর সংঘ' নামে আর একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হল। এই সংঘের সম্পাদক বিদুরকর্তার বাড়িতে এর কার্যালয় স্থাপি ত হয়। অন্যান্য সামাজিক সংস্কার ছাড়াও এই সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরায় পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত শরণার্থী আগমন রোধ করা। ত্রিপুরার পুরাতন বাসিন্দাদের জমির অধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে সেদিকে এই সংঘ বিশেষ সচেষ্ট ছিল। এই সংঘের চেষ্টায় ১৯৪৯ সালে সরকার ঘোষণা করে, "যাঁহারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজা নহেন তাঁহাদের কাহারও ভূমি বন্দোবস্তের প্রার্থনা এ রাজ্যের দেওয়ানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত গ্রাহ্য হইবে না।" এই সময় যজ্ঞেশ্বর দেববর্মার পুত্র কুঞ্জেশ্বর দেববর্মার নেতৃত্বে 'সেংক্রাক' বা বীর নামে একটি চরমপন্থীদের আবির্ভাব ঘটে। এই দলটি 'বীরবিক্রম ত্রিপুর সংঘের' সাহায্য ও সমর্থনের জন্যই স্থাপিত হয়েছিল। এই সংঘের আদর্শকে বাস্তবায়িত করাই এই দলের মূল উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানকারী ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজকীয় রক্ষী বাহিনীর কিছু পদচ্যুত ব্যক্তি এই দলের সদস্য ছিলেন। এ বি চ্যাটার্জির চীফ কমিশনার হিসাবে নিযুক্তির পর এই সংঘের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়।

ফরোয়ার্ড ব্লক

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিশেষ করে কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী জেলা থেকে আগত কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি ত্রিপুরা রাজ্যে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিজেন দে, শৈলেশ সেন, গোপীবল্লভ সাহা, অনিল দাস, সত্যেন্দ্রকিশোর কর, হীরেন নন্দী, সতী ভরদ্বাজ, বৈদ্যনাথ মজুমদার, হৃষীকেশ দত্ত, বীরবল্লভ সাহা ও কমলারঞ্জন তলাপাত্র এই সমিতির উল্লেখযোগ্য সদস্য। এই সমিতি 'অগ্রগতি' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে। ত্রিপুরায় সরকারি সহায়তায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এই সংগঠনের উল্লেখযোগ্য অবদান। আগরতলায় নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন, খোয়াই-এর শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন, ঈশানচন্দ্রনগরে ঈশানচন্দ্র স্কুল এই সংগঠনের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল

১৯৪৮ সালের পূর্বেই রামনগরের শঙ্কর বর্মন এবং এম সিংহ সহ মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের কিছু ছাত্র বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের ভাবাদর্শে একটি সমিতি গঠন করলেও ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে এই দলটিকে সুগঠিত করেন প্রসিদ্ধ উকিল যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি ১৯৫০ সালে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। এই পাঠাগারটি আগরতলার মিউনিসিপ্যাল গৃহের দ্বিতলে অবস্থিত ছিল।

গান্ধি গ্রাম বিকাশ সমিতি

১৯৪৮ সালে আগবতলার জয়নগরে এই সমিতি স্থাপিত হয়। নয়াদিল্লির গান্ধি স্মারক নিধির নির্দেশ অনুসারে বাংলা শাখার মাধ্যমে এই সমিতি পরিচালিত হত। গান্ধিজির আঠারো দফা কার্যসূচী অনুসারে ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি-বিধান এবং সর্বশ্রেণীর মধ্যে সর্বোদয় সমাজ স্থাপন করাই এর উদ্দেশ্য।

ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস কমিটি

সম্ভবত ১৯৪৬ সালের পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে স্থায়ী ভাবে কোনো কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় নি। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত কিছু বাজনৈতিক কর্মী ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জেলাগুলিতে কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করেন এবং ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন। ১৯৪০ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস কমিটির অস্তিত্ব থাকলেও তা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ১৯৪৬ সালের ২৬ জানুয়ারি স্থায়ী ভাবে ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠিত হলে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের সদস্যরা এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত হন। শচীন্দ্রলাল সিংহ, উমেশলাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত, হরিগঙ্গা বসাক, তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত, শান্তি দাশগুপ্ত প্রভৃতি এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন শচীন্দ্রলাল সিংহ এবং সেক্রেটারি ছিলেন উমেশলাল সিংহ। কংগ্রেস কমিটির প্রধান কার্যালয় আগরতলার মোগড়া রোড বা আধুনিক হরিগঙ্গা বসাক রোডে স্থাপিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস প্রথমে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটি জেলা কমিটি হিসাবে যুক্ত থাকে। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার পর মহাত্মা গান্ধি যখন ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে নোয়াখালি পরিদর্শনে আসেন তখন ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের কিছু সদস্য তাঁর সঙ্গে দেখা করে ত্রিপুরায় কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ নেন। অস্পৃশ্যতা-দমন, চরখা ও খদ্দর প্রস্তুত ও মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি এই কমিটির কার্যাবলীর অন্যতম ছিল। কংগ্রেস প্রচারপত্র ছাড়াও সুখময় সেনগুপ্তের সম্পাদনায় ১৯৪৯ সাল থেকে 'কংগ্রেসীদের দুটি কথা' নামে একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হত।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে ত্রিপুরাতেও ভারতের স্বাধীনতা উৎসব পালিত হল যদিও তখনও ত্রিপুরাতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য মৃত্যুর পূর্বেই ত্রিপুরাকে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার সম্মতি দিয়ে গেলেন। ১৯৪৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতের অংশ হিসাবে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। সমাপ্ত হল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

ত্রিপুরার শাসন পদ্ধতি

প্রশাসন

মাণিক্য রাজবংশের শাসনাধীনে ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘদিন সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাজাই ছিলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা এবং রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। মাণিক্য বংশীয় রাজারা রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও এক দল উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাহায্যেই তাঁরা দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। প্রথম দিকে রাজার নিজ গোষ্ঠীর অভিজাতবর্গ রাজপরিবার ভুক্ত ব্যক্তিরাই প্রশাসনের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন। নারায়ণ উপাধিযুক্ত এইসব ব্যক্তিরা একদিকে ছিলেন সেনাপতি অন্যদিকে ছিলেন রাজার পরামর্শদাতা। সেনাবাহিনী এঁদের হাতে থাকায় এঁরা খুবই ক্ষমতাশালী ছিলেন। সম্ভবত রত্নমাণিক্যই প্রথম প্রতিবেশী মুসলিম শাসনের অনুকরণে কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করেন। মুসলিম শাসনের অনুকরণে তিনি চারটি উচ্চপদের সৃষ্টি করেন। এই পদগুলি হল (১) উজির বা প্রধানমন্ত্রী (২) সুবা বা সেনাপতি (৩) নাজির বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনীর প্রধান এবং (৪) দেওয়ান বা অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। পরবর্তী কালে কারাকুল, কোতয়াল মুসিব, নেমুজির প্রভৃতি আরও নতুন নতুন উচ্চপদের কর্মচারী নিযুক্ত হয়। বীরচন্দ্রমাণিক্যের পূর্ব পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে এইধারা অক্ষুন্ন ছিল। প্রশাসনে বাংলা ও ফার্সিভাষা ব্যবহার করা হত।

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের শাসনকালে প্রশাসনযন্ত্রের আধুনিকীকরণ শুরু হয়। তিনি মন্ত্রিপদের সৃষ্টি করে তাঁকেই প্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দান করেন। কখনো কখনো দেওয়ানও মন্ত্রী পর্যাযভুক্ত হতেন। প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজের জন্য তিনি কয়েকটি বিভাগ গঠন করেন এবং প্রত্যেকটি বিভাগের পরিচালনা করতেন একজন করে প্রধান কার্যকারক। রাজাকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি অমাত্য সভা এবং একজন রাজার নিজস্ব সেক্রেটারিও নিযুক্ত হন। রাধাকিশোরমাণিক্য রাজ্য ও জমিদারি সংক্রান্ত কার্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহক সভা গঠন করেন এবং আইন প্রণয়ন ইত্যাদি কাজের জন্য ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন করেন। মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সময় অমাত্য সভার পুনর্গঠন করার পর নামকরণ করা হয় স্টেট কাউন্সিল। দক্ষ প্রশাসক যাতে প্রশাসনে নিযুক্ত হতে

পারে সেজন্য তিনি 'স্টেট সিভিল সার্ভিস' গঠন করেন। মহারাজা বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের সময় 'মন্ত্রণা সভা', 'ব্যবস্থাপক সভা' ও মন্ত্রিপরিষদ নামে তিনটি পরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের উপর রাজ্য শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। 'মন্ত্রণাসভা' বা 'রাজসভার' কাজ ছিল মহারাজাকে সর্ববিষয়ে পরামর্শ বা মন্ত্রণা দেওয়া। উজির, সুবা, নাজির প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পদগুলি বিলুপ্ত না হলেও কালক্রমে দায়িত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায়।

যুবরাজ, বড়ঠাকুর ও উত্তরাধিকার আইন

রাজার উত্তরাধিকার ছিলেন যুবরাজ। ক্ষমতা ও পদমর্যাদায় রাজার পরেই ছিল তাঁর স্থান। রাজস্ব, হস্তি ও সেনাদল তাঁর অধীনে ছিল। প্রয়োজন হলে তিনি যুদ্ধে যেতেন। এই যুবরাজ পদটি কল্যাণমাণিক্য সৃষ্টি করেন বলে জানা যায়। কল্যাণমাণিক্য নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দমাণিক্যকে হিন্দু শাস্ত্রমতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং সেইসময় থেকে ত্রিপুরার রাজবংশে যুবরাজ নিযুক্তির প্রথা প্রচলিত হয়। কল্যাণমাণিক্য অন্যান্য রাজকুমারদের ঠাকুর উপাধি দেন। পরবর্তী কালে রাজকুমাররা 'কর্তা' নামে অভিহিত হন। গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্য বড়ঠাকুরের পদ সৃষ্টি করেন। যুবরাজের পরেই ছিল বড়ঠাকুরের স্থান। বন থেকে হস্তি সংগ্রহ করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব ছিল। বাংলার নবাবকে কর হিসাবে হস্তি দিতে হত বলে হস্তিসংগ্রহের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। এই পদটি সৃষ্টির পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে জটিলতা ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। কারণ বড়ঠাকুর যুবরাজের উত্তরাধিকারী হতেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার এক সনদের মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে সিংহাসনের উপর দেববর্মা পরিবারের বংশানুক্রমিক দাবি থাকবে। রাজা নিজ বংশ থেকে কোনো পুরুষকে সিংহাসনের জন্য যুবরাজ মনোনীত করেন। রাজার কোনো মনোনীত প্রার্থী না থাকলে তাঁর নিকটতম পুরুষ আত্মীয় সিংহাসনের অধিকারী হতেন। প্রত্যেক প্রার্থীর রাজ্যপ্রাপ্তি ভারত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল।

স্থানীয় শাসন

রাজ্য ও তাঁর পরিবার ও অনুচরবর্গ রাজধানীতে বাস করতেন। প্রথমদিকে রাঙ্গামাটি বা উদয়পুরও পরবর্তী কালে আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। অবশ্য কোনো কোনো সময় অস্থায়ী ভাবে অমরপুর, পুরাতন আগরতলা প্রভৃতি স্থানেও রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। প্রশাসন ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে মুসলিম শাসনের অনুকরণে রাজ্যকে কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করা হয়েছিল এবং প্রতিটি পরগনায় চৌধুরি উপাধিযুক্ত শাসক নিযুক্ত করা হত। দূরবর্তী এলাকাগুলি এবং সদ্য বিজিত অঞ্চল লস্করের অধীন ছিল।

সদ্যবিজিত এলাকায় থানা বা সেনাশিবির স্থাপন করা হত এবং থানার দায়িত্বে থাকতেন থানাদাররা। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে ত্রিপুরাকে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। বিভাগগুলির প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল যথাক্রমে কৈলাসহর, আগরতলা ও উদয়পুর (পরে সোনামুড়া)। পরবর্তীকালে মহকুমা সদৃশ আরো কয়েকটি বিভাগ সৃষ্টি হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পন্ন আধিকারিকরা শাসন হিসাবে নিযুক্ত হন। জমিদারি চাকলা রোশনাবাদের জন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত থাকতেন।

পার্বত্য অঞ্চলে উপজতি অধ্যুষিত এলাকায় উপজাতির সর্দাররা নিজ নিজ গ্রামগুলির তত্ত্বাবধান করত। নিজ নিজ এলাকায় তারাই ছিল সর্বেসর্বা এবং নিজস্ব গোষ্ঠী বা উপজাতির রীতিনীতি অনুযায়ী গ্রামগুলি শাসিত হত। গ্রামের সর্দাররাও চৌধুরি উপাধিপ্রাপ্ত হতেন এবং প্রধান সর্দার রায় এবং কখনো কখনো রাজা উপাধি প্রাপ্ত হতেন। তাঁরা ত্রিপুরার রাজার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ বনজ সম্পদ নজর বা উপহার দিতেন। যুদ্ধের সময় ও অন্যান্য প্রয়োজনে তাঁরা রাজাকে সৈন্য ও লোক দিয়ে সাহায্য করতেন। মিসিপ নামে একশ্রেণীর কর্মচারী উপজাতিদেব প্রতিনিধি হিসাবে রাজদরবারে অবস্থান করতেন ও উপজাতীয় প্রজাদের সম্পর্কে খোঁজখবর দিতেন। এই সব মিসিপদের উপজাতিদের মধ্য থেকে রাজা মনোনীত করতেন। বাজাব সঙ্গে পার্বত্য দলপতিদের সাক্ষাতের একটি বিশেষ পদ্ধতি হল 'হসম ভোজন' প্রথা। শারদীয় পূজাকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দলপতিবা 'হসম ভোজন'-এর জন্য রাজা কর্তৃক নিমন্ত্রিত হতেন। ভোজনের মাধ্যমে এইসময় রাজা ও দলপতিদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ হত।

রাজস্ব ব্যবস্থা

রাজার আয়ের প্রধান উৎস ছিল রাজস্ব থেকে আয়। সমতল অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ভূমিকর, পার্বত্য অঞ্চলের ঘরচুক্তি কর, বনকর, বাঁশ, বেত, কার্পাস, তুলা প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত শুল্ক, হস্তি, নজর, জরিমানা প্রভৃতি থেকে রাজার অর্থ সংগ্রহ করা হত।

সমতল অঞ্চলে যারা হল কর্ষণের দ্বারা চাষ আবাদ করত তাদের কাছ থেকে ত ভূমিকর আদায় করা হত। বাজার ভূমিরাজস্ব থেকে আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে কৃষকদের ত্রিপুরায় বসতি করে হলকর্ষণের দ্বারা চাষ আবাদে উৎসাহিত করা হত। অধিকাংশ চাষযোগ্য জমি রাজা জমিদার বা তালুকদারদের মধ্যে নির্দিষ্ট খাজনা আদায়ের শর্তে বিলি করে দিতেন। জমিদার ও তালুকদাররা সাধারণত জমির আদায়কৃত খাজনার একদশমাংশ নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট রেখে বাকিটা রাজসরকারে জমা দিতেন। কিছু নিষ্কর জমি ও অন্যান্য কিছু সুযোগ সুবিধাও তারা ভোগ করতেন। মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা জমা দিলেও প্রজারা জমিদারদের উৎপন্ন ফসলের একাংশ মুদ্রার পরিবর্তে জমা

দিতে পারত। জমির উর্বরতা অনুযায়ী খাজনার হারের পরিমাণ নির্দিষ্ট হত। প্রজাদের বার্ষিক জমার অতিরিক্ত হিসাবে ভেট, বেগার, পাঁচা পঞ্চক, বীরসিংহ নামক নানাধরনের স্থানীয় কর দিতে হত। জঙ্গলাকীর্ণ জমিগুলি বিশেষ সুবিধাজনক শর্তে বন্দোবস্ত দেওয়া হত। এই জমির জন্য প্রথম কয়েক বৎসর কোনো খাজনা দিতে হত না। জমিদারি ও তালুকদারি ছাড়াও কিছু রায়তি স্বত্বও প্রচলিত ছিল। এই স্বত্ব অনুযায়ী জমির অধিকারীরা বংশানুক্রমিক ভাবে জমি ভোগদখল করতে পারত তবে সরকারের অনুমতি ছাড়া জমি হস্তান্তর করতে পারত না। কয়েকটি পরগনার রাজস্ব থেকে আয় রানি ও রাজপরিবারের ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মাণিক্য রাজারা নানাধরনের লাখেরাজ বা নিষ্কর জমিও দান করতেন। রাজমালা ও মাণিক্য বংশীয় রাজাদের ভূমিদানপত্রগুলিতে যে সব নিষ্কর ভূমিদানের উল্লেখ আছে সেগুলি হল (১) ব্রহ্মোত্তর (ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের দান) (২) ফকিরান (মুসলমান ফকিরদের দান) (৩) আয়মা (ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মাচরণের জন্য দান) (৪) ইনাম (সেবার জন্য পুরস্কার) (৫) খানেবাড়ি (বসতি স্থাপনের জন্য দান) (৬) নানকর (ভরণপোষণের জন্য কর্মচারীদের দান) (৭) চারাগি খয়রাত (মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য) (৮) বৈদ্যাঙ্ক (বৈদ্য বা চিকিৎসকদের জন্য) এবং (৯) দেবোত্তর (মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য)।

পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় প্রজারা নানাবিধ অরণ্য-জন্তু, গজদন্ত, পশুচর্ম ও শৃঙ্গ, ধাতুনির্মিত বস্তু ও নিজ হস্তে বোনা নানা ধরনের বস্ত্র বার্ষিক নজর হিসাবে প্রদান করত এবং রাজকর রূপে সেগুলি গৃহীত হত। এছাড়াও জুমোৎপন্ন তিল ও কার্পাসের নির্দিষ্ট অংশ রাজা গ্রহণ করতেন। পরবর্তী কালে পার্বত্য অঞ্চলের প্রজাদের কাছ থেকে ঘরচুক্তি কর আদায় করা হত। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীর প্রজারা হলকর্ষণের দ্বারা জমিচাষে অভ্যস্ত ছিল না। তারা জুমচাষে অভ্যস্ত ছিল। তাদের কাছ থেকে জমির পরিমাণের পরিবর্তে পরিবার পিছু কর আদায় করা হত। একে বলা হত ঘরচুক্তি কর। পূজার সময় উপজাতীয় সর্দাররা রাজদরবারে সমবেত হতেন এবং নিজেদের এলাকার পরিবারের সংখ্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘরচুক্তি কর দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতেন। উপজাতি অনুসারে ঘরচুক্তি করের পরিমাণের তারতম্য হত। হান্টারের রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিপ্রা ও জামাতিয়াদের ঘরচুক্তি হার পরিবার পিছু যেখানে ছিল সাড়ে তিন টাকা সেখানে রিয়াং ও নোয়াতিয়াদের ঘরচুক্তি হারের পরিমাণ ছিল পরিবার পিছু দশ টাকা। হালাম সম্প্রদায় রাজপ্রাসাদ ও সরকারের অন্যান্য কাজে সাহায্য করত বলে তাদের ঘরচুক্তি করের হার ছিল সর্বাপেক্ষা কম। যে সব সম্প্রদায় রাজপরিবারে অথবা রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকত তাদের রাজস্ব থেকে রেহাই দেওয়া হত এবং তাদের বলা হত হুদা বা হুদার লোক। পার্বত্য অঞ্চলের বনজ সম্পদ, তিল, কার্পাস প্রভৃতি

বিক্রয়ের জন্য শুল্ক দিতে হত। বনের হস্তি বিক্রির লাভ থেকে একটা অংশ রাজাকে দিতে হত। পার্বত্য এলাকায় সরকারি কর্মোপলক্ষে ভ্রমণরত রাজকর্মচারীদের মালপত্র বহন ও পথ প্রদর্শনের কাজ করতে বাধ্য ছিল পার্বত্য প্রজারা। প্রথমদিকে এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হত না। এই প্রথাকে বলা হত তৈথুং প্রথা। লাহার প্রথা অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের প্রজারা কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিনা পারিশ্রমিকে জঙ্গল পরিষ্কার করে রাস্তা তৈরি করতে বাধ্য থাকত।

ত্রিপুরা রাজ্যের এলাকা বহির্ভূত কিছু কৃষক ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে প্রবেশ করে অস্থায়ী ভাবে বসতি ও চাষ আবাদ করে ফসল উৎপন্ন হলে তা সংগ্রহ করে চলে যেত। এ ধরনের অস্থায়ী প্রজাদের জিরাতিয়া প্রজা বলা হত। এরজন্য তারা ত্রিপুরার রাজাকে কর দিত। পশুর জন্য নিয়মিত ঘাস ও অন্যান্য আহার্য যারা সংগ্রহ করত তাদের ঘাসুরি নামে বিশেষ কর দিতে হত। মুসলমান প্রজাদের বিবাহ ও নিকে উপলক্ষে কয়েকটি নির্দিষ্টস্থানে কাজিয়ানা নামে বিশেষ কর দিতে হত। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য প্রজাদের বিশেষ বিশেষ কর দিতে হত। রামগঙ্গামাণিক্যের বিবাহে এবং দুর্গামাণিক্যের রাজ্যাভিষেকে প্রজাদের এক আনা করে বিশেষ কর দিতে হয়েছিল।

ত্রিপুরায় জরিপ ও বন্দোবস্ত বিষয়ে প্রথম লিখিত আইন চালু হয় ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে যার শিরোনাম ছিল 'রাজস্ব সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী'। ১৮৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় বিষয়ক আইন' প্রচলিত হয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী', ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে 'সরকারি প্রাপ্য আদায় সম্বন্ধীয় আইন' এবং ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে 'পার্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি কর সম্বন্ধীয় আইন' চালু হয়।

মুদ্রা ব্যবস্থা

দেশে মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং রাজার নিজস্ব টাঁকশালে মুদ্রা তৈরি হত। সাধারণত মুদ্রার মাধ্যমে কর আদায় করা হত। পার্বত্য অঞ্চলের প্রজাদের মধ্যে অবশ্য মুদ্রার বিশেষ প্রচলন ছিল না। তারা নিজেদের মধ্যে দ্রব্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করত। রাজকার্যের অনেক বিষয় বাধ্যতামূলক শ্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন হত বলে রাজার প্রশাসনিক ব্যয় ভার অনেকটা কম ছিল। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ফরাসি পর্যটক টাভার্নিয়ে বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণ থেকে জনা যায় যে ত্রিপুরার রাজাদের একটি স্বর্ণখনি ও রেশমের কারখানা ছিল। ঐ স্বর্ণখনি ও রেশম কারখানায় অভিজাত সম্প্রদায় বাদে প্রতি ব্যক্তিকে বৎসরে ছয় দিন কাজ করতে হত। স্বর্ণ ও রেশম চীন দেশে রপ্তানি করা হত এবং তার বদলে এ রাজ্যে রৌপ্য আমদানি হত। এই রৌপ্য থেকেই রাজার মুদ্রা তৈরি হত। রৌপ্য মুদ্রা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে রাজারা স্বর্ণমুদ্রা

প্রচার করতেন। রৌপ্য মুদ্রাগুলি ছিল বিভিন্ন ধরনের। ১৭৬০ সালের পর থেকে ক্রমশ কোম্পানিমুদ্রা ত্রিপুরায় চালু হতে শুরু করে এবং আরো পরবর্তী কালে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রাই ত্রিপুরার প্রচলিত হয়।

বিচার ব্যবস্থা

মাণিক্য বংশী বাজাদেব রাজত্বের প্রথম দিকে রাজ্যে বিচার বিষয়ক লিখিত কোনো আইন ছিল বলে জানা যায় না। স্থায়ী আদালত বা কারাগারের অস্তিত্বেরও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিচার না হওয়া পর্যন্ত অপরাধীদের আলং নামে এক অস্থায়ী বন্দিশালায় রাখা হত। সাধারণত সমতা ও বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী বিচারকরা অপরাধীদের বিচার করতেন। প্রধান বিচারপতি ছিলেন রাজা। তাঁর কাছেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সকল বিচার্য বিষয় উত্থাপন করা হত। অপরাধীদের শাস্তি ছিল কঠোর। বিচারে দোষী প্রমাণিত হলে প্রকাশ্যে শিরশ্ছেদ বা হাতির তলায় ফেলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের নিজস্ব রীতি অনুযায়ী সর্দাররা বিচার করলেও তাদের ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচার কার্য পরিচালনার জন্য একটি পাহাড়ি আদালত স্থাপিত ছিল। কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ বিচারকার্য স্থানীয় সর্দাররাই সমাধা করতেন বলে পাহাড়ি আদালতে খুব কমই বিচারকার্য সমাধা হত।

মহারাজা বীবচন্দ্রমাণিক্যের আমলে আইন প্রণয়ন ও তাদের বিধিবদ্ধভাবে প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার আধুনিক বিচার ব্যবস্থার পত্তন ঘটে। পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি সংক্রান্ত বিচারের চূড়ান্ত নিস্পত্তি রাজা নিজে করতেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই সব মোকদ্দমার বিচারের জন্য খাস আপিল আদালত নামে একটি বিচারালয় স্থাপিত হয়। এই আদালতেব জন্য দুজন বিচাবক নিযুক্ত হন। খাস আপিল আদালতের প্রধান বিচারপতি বা চিফ জাস্টিস হিসাবে যুববাজকে নিযুক্ত করা হয়। একই বিচার ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য পূর্ব-প্রচলিত পাহাড়ি আদালত রদ কবা হয়।

পুলিশ ব্যবস্থা

রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নাজিরের অধীনে একদল সৈন্য থাকত। রাজধানীর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছিল কোতায়াল মুসিবের উপর। বস্তুত কোতোয়াল মুসিব নিযুক্ত হবার পর নাজিরের গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পায়। বিনন্দিয়া নামে রাজার এক প্রকার সৈন্য বা পেয়াদা থাকত। তারা প্রাসাদরক্ষীর কাজ করত এবং পুলিশ বা পেয়াদার কাজও করত। রাজার আদেশ প্রচার ও পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে যে কোনো অভিযুক্ত প্রজাকে তারা বন্দি করে নিয়ে আসতে পারত। বন্দি বা অপরাধীদের যে বন্দি-শিবিরে রাখা হত তার প্রধান ছিলেন আলং হাজারি। তিনি বিনন্দিয়াদের প্রধান ছিলেন। আলং হাজারিরা

নাজির উপাধিও প্রাপ্ত হতেন। বীরচন্দ্রমাণিক্য ও রাধাকিশোরমাণিক্যের সময় পুলিশ বিভাগ পুনর্গঠন করে আধুনিকীকরণ করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে থানা সৃষ্টি করে থানায় দারোগার অধীনে একদল পুলিশ রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

সামরিক বিভাগ

মাণিক্য বংশী রাজারা যুদ্ধবিগ্রহ ও নিরাপত্তার জন্য এক বিশাল সেনাবাহিনী সর্বদা প্রস্তুত রাখতেন। প্রথমদিকে সেনাবাহিনী ত্রিপুরা উপজাতির সম্ভ্রান্তবংশীয় নারায়ণ উপাধিধারী সেনাপতিদের অধীনে রাখা হত। এইসব সৈন্য ছাড়াও যুদ্ধের সময় বিভিন্ন উপজাতির দলপতিরা তাদের দলবল নিয়ে রাজাকে সাহায্য করতেন। সম্ভবত রত্নমাণিক্য বাংলার সুলতানি শাসন পদ্ধতি অনুসারে ত্রিপুরায় শাসন সংস্কার করেন এবং সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন করেন। প্রধান সেনাপতি সুবা উপাধিপ্রাপ্ত হন। সুবার অধীনে হাজারি, জমাদার, দফাদার প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সৈন্য পরিচালনা করতেন। রত্নমাণিক্যের মৃত্যুর পর নারায়ণ উপাধিধারী সেনাপতিরা বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে ধন্যমাণিক্য এই সব নারায়ণদের ক্ষমতা খর্ব করেন। তিনি অন্যান্য উপজাতিদের মধ্য থেকেও সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এদের মধ্যে রিয়াং উপজাতির রায়কচাগ ও রায়কছাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজয়মাণিক্য নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা ও বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য পদাতিক, গোলন্দাজ, অশ্বারোহী, হস্তি ও রণতরী নিয়ে এক বিশাল সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। রেভারেণ্ড জেমস লং রাজমালা বিশ্লেষণকালে উল্লেখ করেছেন বিজয়মাণিক্য গোলন্দাজ বাহিনী ছাড়াও ছাব্বিশ হাজার পদাতিক, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচ হাজার রণতরী নিয়ে পূর্ব বাংলায় অভিযান করেছিলেন। তিনি খড়াইত বা খড়্গধারী এক বিশেষ শ্রেণীর সৈন্য দল গঠন করেন। এই খড়াইত সৈন্য বিশেষ সাহসী ও বলশালী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হত। রাজমালাতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি সাতবার ধন্যসাগর প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হত তাকেই খড়াইত বিভাগে নিযুক্ত করা হত। বিজয়মাণিক্য একদল পাঠান অশ্বারোহী সৈন্যও নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে বিজয়মাণিক্যের অশ্বারোহী সৈন্য বেশি না থাকলেও পদাতিক সৈন্যসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ এবং রণহস্তি ছিল এক হাজার। বাহরোস্তান-ই-ঘায়েবি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে যশোধরমাণিক্য ষাট হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্বারোহী এবং দুইশত রণহস্তি নিয়ে মুঘলদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। এ ছাড়াও এক বিশাল নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনী উদয়পুর রক্ষায় নিযুক্ত ছিল।

ত্রিপুরার পদাতিক বাহিনী ছিল দুই শ্রেণীর। একদল ছিল ঢালি। এরা ঢাল তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করত। আর-একদল ছিল তিরন্দাজ যারা তির ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত। গোলন্দাজ

বাহিনীতে ছিল কামান ও বন্দুক। অমরমাণিক্য গোলন্দাজ বাহিনীতে কিছু পর্তুগিজ সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

ত্রিপুরার রাজারা যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চলে গড় বা দুর্গ নির্মাণ করতেন। কৈলাগড়, চণ্ডীগড়, বিশালগড়, কলমিগড়, জামির খানগড় প্রভৃতি নামগুলি তার সাক্ষ্যবহন করছে। সদ্যবিজিত স্থানে থানা বা সেনা নিবাস স্থাপন করা হত। নৈশ আক্রমণ ও নদীর বাঁধ ভেঙে দিয়ে শত্রুদের গতিরোধের চেষ্টাও করা হত। প্রধান সেনাপতি সুবা ছাড়াও উজির, নাজিররাও প্রয়োজনে যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করতেন। যুদ্ধের সময় উপজাতিদের মধ্যে রাজার বিশেষ দূত ফুরাই বা রাজ চিহ্নযুক্ত দণ্ড সহ গমন করে রাজার আজ্ঞা প্রচাব করত।

১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণমাণিক্য ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে ত্রিপুরায় একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। পার্বত্য ত্রিপুরায় রাজাদের স্বাধীনতা বজায় থাকলেও প্রকৃত পক্ষে রাজারা নিরাপত্তার জন্য ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আত্মরক্ষাব তাগিদ না থাকায় ব্রিটিশ আমলে ত্রিপুরার রাজারা আর সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেন না। তাছাড়া বিশাল সামরিক বাহিনী রাখার মতো আর্থিক সামর্থ্যও তাঁদের ছিল না। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দেব একটি বিবরণী থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরাব রাজার সেই সময এক হাজার বন্দুকধারী হিন্দু সৈন্য ও সর্দারের অধীন তিন হাজার কুকি সৈন্য ছিল। বীরচন্দ্রমাণিক্য তাঁর সেনাদলকে আধুনিক পদ্ধতিতে গঠন করলেও ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র আড়াই শত। প্রাচীনকালের মাণিক্য রাজাদের বিশাল সামরিক বাহিনী ও তার শক্তি শুধু কিংবদন্তীই হয়ে রইল।

অষ্টম অধ্যায়

উপজাতির পরিচয়

ত্রিপুরার উপজাতি ও অন্যান্য অধিবাসীর পরিচয়

ত্রিপুরায় বিভিন্ন উপজাতি, মণিপুরি ও বাঙালির বাস। ত্রিপুরি বা ত্রিপুরা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, হালাম,কুকি, লুসাই, মগ ও চাকমা এরা সকলেই ত্রিপুরার আদিবাসী। এছাড়াও ত্রিপুরায় রয়েছে উছাই, গারো, সাঁওতাল, ছৈমল, ওরাং, মুন্ডা, ভুটিয়া, লেপচা, ভীল ও খাসিয়া। গারো, উচাই, খাসিয়া ছাড়া অন্যান্য উপজাতিরা চা বাগানের শ্রমিক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ত্রিপুরায় এসে বসতি স্থাপন করেছে। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচিত। ত্রিপুরার রাজপরিবার ও শাসক শ্রেণী ত্রিপুরি উপজাতিভুক্ত ছিলেন। ত্রিপুরিরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন পুরান ত্রিপুরি এবং দেশি বা নতুন ত্রিপুরি। রাজপরিবার ও শাসক শ্রেণী ছাড়া পুরান ত্রিপুরিদের অধিকাংশই পাহাড় পর্বতে বাস করতো। রাজ্যের নানাবিধ রাজকার্য সম্পাদনের জন্য তারা রাজসরকার কর্তৃক বারোটি উপাধিযুক্ত পদে বা হুদায় বিভক্ত ছিল। এই হুদাগুলি হল বাছাল, সিউক, বোয়াতিয়া, দৈত্য সিং, হুজুরিয়া, শিলাটিয়া, আপাইয়া, ছত্রতুইয়া, দেওরাই, সুবে নারায়ণ, সেনা ও জুলাই। প্রতিটি হুদা কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজের জন্য নিয়োজিত থাকত। দেশি বা নতুন ত্রিপুরিরা সমতল অঞ্চলে বাস করতো এবং তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অনেকে মনে করেন পুরান ত্রিপুরি ও বাঙালিদের সংমিশ্রণে এই শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। লস্কর সম্প্রদায় এই শ্রেণীভুক্ত। সংখ্যার দিক থেকে ত্রিপুরিদের পরেই রিয়াংদের স্থান। রিয়াং উপজাতি প্রধানত মেস্কা বা মেচকা এবং মরদই বা মলদই এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই সম্প্রদায় আবার সাতটি করে মোট চৌদ্দটি দফায় পরিণত হয়েছে। রিয়াং উপজাতির সর্বপ্রধান ব্যক্তি বা রাজা হলেন রায়। রায়ের উজিরকে বলা হয় কাচাক। রায়ের উত্তরাধিকারীকে বলা হয় চাপিয়া খান। সংখ্যার দিক থেকে জমাতিয়াদের স্থান তৃতীয়। পূর্বে জমাতিয়ারা রাজ্যের সৈন্য বিভাগে কাজ করত। জমাত বা জমায়েত শব্দ থেকে জমাতিয়া নামের উদ্ভব হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। জমাতিয়া সমাজে দুজন সমাজপতি বা সর্দার নিযুক্ত থাকতেন। এই দুজন সর্দার 'মুল্লুকের সর্দার' নামে অভিহিত। নোয়াতিয়ারা বিভিন্ন দফায় বিভক্ত হলেও ত্রিপুরা রাজ্যে তারা ছয়টি দফায় বিভক্ত। তাদের সর্দার 'রোয়াজা'

নামে পরিচিত। হালাম উপজাতি কুকিদেরই একটি শাখা। প্রাচীনকালে যে সব কুকি ত্রিপুরা রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করেছিল তারাই পরবর্তী কালে হালাম নামে পরিচিত হয়। এদের মিলাকুকিও বলা হয়। প্রথমদিকে হালামর বারোটি দফায় বিভক্ত হলেও পরে দফাব সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। হালামদের সর্দার বা সমাজপতিরা রিয়াংদের মতো রায়কাচাক, গালিম প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করে থাকে। কুকিরা সাধারণত ডার্লং ও লুসাই এই দুই নামে অভিহিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কুকি বা লুসাই এদের নিজস্ব দেওয়া নাম নয়। সমতল অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে তারা লুসাই বা কুকি নামে পরিচিত হয়েছে। কুকি ভাষায় এদের জাতীয় নাম 'রে-বম'। কুকিরাও বিভিন্ন দফায় বিভক্ত। ত্রিপুরেশ্বরের প্রদত্ত রাজা উপাধি লাভ করে ডার্লং ও লুসাই কুকিরা নিজ নিজ এলাকা শাসন করতেন। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে চাকমাদের স্থান চতুর্থ। এদের আদি বাসস্থান আরাকান। পরবর্তী কালে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় বসতি স্থাপন করেছে। এদের সর্দাররা 'দেওয়ান' নামে পরিচিত। মগদেরও আদি বাসস্থান আরাকান। মগদের সর্দাররা 'বোমাং চৌধুরি', 'তহশিলদার' প্রভৃতি নামে পরিচিত। খাসিয়া, ভিল, লেপচা, ভুটিয়া ও ছৈমলদের সংখ্যা ত্রিপুরায় খুবই নগণ্য।

বিভিন্ন উপজাতিদের নিজস্ব ভাষা আছে। ত্রিপুরি বা ককবরক ভাষা ত্রিপুরি, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া ও হালামদের কয়েকটি গোষ্ঠী, কলই, রাংখল ও রুপিনিদের মধ্যে প্রচলিত। ককবরক ভাষায় লিখিত কোনো হরফ ছিল না যদিও বর্তমানে বাংলা অথবা রোমান হরফে একটি লিখিত ভাষায় রূপান্তরিত করাব চেষ্টা চলছে। ককবরক ভাষা প্রাচীন বোড়ো ভাষার অন্তর্ভুক্ত। কুকি, হালাম, মগ ও চাকমাদেব নিজস্ব আলাদা ভাষা আছে। ককবরকম ভাষার মত এদেব ভাষাও আদিতে চীন তিব্বতি ভাষার তিব্বতি বর্মি শাখার অন্তর্ভুক্ত।

উপজাতিদের অধিকাংশই হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও নিজেদের লৌকিক দেবদেবীর পূজা ত্যাগ করে নি। সনাতন হিন্দুধর্মের ক্রিয়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে সহ-অবস্থান করছে উপজাতিদের প্রাচীন পূজা পদ্ধতি। চাকমা ও মগরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কুকি, লুসাই, গারো প্রভৃতি উপজাতির অনেকেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। উপজাতিদের বিভিন্ন পূজায় বাঁশকে মূর্তির প্রতীক হিসাবে ধরে পূজা করা হয়ে থাকে। উপজাতিরা যে সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে থাকে সেখানেও তাদের আদিম রীতির ছাপ সুস্পষ্ট। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে ডিম পূজা মহাদেবের মন্দিরে পশুবলি এ বিষয়ে লক্ষণীয়।

উপরিলিখিত উনিশটি উপজাতি ছাড়াও ত্রিপুরায় রয়েছে মণিপুরী ও বিশাল সংখ্যক বাঙালি। মণিপুরীদের অনেকেই ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে বৈবাহিক সুত্রে ত্রিপুরায় আগমন করেন। আবার কিছু সংখ্যক মণিপুরি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রহ্মদেশ কর্তৃক

মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য

মণিপুর আক্রান্ত হলে ত্রিপুরায় চলে আসে। ত্রিপুরি ভাষার মত মণিপুরি ভাষাও আদিতে চীন তিব্বতি ভাষার তিব্বতি-বর্মি শাখার অর্ন্তভুক্ত। মণিপুবিদের মৈতৈ নামে প্রাচীন লিপি আছে যদিও বাংলা হরফেই মণিপুরি লিখিত হয়ে থাকে।

রাজমালা থেকে জানা যায় ত্রিপুরায় মাণিক্য বংশীয় রাজারা শাসনকার্যে সাহায্যের জন্য কিছু সংখ্যক বাঙালিকে ত্রিপুরায় নিয়ে আসেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ত্রিপুরার রাজারা আকৃষ্ট হলে প্রচুর সংখ্যক বাঙালি ত্রিপুরায় এসে বসবাস করতে থাকে। উন্নত ধরনের কৃষিকার্যে অভিজ্ঞ বাঙালিদের ত্রিপুরায় স্থায়িভাবে বসবাসের উৎসাহিত করে ত্রিপুরা রাজারা রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল কম এবং জমি ছিল প্রচুর। তাই সে সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত বিশেষ কোনো সমস্যা দেখা দেয় নি। ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষেও কিছু সংখ্যক বাঙালি ত্রিপুরায় এসে বসতি স্থাপন করে। ভারত বিভাগের পর বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগত শরণার্থী আগমনের ফলে ত্রিপুরায় বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অবশ্য এদের অনেকেই ত্রিপুরার রাজাদের জমিদারি চাকলা রোশনাবাদের প্রজা ছিল।

উপজাতি সমাজ ও অর্থনীতি

ত্রিপুরার উপজাতি সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ এখানে পুরুষের প্রাধান্যই বেশি। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী এবং কিছুদিনের জন্য ভাবী জামাই সহ প্রতিটি পরিবার গঠিত। কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠিত হয়। প্রতিটি গোষ্ঠী যে গ্রামে বাস করে তাকে বলা হয় পাড়া বা বাড়ি। গোষ্ঠী বা গ্রামের সর্দারের নাম অনুসারে গ্রামের নামকরণ হয়ে থাকে। গ্রামগুলি সাধারণত পাহাড় বা উঁচু টিলায় অবস্থিত থাকে। অনেক সময় যে ছোটো ছোটো নদী বা ছড়ার পাশে গ্রামগুলি থাকে সেই ছড়ার নাম অনুসারেও গ্রামগুলির নামকরণ হয়ে থাকে। সম্মিলিতভাবে উৎসব অনুষ্ঠানের ফলে এদের গ্রামের সামাজিক বন্ধন খুবই দৃঢ়। জুম নামে বিশেষ ধরনের চাষ এরা সম্মিলিতভাবেই করে থাকে।

গ্রামের প্রধান বা সর্দার সেই গ্রামের জনসাধারণের উপর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। বস্তুত পক্ষে গ্রামের জনসাধারণ তাদের সর্দারের আদেশ ও পরামর্শ অনুসারে চালিত হয়। গ্রামের বিচার, আচার অনুষ্ঠান সবকিছুই সর্দারদের আদেশ ও পরামর্শ অনুসারে হয়ে থাকে। ত্রিপুরার রাজারা এইসব সর্দারদের মাধ্যমেই পার্বত্য এলাকাগুলি শাসন করতেন এবং রাজস্বও এদের সাহায্যে সংগ্রহ করতেন। এর পরিবর্তে সর্দারদের রাজারা নানা সুযোগ সুবিধা দিতেন।

ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে দুই ধরনের বিবাহ প্রচলিত আছে। বর ও কন্যার অনুরাগ

বা সম্মতিবশত উভয়ের মতামত অনুসারে বিবাহ এবং বরকন্যা দুই পক্ষের অভিভাবকদের মতামত অনুসারে বিবাহ। প্রথম বিবাহ পদ্ধতিটি ত্রিপুরিদের মধ্যে 'হিকনালানি' এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটি 'কাইজগনালি' নামে পরিচিত। এখানকার অধিকাংশ উপজাতিদের মধ্যে 'জামাই উঠা' নামে এক বিশেষ ধরনের রীতি প্রচলিত আছে। অভিভাবকদের ইচ্ছাজনিত বিবাহে মনোনীত পাত্রকে বিবাহের আগে উপজাতি বিশেষে এক, দুই বা তিন-চার বছর ভাবী শ্বশুরের ঘরে থাকতে হয় এবং জুমচাষে পরিবারে আর সকলের মতোই অংশ নিতে হয়। যদি এই সময়ের মধ্যে পাত্রের কার্যকলাপে ভাবী শ্বশুর সন্তুষ্ট হন এবং পাত্র ও কন্যার মধ্যে সদ্ভাব পরিলক্ষিত হয় তবেই তাদের বিবাহ হবে। বিবাহ না হলে পাত্রকে কাজের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় দেওয়া হয়।

অধিকাংশ উপজাতিই অগ্নিসংযোগে মৃতদেহ সৎকার করে। কুকিদের মধ্যে অবশ্য মৃতদেহ সমাধিস্থ করার প্রথা আছে। পূর্বে কুকি সর্দারদের মৃত্যু হলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনেক নিরীহ লোকের মস্তক কর্তন করা হত। সাধারণ কুকির মৃত্যু হলে সমাধিতে কিছু পশুপক্ষীর মস্তক উৎসর্গ করা হত। কুকি সর্দাররের মৃত্যু হলে সমাধিস্থ করার পূর্বে তার দেহ নব্বই দিন একটি বাক্সে রেখে দেওয়া হয়। এই নব্বই দিন অহর্নিশি বাক্সের চৌদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করে রাখা হয় এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রীত্যর্থে প্রতিদিন প্রচুর মদ্য ও অন্নাদি বাক্সের সামনে কিছুক্ষণ রেখে সকলে সেই প্রসাদ আহার করে। মঘদের মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ কামনায় মঘ পুরোহিত উপসানা করে থাকে। উপাসনা শেষে অন্নব্যঞ্জন ও একপাত্রে জল মৃতদেহের সামনে রেখে দেওয়া হয়। তারপর সেই মৃতদেহ শ্মশানে সৎকার করা হয়। মৃত্যুর সাতদিন পর আত্মার মঙ্গল কামনায় শ্রাদ্ধ করা হয়। শ্রাদ্ধে পুরোহিত উপাসনা করে থাকেন। চাকমাদের মৃতদেহ আত্মীয়দের জন্য একটি কাষ্ঠাধারে পাঁচসাত দিন রেখে দেওয়া হয়। তারপর সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। বিত্তশালীর মৃতদেহ রথে স্থাপন করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সৎকারের সুবিধার জন্যে মৃতদেহটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। ত্রিপুরিরা মৃতদেহ অগ্নিসংযোগে সৎকারের পর শ্মশান ক্ষেত্র পরিষ্কার করে সেখানে একটি তুলসী গাছ, প্রদীপ এবং কিছু অন্ন ও রান্না করা মাংস রেখে দেয়। এই ভাবে ক্রমাগত এক সপ্তাহকাল অন্নব্যঞ্জন দেওয়া হয়। সাতদিন পরে শ্মশান থেকে অস্থি ও ভস্ম সংগ্রহ করা হয় এবং পরে সুবিধামতো সময়ে সেই অস্থি নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধকালে ত্রিপুরিরা সাধ্যানুসারে গোদান, অন্নদান ইত্যাদি করে থাকে। জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া প্রভৃতি উপজাতির মৃতদেহ সৎকার প্রণালী মোটামুটিভাবে ত্রিপুরিদের অনুরূপ।

ত্রিপুরার উপজাতিদের পোষাক পরিচ্ছদ ও অলংকার পরিধানে বিলাসিতা পরিলক্ষিত না হলেও সৌন্দর্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। উপজাতীয় মেয়েরা সাধারণত দেহাবরণ হিসাবে

শাড়ির বদলে রিয়া ও পাছড়া পরিধান করে। তাঁতের দ্বারা তৈরি এগুলি তাঁরা নিজ হাতে প্রস্তুত করে। ধাতব অলংকারাদির চাইতে মেয়েরা ফুল ও সুন্দর পত্রপল্লবাদি দ্বারা নির্মিত অলংকার ব্যবহার করা পছন্দ করে। ত্রিপুরার আদিবাসী বা উপজাতিদের প্রধান জীবিকা হল কৃষি। শিকার ও পশুপালন করেও এরা জীবিকা নির্বাহ করে। সমতল অঞ্চলে হলকর্ষণের দ্বারা উন্নত চাষের প্রচলন থাকলেও পার্বত্য অঞ্চলে অধিকাংশ জুম নামে এক বিশেষ পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করে। জুমচাষিদের জুমিয়াও বলা হয়। জুম পদ্ধতি অনুসারে প্রতি গ্রাম বা পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ একত্র হয়ে জুম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। পৌষ মাসের মধ্যে ক্ষেতে জন্য একটি বন স্থান নির্বাচিত করে ঐ স্থানের বন জঙ্গল কেটে ফেলা হয়। প্রায় একমাস সূর্যের উত্তাপে এইসব কাটা জঙ্গল শুকিয়ে যায়। চৈত্র মাসে এই শুকনো জঙ্গল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বৈশাখ মাসে 'টাকুয়াল' নামে দা দিয়ে ছোটো ছোটো গর্ত করে তাতে কার্পাস, ধান, ফুটি, কাঁকুড়, তরমুজ, মরিচ, ভুট্টা ও নানা ধরনের তরকারির বীজ বপন করে। এক এক সময়ে এক এক ফসল হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ভুট্টা, ফুটি, কাঁকুড়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধান, কার্তিক মাসে কার্পাস ও তিল তোলা হয়। দুতিন বছর অন্তর সেই ক্ষেত পরিত্যক্ত হয় এবং আবার নতুন স্থানে নতুন ভাবে জুম ক্ষেত প্রস্তুত হয়। আদিবাসীরা তাদের জুম ক্ষেতের কার্পাস ও তিল এবং অবণ্যজাত কাঠ, বেত, খড় ও জ্বালানি কাঠ বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করে। বীজ বপনের পর জুম চাষের জায়গায় কাছাকাছি বাঁশ দিয়ে উঁচু করে একটা ঘব তৈবি করা হয় ফসল পাহারা দেবাব জন্য। এই ঘরকে বলা হয় গাইরং। জমি থেকে উঁচুতে তাদেব বাঁশের তৈরি বাড়িগুলিকে বলা হয় টংঘর। অবশ্য অবস্থাপন্ন উপজাতিব লোকেরা যাঁরা শহবে থাকেন তারা পাকা ইটের বাড়িতে বাস করেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে আসামের দূতদ্বয় উদয়পুরে অভিজাত ত্রিপুরিদের এ ধরনের পাকা ইটের বাড়ির উল্লেখ কবেছেন। স্থায়ী কৃষিক্ষেত্র না থাকায় এইসব জুমচাষকারী প্রজাদের কাছ থেকে কৃষি করের পরিবর্তে ত্রিপুরার রাজারা প্রতি পরিবার পিছু ঘরচুক্তি কর বা গৃহকর আদায় করতেন।

একদা সামন্ততান্ত্রিক ত্রিপুরায় উন্নত ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় কৃষি নির্ভরশীল গ্রামগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। গ্রামের স্বয়ং সম্পূর্ণতাব জন্যই পণ্যবিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থের মাধ্যমে বিনিময় প্রায় ছিল না বলা চলে। সরল ও অনাড়ম্বরভাবে দিন যাপন করত বলে খাদ্য ছাড়া অন্য বিশেষ কোনো চাহিদা ছিল না। তাঁতের সাহায্যে নিজেদের পোষাক নিজেরাই তৈরি করত। খাদ্যের আনুষঙ্গিক যেটুকু চাহিদা ছিল তা বছরের কোনো নির্দিষ্ট দিনে সমতল অঞ্চলে মেলা বা হাটে গিয়ে উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্যের বিনিময়ে ক্রয় করত। তিল, কার্পাস, ফল ও বনজ সম্পদ বিক্রি করে নিজেদের অন্যান্য চাহিদা মেটাত। রাজাকে কায়িক শ্রমদান বা বনজ সম্পদ রাজস্ব হিসাবে প্রদান করে তারা

নিশ্চিন্ত থাকত। কিন্তু এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমশ পরিবর্তন হতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং জুম চাষের ফলে কৃষিযোগ্য জমি সীমিত হতে থাকায় খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা ক্রমশ ব্যাহত হতে থাকে। সমতল অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ এবং যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে আদিবাসীদের খাদ্য ছাড়াও আনুষঙ্গিক চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। মুদ্রার ভিত্তিতে তারা ধীরে ধীরে নতুন অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। এদিকে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জটিলতা ও ব্যয়বৃদ্ধির ফলে কায়িক শ্রম ছাড়াও মুদ্রার ভিত্তিতে নানাধরনের কর বৃদ্ধি করা হল। একদিকে আয়ের স্বল্পতা অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজকর্মচারীদের নানা ধরনের চাহিদা মেটাবার ফলে এদের হাতে উদ্বৃত্ত কোনো অর্থ বা সম্পদ থাকত না। খরা বা বন্যা হলে এদের দুর্গতির অন্ত থাকত না। এই অবস্থায় মহাজনরা দাদন প্রথা ও উচ্চ সুদে প্রয়োজনের সময় আগাম শস্য ঋণ দিয়ে তাদের সহজেই ঋণ জালে আবদ্ধ করে ফেলে। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিত বিক্ষোভ আর মাঝে মাঝে বিক্ষোভ রূপান্তরিত হত বিদ্রোহে।

পাহাড় অঞ্চলের উপজাতিদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে হান্টার মন্তব্য করেছিলেন যে সাধারণত পাহাড় অঞ্চলের লোকেরা খুবই দরিদ্র ও অদূরদর্শী ছিল। ভালো সময়ে তারা শূকরের মাংস ভক্ষণ ও প্রচুর মদ্যপান করত আর দুর্দিনে প্রায় অনাহারে দিন কাটাত। তাদের জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করাও কঠিন। তারা তাদের নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপন্ন করত এবং নিজেদের জন্য শূকর পালন করত। তারা শস্য বাজারে নিয়ে বিক্রি করে সেই অর্থদ্বারা কর প্রদান করত।

ত্রিপুরার ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে হান্টার ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন ত্রিপুরায় বড়ো কোনো বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল না তবে একুশটি হাটবাজার ছিল। এগুলির মধ্যে পাঁচটি ছিল পাহাড় এলাকায়। পাহাড়ের অধিবাসীরা সেখানে আসত দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য। উদয়পুরেও এধরনের একটি বাজার ছিল। পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হত এবং সেগুলি নদীপথে উদয়পুর নিয়ে আসা হত। কার্পাস, কাঠ, ও বাঁশের বিনিময়ে পার্বত্য উপজাতির তামাক, লবণ ও শুকনো মাছ সংগ্রহ করত। রাজ্যের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল কার্পাস, কাঠ, তিল, বাঁশ, বেত, ঘাস ও জ্বালানি কাঠ। রত্ন কন্দলি ও অর্জুন দাস বৈরাগী কটকী যাঁরা আসামের রাজদূত হিসাবে ১৭০৯ থেকে ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনবার ত্রিপুরায় এসেছিলেন তাঁরাও উদয়পুরে গোমতী নদীর তীরে বাজার লক্ষ করেছেন। রাজঘাট নামে সেখানের একটি বাজারে তামা ও ব্রোঞ্জ নির্মিত গৃহস্থালির দ্রব্যাদি ছাড়াও কার্পাস, চিনি, লবণ, দুধ এবং ঘি বিক্রয়ের জনা আনা হত। তিনি ত্রিপুরার কোনো কোনো এলাকায় প্রচুর ধান, গুড়, তুলা উৎপন্ন হত বলে বর্ণনা করেছেন। আম, নারকেল ও কাঁঠালও প্রচুর হত বলে তারা বর্ণনা করেছেন।

উপজাতিদের দেবদেবী ও ধর্মীয় উৎসবাদি

ত্রিপুরার উপজাতিদের আদিম পার্বত্যরীতিতে দেবদেবীর পূজা পার্বণের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। বাজারা হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও প্রাক্‌হিন্দুধর্মীয় উপজাতীয় ধর্মানুষ্ঠানেও রাজকীয় ধর্মের অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। রাজারা শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব যাই হোন না কেন চতুর্দশ দেবতা তাঁদের কুলদেবতা এবং চতুর্দশ দেবতার প্রধান পুরোহিত চন্তাই রাজার কুলপুরোহিত। উপজাতীয় দেবতা সাধারণত বাঁশ দিয়ে নির্মিত হয়।

খাচ্চি পূজা : চতুর্দশ দেবতাব পূজা খাচ্চি পূজা নামে পরিচিত। মূল শব্দ ক্ষ্যাচ্চি থেকে খাচ্চি শব্দটি এসেছে। এই পূজা ত্রিপুরা রাজ্যের জাতীয় পূজা। আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি থেকে খাচ্চি পুজা শুরু হয়। সাতদিন ধবে এই পূজা অনুষ্ঠন চলে। এই পুজার প্রধান পুরোহিতকে বলা হয চন্তাই এবং সহকারী পূজকবৃন্দকে বলা হয় দেওরাই। চন্তাইরা উপজাতীয শ্রেণীব মানুষ। কথিত আছে রাজা ত্রিলোচন চতুর্দশ দেবতার পূজা অনুষ্ঠান প্রচলন করেন। খাচ্চি পূজাব অনুষ্ঠানে বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। এই পূজাতে বৈদিক, তান্ত্রিক এবং আবও নানাধবনের পূজার্চনা রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে মনে কবা হয। চতুর্দশ দেবতাব বিগ্রহেব বিশেষত্ব হল এই যে এখানে কেবল চৌদ্দজন দেবদেবীর চৌদ্দটি প্রতীক মুণ্ড আছে। এই দেবতাদেব মধ্যে হর বা মহাদেব হলেন প্রথম ও প্রদান। হর, উমা, হরি, লক্ষ্মী, সবস্বতী, কার্তিকেয, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমাদ্রি চতুর্দশ দেবতার নাম। ত্রিপুবি বা ককববক ভাষাতেও চতুর্দশ দেবতার চৌদ্দটি ভিন্ন নাম আছে। শিব বা হরব প্রতীক মুণ্ডটি রজত মণ্ডিত এবং অন্যান্য মুণ্ডগুলি সুবর্ণমণ্ডিত। হর, উমা ও হবি এই তিন দেবদেবীর প্রতীক মুণ্ডগুলি নিত্য পূজিত হয এবং অন্যান্য প্রতীক মুণ্ডগুলি একমাত্র আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে খাচ্চি পূজার সময় হরব প্রতীক মুণ্ড সহ একসঙ্গে সারিবদ্ধভাবে পূজিত হন। সপ্তাহকালব্যাপী খাচ্চি পূজায প্রতিদিন প্রাতে প্রধান পুবোহিত চন্তাই কর্তৃক চন্দ্রসূর্য প্রণাম এবং মন্ত্রপাঠ ও ছাগ শিশু বলি দান পূর্বক পূজা শুরু হয়। সারাদিন পূজার্চনা চলে। খাচ্চি পূজায় মোষ, পাঁঠা, মোরগ, কবুতর, হাঁস প্রভৃতি প্রাণী বলি দেওয়ার রীতি আছে। মুণ্ডগুলিব উপরি ভাগে যুগল শৃঙ্গ আর্য ও অনার্য সভ্যতাব মিশ্রণ নির্দেশ করে। জাতি উপজাতি সকলেই এই পূজায় শ্রদ্ধার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে পুরাতন আগরতলায় চতুর্দশ দেবতার মন্দিরটি অবস্থিত ছিল।

কের পূজা : খাচ্চি পূজার চৌদ্দদিন পব কৃষ্ণপক্ষেব প্রথম শনি বা মঙ্গলবার কের পূজার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। খাচ্চি পূজার প্রধান পুরোহিত চন্তাই কের পূজারও প্রধান পুরোহিত। কের পূজাতে দেবতার কোনো বিগ্রহ নেই। বাঁশ দিয়ে দেবতার প্রতীক রচনা করা হয়। কের শব্দের অর্থ গণ্ডি বা বেষ্টনী। যেখানে কের পূজা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে

নির্দিষ্ট গণ্ডি চিহ্নিত করা হয়। উৎসব অনুষ্ঠান চলা কালে এই গণ্ডির ভিতরে আগমন নির্গমন, জন্মমৃত্যু নিষিদ্ধ। ত্রিপুরাবাসীকে দৈবদুর্বিপাক কিম্বা অকল্যাণ থেকে রক্ষা করার জন্য এই পূজা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অবশ্য কের পূজা রাজধানীর মতো পার্বত্য অঞ্চলেও অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে দুর্গাপূজার পর শরৎকালে বা হেমন্তকালে (কার্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসে) যে কোনো শনিবার বা মঙ্গলবারে এই পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গড়িয়া উৎসব : ত্রিপুরার উপজাতিদের আর একটি ধর্মীয় উৎসব হল গড়িয়া পূজা। এই উৎসবের মাধ্যমে আগামী সারা বৎসরের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। গড়িয়া পূজার পরেই জুমিয়াদের শুরু হয়ে যায় জুমে শস্যারোপণ। গড়িয়া দেবতা প্রসন্ন হলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে বলে ধারণা করা হয়। গড়িয়া দেবতা বাঁশ দ্বারা নির্মিত হয় এবং অনুষ্ঠান চলে সাতদিন ধরে। গড়িয়া দেবতা নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। বিশেষ বিশেষ উপজাতি ক্ষেত্রে এই পূজার সময়কাল ও পদ্ধতিতে কিছুটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। জমাতিয়ারা একজন গড়িয়া দেবতার পরিবর্তে দুজন গড়িয়া দেবতার পূজা করে। জমাতিয়া ও নোয়াতিয়ারা চৈত্র মাসের শেষ দিন থেকে বৈশাখ মাসের সাত তারিখ পর্যন্ত গড়িয়া উৎসব পালন করে। ত্রিপুরি ও অন্যান্য উপজাতিরা বৈশাখের সাত তারিখ থেকে চার-পাঁচদিন একনাগাড়ে গড়িয়া উৎসব পালন করে।

বিজু উৎসব : চাকমারা চৈত্র সংক্রান্তির মহাবিষুব পর্বে বিজু উৎসব পালন করে। বর্ষটা সুখে শান্তিতে অতিবাহিত হোক এই প্রার্থনা জানায় তথাগতের কাছে।

ত্রিপুরার উপজাতিরা অন্যান্য যে সব দেবদেবীর পূজা করে থাকেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল :

মতই কতর : ইনি ত্রিপুরিদের অন্যতম উপাস্য দেবতা। মতই অর্থাৎ দেবতা এবং কতর বা মহা অর্থাৎ মহাদেব।

লাম্প্রা : লাম্প্রা মানে হল শুচি দেবতা। কোনো পূজা আরম্ভকালে সর্বপ্রথম লাম্প্রা দেবতার পূজা দেওয়া হয়।

তুইমা : তুইমা বা গঙ্গা পূজা। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। তবে কারো কারো বাড়িতে অসুখবিসুখ হলে নিকটবর্তী নদীতে ওঝাই নামক পুরোহিত ডেকে এনে এই পুজার ব্যবস্থা করা হয়।

মাইলুমা : মাইলুমা হলেন ধান্যের দেবতা। তাঁর কৃপায় ধান্য উৎপন্ন হয়। তিনি বিরক্ত হলে ধান্য জন্মাবে না।

খলুমা : ইনি হলেন কার্পাসের দেবতা। তাঁর কৃপাতে কার্পাস জন্মে।

বুড়াছা : ইনি হলেন বনের দেবতা। রোগশোক থেকে শান্তি লাভের জন্য এই পূজা দেওয়া হয়।

লকছুমতাই : নবান্ন উৎসবের দিন লকছুমতাই বা গৃহকোণ দেবীর পূজা পার্বত্য অঞ্চলে প্রতি ঘরেই হয়ে থাকে। এই উৎসবে মামিতা নামে আর একটি পূজাও অনুষ্ঠিত হয়।

উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরীর পূজা, মহাদেববাড়িও অন্যান্য মন্দিরের পূজা জাতি উপজাতি সকলেই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে করে থাকে। দুর্গোৎসব, পৌযসংক্রান্তিতে ডম্বরু তীর্থে পুণ্যস্নান, গঙ্গাসাগর স্নান, ব্রহ্মকুণ্ডের মেলা, চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমীতে উনকোটির মেলা প্রভৃতি জাতি উপজাতি নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করে থাকে। বস্তুত এই সব ধর্মীয় উৎসবগুলি জাতি উপজাতির মধ্যে মহামিলনের সেতু নির্মাণে সাহায্য করেছে।

নরবলি প্রথা

প্রাচীনকালে ত্রিপুরায় নরবলি প্রথার প্রচলন ছিল। বিশেষত ত্রিপুরার রাজারা তান্ত্রিক মতে শৈব ও শাক্ত মতের হিন্দুধর্মের অনুরাগী হলে ত্রিপুরায় এই প্রথা প্রসার লাভ করে। ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিব ও চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে প্রচুর সংখ্যক নরবলি দেওয়া হত। এ সম্পর্কে রেভারেন্ড জেমস লং বলেছেন ''প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুধর্মের পীঠস্থান ত্রিপুরা রাজ্যে যে সংখ্যক নরবলি হয়েছে, সেরূপ ভারতের অন্য কোনোখানে এমনকী কামাখ্যাদেবী ও কলিকাতার কালীঘাটের কালীর সম্মুখেও ততদূর নরবলি হয় নি।'' এক সম্প্রদায়ের লোক বলির জন্য মানুষী সংগ্রহ করত। এদের বলা হত মইছেলে বা মুইছিলি। এরা নানাভাবে মানুষকে ভুলিয়ে বলির জন্য নিয়ে যেত। বর্তমানে মানুষের পরিবর্তে ময়দা নির্মিত পুতুল তৈরি করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবে বলি দেওয়া হয। রাজমালা থেকে জানা যায় মহারাজা ধন্যমাণিক্য এই প্রথা বন্ধ করেন। শুধু নিয়মরক্ষার জন্য কয়েকটি দেবস্থানে অতি অল্প সংখ্যক বলির ব্যবস্থা করা হয়। বন্দি শত্রুদেরও চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে বলি দেওয়া হত। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য সম্ভবত এই প্রথা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন। তাছাড়া পরবর্তী বৈষ্ণবভাবাপন্ন রাজাদের আমলেও এই প্রথা রাজকীয় সমর্থন হারায়।

নবম অধ্যায়

ত্রিপুরার প্রত্নতত্ত্ব

ত্রিপুরার মুদ্রা

ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ত্রিপুরার মুদ্রা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ত্রিপুরার ইতিহাসের অন্যতম উপাদান রাজমালার অনেক তথ্যই মুদ্রার সাহায্যে যাচাই করা সম্ভব। তাছাড়া ত্রিপুরার রাজাদের কাল নির্ণয়ের একমাত্র সম্বল হল মুদ্রা।

ত্রিপুরার রাজারা রাজ্যাভিষেক, তীর্থযাত্রা এবং যুদ্ধ জয় এই তিন ধরনের ঘটনাকে উপলক্ষ করে মুদ্রা প্রচার করেন। অধিকাংশ মুদ্রাই ছিল স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত। এখন পর্যন্ত তাম্র নির্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নি। এই মুদ্রাগুলিতে শকাব্দ ব্যবহার কবা হত। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল থেকে ত্রিপুরাব্দের ব্যবহার করা হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মুদ্রাগুলিতে রানির নামসহ রাজার নাম দেওয়া থাকত। মুদ্রার মুখ্যদিকে শুধু লেখন থাকে এবং এই লেখনের প্রথমাংশে বাজার বিরুদ এবং দ্বিতীয়াংশে রাজা ও রানিব অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে রাজার নাম দেখা যায়। মুদ্রার গৌণদিকে শকাব্দের তারিখ সিংহ, ত্রিশূল, রাজচিহ্ন এবং শিব ও দুর্গার প্রতীকচিহ্ন অঙ্কিত থাকত। পাঁচ ধরনেব মুদ্রা পাওয়া যায় — পূর্ণ, অর্ধ, এক চতুর্থ, এক অষ্টম ও এক ষোড়শ মুদ্রাগুলি সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলা অক্ষরে লিখিত।

ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে রত্নমাণিক্যই প্রথম মুদ্রা নির্মাণ করেন। সমসাময়িক বাংলার মুসলিম সুলতানদের মুদ্রার অনুকরণে ২২টি মুদ্রা সংগ্রহ করেছেন। এগুলির মধ্যে দুটি তারিখবিহীন মুদ্রা। বাকিগুলি শকাব্দ লিখিত রৌপ্যমুদ্রা। তিনি রত্নমাণিক্যের মুদ্রার সময়কাল নির্ণয় করেছেন ১৩৬৪ থেকে ১৩৬৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। রত্নমাণিক্য প্রাথমিক একপ্রকার তারিখ ও চিত্রণহীন মুদ্রায় স্বীয় বিরুদ হিসাবে 'শ্রী নারায়ণ চয়নকার' এই কথাটি লেখেন। পরবর্তী তারিখহীন মুদ্রাগুলির একদিকে রত্নমাণিক্য নিজের নাম ও অপরদিকে দুর্গার বাহন সিংহের মূর্তি ও 'শ্রীদুর্গা' এই লেখন অঙ্কিত করেন। রত্নমাণিক্যের ১৩৮৯ শকাব্দের মুদ্রা সিংহমূর্তিবিহীন, কিন্তু বিচিত্র লেখনযুক্ত। এর মুখ্য ও গৌণদিকে যথাক্রমে 'পার্বতীপরমেশ্বর চরণ পায়ৌ' এবং 'শ্রী লক্ষ্মী মহাদেবী শ্রীশ্রী রত্নমাণিক্যৌ' লেখা আছে।

রত্নমাণিক্যের পরবর্তী প্রতাপমাণিক্যের ১৪১১ শকাব্দের (১৪৮৯ খ্রিঃ) মুদ্রায় রত্নমাণিক্যের মতো সিংহের মূর্তির পরিবর্তে গরুড়মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। ১৪১১ এবং ১৪১২ শকাব্দের মুদ্রাগুলি প্রমাণ করে যে ধন্যমাণিক্যের অব্যবহিত পূর্বে প্রতাপমাণিক্য রাজত্ব করেছেন।

পরবর্তী রাজা ধনমাণিক্যেরও কতগুলি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ মুদ্রাগুলি রত্নমাণিক্যের মুদ্রার অনুরূপ সিংহ মূর্তি সমন্বিত। তবে ধন্যমাণিক্যের কোনো কোনো মুদ্রায় বিরূদ হিসাবে 'ত্রিপুরেন্দ্র' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো কোনো মুদ্রায় 'বিজয়ীন্দ্র' কথাটি লেখা আছে। তাঁর ১৪৩৬ শকাব্দের মুদ্রাগুলি চাটিগ্রাম বিজয়ের স্মারক মুদ্রা হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। এর মুখ্য দিকে লেখা আছে "চাটিগ্রাম বিজয়ী শ্রীধন্যমাণিক্য শ্রী কমলাদেবৌ।"

পরবর্তী রাজা দেবমাণিক্যের একটি মুদ্রায় তাকে (১৪৫০ শকাব্দ) 'সুবর্ণগ্রাম বিজয়ী' বলা হয়েছে। বিজয়মাণিক্যের মুদ্রাগুলি নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। (১৪৫৫—১৪৮৫ শকাব্দ)। এই মুদ্রাগুলিতে চারটি বিচিত্র বিরূদ ও চারজন মহিষীর নাম পাওয়া যায়। চারপ্রকার মুদ্রায় তাঁকে কুমুদীদর্শী, প্রতিসিন্ধুসীম, ত্রিপুরমহেশ ও বিশ্বেশ্বর বলা হয়েছে। এগুলির লেখনে যথাক্রমে বিজয়া লক্ষ্মী, সরস্বতী ও বাক্‌দেবীর নাম আছে। বিজয়মাণিক্যের তিনপ্রকার স্মারক মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথমটি সুবর্ণগ্রাম জয়ের পর ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ ধ্বজঘাট স্নানের, দ্বিতীয়টি ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী লক্ষ্যাস্নানের এবং তৃতীয়টি পদ্মাবতী স্নানের স্মরণে মুদ্রিত হয়। বিজয়মাণিক্যের মুদ্রায় মূর্তির বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। তাঁর লক্ষ্যাস্নানের স্মারক মুদ্রায় অর্ধনারীশ্বরমূর্তি এবং পদ্মাবতী স্নানের স্মারক মুদ্রায় শিবলিঙ্গ ও সিংহাসনে স্থাপিত গরুড়বাহিত বিষ্ণুর মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। কোনো কোনো মুদ্রায় ষাঁড়ের উপর উপবিষ্ট চতুর্ভুজ শিব একাংশে ও অপরাংশে সিংহের উপর উপবিষ্ট দশভুজা দুর্গার মূর্তি অঙ্কিত আছে।

যশোধরমাণিক্যের মুদ্রায় গোপী সহ বংশীবাদক কৃষ্ণের মূর্তি একদিকে ও অপরদিকে সিংহ ও ত্রিশূল অঙ্কিত আছে। মুদ্রার দুইদিকেই রাজার নাম উল্লেখ আছে।

কল্যাণমাণিক্যের শকাব্দযুক্ত অর্ধ ও এক-চতুর্থাংশ মুদ্রা পাওয়া গেছে। কল্যাণমাণিক্যের মুদ্রায় শিবলিঙ্গ খোদিত ছিল।

গোবিন্দমাণিক্যের শিবলিঙ্গযুক্ত পূর্ণ মুদ্রা, এক-চতুর্থাংশ মুদ্রা পাওয়া যায়। 'রাধাকৃষ্ণপদে শ্রীযুক্ত মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য, শ্রীশ্রী মহারানি গুণবতী মহাদেব্যৌ।' বিরূদযুক্ত স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গেছে। তারিখবিহীন এক অষ্টমাংশ মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য আরো ক্ষুদ্র মুদ্রা প্রচার করেন। যেমন এক ষোড়শাংশ এবং দ্বি-ত্রিংশ। সন তারিখ ছাড়া এইসব মুদ্রাগুলিতে শুধু রাজার নাম পাওয়া যায়।

ত্রিপুরার লিপি

ত্রিপুরায় প্রচুর সংখ্যায় সংস্কৃত, ভাষায় লেখা বাংলা হরফের লেখ বা লিপি পাওয়া গেছে। এই লিপিগুলি প্রস্তর ফলকে খোদিত অথবা তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ। প্রাপ্ত লিপিগুলি বিশ্লেষণ করে বিষয়বস্তুকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়—উৎসর্গপত্র ও দানপত্র। উৎসর্গীকৃত লিপিগুলি মন্দির নির্মাণ ও মূর্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মন্দির গাত্রে অথবা পাথরের ফলকে খোদিত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের কথা তাম্রপত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিছু কিছু তাম্রলিপিতে মুসলমানদের ভূমিদানের বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়।

মধ্য যুগে প্রাপ্ত প্রথম তাম্রলিপিটি মহারাজ প্রথম ধর্মমাণিক্যের আমলের ১৩৮০ শকাব্দ (১৪৫৮ খ্রিঃ)। ধর্মসাগর নামে একটি নতুন দিঘি খনন উপলক্ষে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের কথা এই তাম্রলিপিতে উদ্ধৃত হয়েছে। রাজমালায় এই লিপিটির কথা উল্লেখ থাকলেও বর্তমানে এই লিপিটি পাওয়া যায় না।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রাচীন তাম্রলিপিটি ১৪১০ শকাব্দের (১৪৮৮ খ্রিঃ) মহাবাজা বিজয়মাণিক্যেব শ্বশুর ও রাজ্যেব সেনাপ্রধান দৈত্যনাবায়ণেব পত্নী পুণ্যবতীব সমতল ত্রিপুরায় একজন ব্রাহ্মণকে কিছু গ্রাম দানেব বিষয এই লেখনে উল্লেখ আছে। অপেক্ষাকৃত পাতলা তাম্রফলকেব একদিকে লেখনটি লিপিবদ্ধ আছে এবং এতে কোনো রাজকীয় সিলমোহর নেই। অনুমান করা হয প্রথম বিজযমাণিক্য মুকুটমাণিক্যের পুর্ববর্তী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রাজমালায এঁকেই প্রতাপমাণিক্য বলে অভিহিত করা হযেছে।

উদয়পুরের নিকট মহারানিতে ১৪৭০ শকাব্দে (১৫৪৮ খ্রিঃ) বিজয়মাণিক্যের স্থাপিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। সেখানে ধনুকাকৃতি বিশাল প্রস্তর খণ্ডে তিন প্রস্থ একই তারিখ সম্বলিত প্রস্তরলিপি পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনজন বিভিন্ন রাজপণ্ডিত ত্রিপুরারাজ দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের প্রশস্তি গাথা এতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই প্রস্তরলেখ থেকে জানা যায় লক্ষ্মীপুরে নির্মিত এই মন্দিরটি মহারাজা ও মহারানি ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালেরও কতগুলি উৎসর্গলিপি পাওয়া গেছে। এই লিপিগুলির একটি পাওয়া গেছে উদয়পুরের গোপীনাথ মন্দিরের তোবণ দ্বারে। এতে উল্লেখ আছে যে কল্যাণমাণিক্য গোপীনাথের এই মন্দিরটি ১৫৭২ শকাব্দে (১৬৫৮ খ্রিঃ) নির্মাণ করেন। মহাদেব-মন্দির গাত্রে খোদিত অনুরূপ একটি উৎসর্গ লিপিতে দেখা যায় যে এই মন্দিরটি ধন্যমাণিক্যের আমলে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু ১৫৭৩ শকাব্দে (১৬৫১ খ্রিঃ) কল্যাণমাণিক্য এই মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন।

জগন্নাথ দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে অবস্থিত জগন্নাথ মন্দির নামে পরিচিত মন্দির গাত্রে খোদিত গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ দেবের একটি উৎসর্গ লিপি থেকে জানা যায় যে ১৫৮৩ শকাব্দে (১৬৬১ খ্রিঃ) গোবিন্দমাণিক্যের সহযোগিতায় জগন্নাথদেব এই মন্দিরটি বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন। মহাদেব বাড়ির অদূরে পূর্ব-রাধাকিশোরপুরের এক মন্দির গাত্রে গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী রানি গুণবতীর একটি উৎসর্গলিপির সন্ধান মেলে। এই লিপিতে উল্লেখ আছে যে ১৫৫০ শকাব্দের (১৬৬৮ খ্রিঃ) বৈশাখ মাসে রানি গুণবতী বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

গোপীনাথ মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত অপর একটি মন্দিরগাত্রে একটি লিপি খোদিত আছে যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৫৯৫ শকাব্দের (১৬৭৩ খ্রিঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসে গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্যের রাজত্বকালে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই লিপিতে মন্দিরটি কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার পরিবর্তে পারিজাত হরণের ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে এটি হয় কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু অথবা লক্ষ্মীনারায়ণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত বৈষ্ণব মন্দির। উদয়পুরের পুরাতন রাজপ্রাসাদের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি বিষ্ণু মন্দির গাত্রে ১৫৯৯ শকাব্দের (১৬৭৭ খ্রিঃ) রামমাণিক্যের একটি উৎসর্গলিপিও দেখা যায়।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরগাত্রে পাঁচটি খোদিত লিপি আছে। পূর্বদিকের খোদিত লিপি দুটিতে বলা হয়েছে যে এই মন্দির ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে ধন্যমাণিক্য নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরটি বজ্রাঘাতে একসময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারপরে ১৬০৩ শকাব্দে (১৬৮১ খ্রিঃ) কল্যাণমাণিক্যের পৌত্র ও গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্য মন্দিরটি সংস্কার করেন। উত্তরদিকে খোদিত লিপিটি বাংলা ভাষায় লিখিত। এই লিপিতে বলিভীম নারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত রত্নমাণিক্যের মাতুল বলিভীম নারায়ণ মন্দিরটি সংস্কার কার্যের তদারকি করেছিলেন বলে তাঁর নামও খোদিত লিপিতে উল্লেখ আছে। দক্ষিণ দিকে খোদিত দুটি লিপির মধ্যে একটি বাংলা ভাষায় লিখিত। এই লিপিটিতে ধন্যমাণিক্য, রনাগণ, রামমাণিক্য ধর্মরাজ নামগুলির এবং ১৬০৩ শকাব্দের (১৬৮১ খ্রিঃ) উল্লেখ দেখা যায়। অপর লিপিটিতে বলা আছে যে ১২৬৭ ত্রিপুরাব্দের (১৮৫৭ খ্রিঃ) মাঘ মাসে রানি সুমিত্রা দেবী মন্দিরটির সংস্কার সাধন করেন।

গোপীনাথ মন্দিরের পূর্বদিকে দ্যুতিয়ার বাড়ি নামে পরিচিত দুটি মন্দির আছে। দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের মাতুল বলিভীম নারায়ণের দ্বিতীয় কন্যা দ্যুতিয়াদেবী এই মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। এ দুটির মধ্যে মন্দিরগাত্রে খোদিত একটি লিপি এতই অস্পষ্ট যে কোনো কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে ডঃ ডি সি সরকারের মতে এই লিপিটির সময়কাল ছিল ১৬২১ শকাব্দ (১৬৯৯ খ্রিঃ)।

কল্যাণমাণিক্য এবং গোবিন্দমাণিক্যের বেশ কতগুলি তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। এগুলির অধিকাংশ দু-ধরনের ভূমিদান সংক্রান্ত সনদ—ব্রহ্মোত্তর সনদ ও আয়মা সনদ। ব্রহ্মোত্তর সনদগুলি ব্রাহ্মণদের এবং আয়মা সনদগুলি মুসলমানদের প্রদান করা হয়েছিল। কল্যাণমাণিক্যের কিছু সংখ্যক উভয় প্রকার সনদ গোবিন্দমাণিক্যের আমলে নবীকরণ করা হয়। এঁদের তাম্রলিপি বাংলা হরফে এবং বাংলা ভাষায় লিখিত। এইসব সনদগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১০৭০ সনে (১৬৬০ খ্রিঃ) প্রদত্ত গোবিন্দমাণিক্যের একটি ব্রহ্মোত্তর সনদ যেখানে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের পুরোহিতকে বিশ দ্রোণ নিষ্কর জমি দান করা হল।

ধাতু নির্মিত একটি সিংহাসনে দুটি শ্লোক খোদাই করা আছে। বাংলা হরফে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই শ্লোকদুটিতে বলা হয়েছে যে ১৫৭১ বর্ষে (১৬৪৯ খ্রিঃ) হিমালয়-কন্যা দেবী গিরিজার উদ্দেশ্যে গোবিন্দমাণিক্য এই সিংহাসনটি উৎসর্গ করেছিলেন। এই সিংহাসনটি বর্তমানে চতুর্দশ দেবতার পূজায় ব্যবহৃত হয়।

ঊনকোটির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

উত্তর ত্রিপুরা জেলার কৈলাসহর মহকুমায় অবস্থিত ঊনকোটি তীর্থের পাহাড়ে রয়েছে ভাস্কর্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন সমূহ। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে অন্ততপক্ষে অষ্টম নবম শতক থেকে ঊনকোটি শিব উপাসনার তীর্থ ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত ছিল। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের মতে পালযুগে ঊনকোটি একটি সৌধ তীর্থক্ষেত্র ছিল। রাজমালাতে উল্লেখ আছে যে ত্রিপুরার মাণিক্য বংশীয় রাজা বিজয়মাণিক্য (১৫৩২ —১৫৬৩ খ্রিঃ) ঊনকোটি তীর্থে এসেছিলেন শিবের আরাধনা করতে। বর্তমানে চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমীতে ঊনকোটির মেলার আয়োজন করা হয়।

ঊনকোটির ভাস্কর্যকে পণ্ডিতরা দুভাগে ভাগ করেছেন—পবর্তগাত্রে খোদিত মূর্তি ও পৃথক পৃথক প্রস্তর মূর্তি। পাহাড়ে খোদিত ত্রিনয়ন বিশিষ্ট একটি বৃহৎ শিবমূর্তি আছে। মূর্তিটির খোলা ঠোঁটে দাঁতের সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ করা যায়। বিরাট মাথা, বিরাট কানদুটিতে সাপের মতো অলংকার সজ্জা। এর অদূরেই পাহাড়ে খোদিত আছে এক অতিকায় শিব মুণ্ড। এই শিব মুণ্ড ঊনকোটীশ্বর কালভৈরব নামে পরিচিত। এই মুণ্ডের উচ্চতা প্রায় ত্রিশ ফুট। এই মূর্তির দুই কর্ণের মধ্যকার ব্যবধান চৌদ্দফুট। দুই নেত্রে অপূর্ব তীর্যক দৃষ্টি আর ললাটে ত্রিনয়ন। এই মুণ্ডের চর্তুদিকে অনেকগুলি নরমুণ্ড খোদিত ছিল। সেগুলি বর্তমানে স্থানচ্যুত হয়ে গেছে। শিব মুণ্ডের সুবৃহৎ মুকুটের দুদিকে দুটি পূর্ণযৌবনা নারী মূর্তি। অনেকের মতে এই দুটি মূর্তি হল গঙ্গা ও গৌরী। নিম্নে তিনটি বিশালাকায় বৃষ মূর্তি স্থানচ্যুত অবস্থায় শায়িত আছে। ওপরের দিকে পাহাড়ের গায়ে খোদিত আছে সুন্দর

একটি সিংহবাহিনী দুর্গামূর্তি। এ ছাড়াও পাহাড়ের গায়ে খোদিত আছে বিশাল আকৃতির গণেশের মূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি, হরগৌরী, নৃসিংহ, হনুমান ও আরো অনেক দেবদেবীর মূর্তি। এছাড়াও আরো একটি স্থানে আছে পূতনাবধের কাহিনী নিয়ে খোদাই করা মূর্তি ও রাম রাবণের যুদ্ধচিত্র। পাহাড়ে খোদাই মূর্তি ছাড়াও বিষ্ণু, গণেশ, রাবণ ও অন্যান্য বহু দেবদেবরীর পৃথক পৃথক প্রস্তরের মূর্তিও সেখানে পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলির কোনোটি ত্রিমুখ, কোনোটি চতুর্মুখ ও পঞ্চমুখ। এছাড়াও রয়েছে প্রস্তর নির্মিত যুগল পদচিহ্ন।

উনকোটিব মূর্তিগুলির সময়কাল ও শিল্পস্রষ্টার পবিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো পণ্ডিতেব মতে এগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতকে নির্মিত আবার একদলের মতে এগুলির সময়কাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক। মনে হয় একাদশ শতকের পূর্ব থেকেই এখানে শিল্পের সূচনা হয়েছিল যা পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। একদল পণ্ডিত মনে করেন স্থানীয় উপজাতীয় শিল্পীরাই এর স্রষ্টা। আবার একদল মনে করেন দেব বংশীয় রাজারা যারা এই অঞ্চল জুড়ে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বাজত্ব করেছেন তারাই এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। একদল লেখক মনে করেন ত্রিপুরার মাণিক্য বংশীয় রাজারা আসাম থেকে ত্রিপুরায আগমনেব সময় কিছুদিন ধর্মনগর-কৈলাসহরে বাডপাট স্থাপন করেছিলেন। সেই সময় তাঁরাই এই শিল্পেব পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বেশ কিছু মূর্তিতে উপজাতীয় শিল্পের ছাপ দেখে মনে হয় এই শিল্পের উপজাতীয় শিল্পীদের একটা ভূমিকা ছিল। বস্তুত উপজাতি-অনুপজাতির সমন্বয়ে এই অপূর্ব শিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। উনকোটি পাহাড়ের শিল্পে শিবের প্রাধান্য থাকলেও অন্যান্য মূর্তিগুলি দেখে মনে হয় এখানে শক্তি, তান্ত্রিক, বজ্রযোগিনী, নাথযোগী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রভাবও এই শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল।

দেবতামুড়ার ভাস্কর্য

উদয়পুর ও অমরপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে গোমতী নদীর তীরস্থ বড়মুড়া পাহাড়ের অংশকে দেবতামুড়া নামে অভিহিত করা হয়। এই অঞ্চলে পর্বতগাত্রে বহু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে। এইস্থানে খোদিত আছে দেবী মহিষাসুরমর্দিনী, নন্দীবাহন শিব, নটরাজ, কার্তিক, গণেশ, একটি রাজকীয় শোভাযাত্রা। মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটি প্রায় পঁয়তাল্লিশ ফুট দীর্ঘ। নির্মাণ শৈলী থেকে মনে হয় এগুলি ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী নয়। এই সব মূর্তির পোশাক, গহনা, আকৃতি ইত্যাদিতে ত্রিপুরার উপজাতীয় জনজীবনের প্রভাব সুস্পষ্ট।

পিলাকের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত পিলাক অঞ্চলে বহু প্রাচীন মূর্তি ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। বেশ কিছু সংখ্যক বুদ্ধ মূর্তি, হিন্দুদেবদেবীর

মূর্তি ও টেরাকোটা শিল্পের বহু নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানকার মূর্তিগুলির মধ্যে বিশালাকায় অবলোকিতেশ্বর মূর্তি, বোধিসত্ত্ব মূর্তি ও বুদ্ধমূর্তিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবলোকিতেশ্বর মূর্তির সময়কাল খ্রিস্টীয় নবম শতক বলে অনুমান করা হয়। এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে মনে হয় যে অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে এই অঞ্চল মহাযান বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত কয়েকটি হরিকেল নামাঙ্কিত মুদ্রা থেকে মনে হয় এই অঞ্চল বৌদ্ধ হরিকেল রাজবংশের অধীনে ছিল। পার্শ্ববর্তী কুমিল্লার ময়নামতী অঞ্চলের বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে। বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও এখানে নরসিংহ, মহিষাসুরমর্দিনী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে। পিলাকে প্রাপ্ত দেবদেবীর মূর্তিগুলির মধ্যে সূর্যমূর্তির সংখ্যাও কম নয়। আবিষ্কৃত পাঁচটি সূর্যমূর্তির সময়কাল দশম শতাব্দী বলে অনুমান করা হয়। পিলাকে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিগুলির মধ্যে দুটি বিশালাকৃতি সূর্যমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের একটি প্রোথিত রয়েছে ঠাকুরানি টিলা নামে একটি টিলার ওপর। সূর্যের এই প্রস্তর মূর্তিটি উচ্চতায় সাড়ে দশ ফিটের ওপর। সূর্যদেব দুই হস্তে পদ্ম নিয়ে দণ্ডায়মান। অবশ্য এঁর দেহের কিছুটা অংশ মাটির নীচে প্রোথিত আছে। ঠিক এই ধবনের আর একটি সূর্যমূর্তি ঠাকুরানি টিলার কাছাকাছি আর-একটি টিলাতে জানু পর্যন্ত প্রোথিত আছে। বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও এই সব হিন্দুদেবদেবী ও সূর্যমূর্তির অস্তিত্ব থেকে মনে হয় যে এই সব অঞ্চল একসময় হিন্দু রাজবংশেরও অধীন ছিল। অবশ্য একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাংলায় পাল রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁদের আমলেও বাংলায় বহু হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং বৌদ্ধ রাজবংশের অধীনেও পিলাক অঞ্চলে হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ অসম্ভব ছিল না। টেরাকোটার ফলক ছাড়াও পোড়ামাটির তৈরি কারুকার্যমণ্ডিত ইট ও ভগ্নপ্রাপ্ত দেওয়ালগুলি প্রমাণ করে যে এই অঞ্চলে একসময় এক সমৃদ্ধ জনবহুল নগরীর অস্তিত্ব ছিল।

দশম অধ্যায়

অন্যান্য বিষয়

ত্রিপুরাব্দ

মাণিক্য বংশীয় রাজাদের নিজস্ব একটা অব্দ ছিল, যা ত্রিপুরাব্দ নামে পরিচিত। খ্রিস্টাব্দ ত্রিপুরাব্দের ৫৯০ বর্ষ পূর্ববর্তী। অর্থাৎ বর্তমান ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ত্রিপুরাব্দ হবে (১৯৯৭-৫৯০) ১৪০৭ ত্রিপুরাব্দ।

খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে এই সনের পার্থক্য ৫৯০ বৎসর হওয়ায় প্রচলিত ধারণা ৫৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্রিপুরাব্দ গণনা শুরু হয়েছে। প্রবাদ অনুসারে বীররাজ নামে জনৈক ত্রিপুরা নরপতির বিজয় বাহিনী গঙ্গানদী অতিক্রম করেছিল। তাঁর এই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি এই অব্দের প্রচলন করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সেনের শ্রীরাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ত্রিপুর বংশীয় রাজা জুঝারুফা যিনি রাঙামাটি বা বর্তমান উদয়পুর জয় করেছিলেন তিনিই ত্রিপুরাব্দের প্রবর্তক। কিন্তু রাজমালা ছাড়া বীররাজ বা জুঝারুফার অস্তিত্বের অন্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এঁদের অস্তিত্ব আদৌ ছিল কি না সন্দেহজনক। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মন্তব্য করেছেন যে প্রাচীন সনদ বা খোদিত কোনো লিপিতে এর উল্লেখ নেই। তাঁর মতে ত্রিপুরাব্দ সম্ভবত মুসলিম সন হিজরি থেকে উদ্ধৃত এবং এর কিছুটা পরিবর্তিত রূপ।

ত্রিপুরাব্দের আদি প্রবর্তক এবং সূচনাকাল সম্পর্কে ডঃ ডি সি সরকার মন্তব্য করেছেন যে ত্রিপুরা অব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে কতগুলি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। ত্রিপুরাব্দ বাংলা সালের তিনবছর পূর্ববর্তী। বাংলা সাল, যা হল ফজলি অব্দের রূপান্তর, মুসলিম হিজরী সালের তিনবছর পূর্ববর্তী। মনে হয় বাংলার মুসলিম শাসকদের প্রতি আনুগত্যের পরিপ্রেক্ষিতে নক্ষত্র রায় অথবা ছত্রমাণিক্যের (১৬৬১-৬৭ খ্রিঃ) রাজত্বকালে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন হয়েছিল। সেই সময় ছিল ১০৭৪ হিজরি বর্ষ অথবা ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে।

সতীদাহ প্রথা

ভারতের মতো ত্রিপুরা রাজ্যেও সতীদাহ প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। রাজমালায় এই প্রথার উল্লেখ আছে। তবে রাজমালা প্রধানত ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্ত।

তাই রাজপরিবারের মধ্যে সতীদাহের কাহিনীই প্রধানত উল্লেখ করা হয়েছে। পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে এই প্রথা কতটা প্রচলিত ছিল তা জানা যায় না। সম্ভবত হিন্দু প্রভাবিত হবার পরই উপজাতিদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত হয়। রাজমালা থেকে জানা যায় ধন্যমাণিক্যের মৃত্যু হলে তাঁর পত্নী কমলাদেবী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে যোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেও ত্রিপুরায় সতীদাহ প্রথা বর্তমান ছিল। ত্রিপুরার রাজপবিবারে সতীদাহের উল্লেখ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে অহোম রাজদূত রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাসের বিববণীতেও পাওয়া যায়। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতে সতীদাহ প্রথা বেআইনি বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু ত্রিপুরায় এই প্রথা আরও দীর্ঘকাল চালু থাকে। বীরচন্দ্রমাণিক্যেব রাজত্বকালে এই প্রথা পার্বত্য উপজাতি এবং বিশেষ করে জমাতিয়াদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা ত্রিপুরার সরকারি কর্মচারীদের চিঠিপত্তর থেকেই জানা যায়। তবে এগুলি সরকার যতটা সম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করতেন।

১৮৭১ সালে ত্রিপুরায় পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হবার পর বাংলার ইংরেজ সরকার মানবতার খাতিরে এই প্রথা ত্রিপুরায় যাতে নিষিদ্ধ হয় তার জন্য সচেষ্ট হন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের নির্দেশ অনুসারে চট্টগ্রামের কমিশনার মিঃ ডি. আর. লায়াল ত্রিপুরার এসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট উমাকান্ত দাসকে এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বললে উমাকান্ত দাস মহাশয় এ ব্যাপাবে ত্রিপুরার বাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইতিপূর্বে মহারাজার তরফ থেকে জানানো হয়েছিল যে এই প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উমাকান্তবাবু ত্রিপুরায' এক সফরের সময় কয়েকটি সতীদাহ ঘটনাব বিবরণ দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি ত্রিপুরা সরকারকে সতীদাহ প্রথা যাতে যথার্থভাবে নিষিদ্ধ হয় তার জন্য নির্দেশ দেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট ত্রিপুরার বাজদরবার থেকে এক পত্রে কমিশনারকে জানান হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে সতীদাহ একটি পুবানো ও ধর্মীয় প্রথা। ত্রিপুরারাজ্যের অধিবাসীরা সতীদাহের জন্য কোনো প্রকার বল প্রয়োগ করে না। এই অনুষ্ঠানে সতীদাহের পূর্ণ সমর্থন আছে। কাজেই সতীদাহ বন্ধ করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো আদেশ জারির প্রয়োজন নেই। কিন্তু কমিশনার ডি আর লায়াল রাজদরবারের এই যুক্তি মানতে রাজি ছিলেন না। উমাকান্ত দাসের মাধ্যমে রাজা বীরচন্দ্রকে জানানো হয় যে যদি সতীদাহ প্রথা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ না করা হয় তাহলে এর পরিণতি রাজার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হতে পারে। শেষ পর্যন্ত রাজা বীরচন্দ্র ১৮৮৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে সতীদাহ নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হন।

প্রচলিত ধারণা ও রাজমালা অনুসারে রত্নমাণিক্য থেকে কল্যাণমাণিক্য পর্যন্ত রাজাদের বংশ তালিকা

রত্নমাণিক্য
- প্রতাপমাণিক্য
- মুকুটমাণিক্য
  - মহামাণিক্য
    - ধর্মমাণিক্য *
      - দ্বিতীয় প্রতাপমাণিক্য
      - ধন্যমাণিক্য
        - ধ্বজমাণিক্য
          - ইন্দ্রমাণিক্য
          - উদয়মাণিক্য
            - জয়মাণিক্য
          - বিজয়মাণিক্য
            - অনন্তমাণিক্য
        - দেবমাণিক্য
          - অমরমাণিক্য
            - রাজধরমাণিক্য
              - যশোধরমাণিক্য (ঈশ্বরমাণিক্য ?)
    - কছুফা
      - কল্যাণমাণিক্য

* আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে ধর্মমাণিক্য রত্নমাণিক্যের পূর্বে রাজত্ব করেছেন।

মহামাণিক্য
- ধর্মমাণিক্য
  - রত্নমাণিক্য
    - প্রথম প্রতাপমাণিক্য (প্রথম বিজয়মাণিক্য ?)
      - দ্বিতীয় প্রতাপমাণিক্য
      - ধন্যমাণিক্য
    - মুকুটমাণিক্য

বংশ তালিকা

কল্যাণমাণিক্য থেকে কিবীটবিক্রমমাণিক্য :

- কল্যাণমাণিক্য
  - গোবিন্দমাণিক্য
    - রামদেবমাণিক্য
      - দ্বিতীয় বত্নমাণিক্য
      - মহেন্দ্রমাণিক্য
      - দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য
        - গদাধর
          - লক্ষ্মণমাণিক্য
            - দুর্গাঠাকুর (মাণিক্য)
      - মুকুন্দমাণিক্য
        - ইন্দ্রমাণিক্য
        - কৃষ্ণমাণিক্য
        - হরিমণিঠাকুর
          - দ্বিতীয় বাজধরমাণিক্য
            - রামগঙ্গামাণিক্য
              - কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য
                - ঈশানচন্দ্রমাণিক্য
                - বীবচন্দ্রমাণিক্য
                  - রাধাকিশোবমাণিক্য
                    - বীরবিক্রমমাণিক্য
                      - কিরীটবিক্রমমাণিক্য
            - কাশীচন্দ্রমাণিক্য
    - দুর্গাঠাকুব
      - নবেন্দ্রমাণিক্য
  - ছত্রমাণিক্য
  - জগন্নাথ ঠাকুর
    - চম্পক রায়
    - সূর্যপ্রতাপ
      - হারাধন
        - জযমাণিক্য
        - বিজয়মাণিক্য

গ্রন্থসূচী

ইংরাজি পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা :

Aitchison C. U. : A Collection of Treaties, Engagements and Sands, Vol. I, II ;

Basak R. G. : History of North Eastern India, 1967 ;

Bhattacharji A. C. : Progressive Tripura, 1930 ;

Buckland C. E. : Bengal under the Lieutenant Governors, Vol I, 1901 ;

Captain Lewin : The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein, 1869 ;

Chatterji Suniti Kumar : Kirata-jana-kriti, 1974 ;

Cumming J. G. : Survey and Settlement of the Chakla Roshnabad Estate in the District of Tippera and Noakhali, 1907 ;

Das Durga · Sardar Patel's Correspondence. Vol. 5 and 8, 1973 ;

Gait Edward : A History of Assam, 1967 ;

Ganguly J. B. : Economic Problems of the Jhumias of Tripura, 1968 ;

Gupta Kamala Kanta : Copper Plate of Sylhet, Vol. 1, 1967 ;

Hunter W. W. : A Satistical Account of Bengal. (Reprinted) Vol. VI, 1973 ;

Jhon Philip : Tavernier's Travel in India, 1905 ;

Khan Abdul Majed : The Transition of Bengal (1756-1775), 1969 ;

Mackenzie Alexander . Memorandum of the North-Eastern Frontier of Bengal, 1869 ;

: History of the Relation of the Government with the Hill Tribes of the North East Frontier of Bengal, 1884 ;

Majumder R. C. : History of Ancient Bengal, 1971 ;

: History of Freedom Movement in India, Vol. II, 1975 ;

Roychoudhury Nalini Ranjan	: Tripura Through the Ages, 1983 ;
Sen Tripur Chandra	: Tripura in Transition, 1970 ;
Stewart C.	: History of Bengal, 1813 ;
Sarkar Jadunath	: The History of Bengal (Muslim Period), Reprinted 1977 ;
Sircar D. C.	: Epigraphic Discoveries in East-Pakistan, 1973 ;
	Early Indian Numismatic and Epigraphic Studies, 1977 ;
	Some Epigraphical Records of the Medieval Period From Eastern India, 1979
The works of Nabin Chandra Sen	: Bangiya Sahitya Parishad, 1959 ;
Rev. James Long	: Analysis of Rajmala, Journal of the Asiatic Society, Vol. XIX, 1850 ;
	Journal of the Asiatic Society, Old Series, Vol.XLI, 1872, Part I

Journal of the Asiatic Society, Letters, Vol. XVII, 1951, No. 2 ;

The Bengalee	: September 3, 1905 ;
The Indian Nation	: 31st July, 1899 ;
The Englishman	: 12th March, 1918 ;

Bengal Past and Present, Vol. LXIX, Serial No. 132 ;

Bengal Past and Present, October, 1907.

Gazetters, Proceedings, Reports etc. :

Imperial Gazetteer of India, Vol. XIII, 1908 ;
Tripura State Gazette Sankalan, 1971 ;
Tripura State Gazette, 1330 T.E. Vol XIX, No. 12 ;
Tripura District Gazetters, 1975 ;
Census of India 1961–Demographic and Socio-Economic Profiles of the Hill Areas of North East India, 1970

গ্রন্থসূচী

Bengal Judicial Proceedings :
A. September, 1850
A. March, 1861
June, 1863, Political
August, 1863, Political
October, 1864
December, 1864
October, 1878, Political

Bengal Administrative Report : 1881-82
1888-89
1914-15

Annual Report, 1921-22 (1924) : Archaeological Survey of India
Inspection Note of Director General of Archaeology, 1952 :
Published by Education Department, Govt. of Tripura ;
Minister's Confidential letter No. 566/1-16 to the Political Agent, Agartala, dated 11th June, 1921 (Unpublished)
Letter No. 877-P/VII-II of the Political Agent, Tripura, to the Minister of Tripura, dated 11th June, 1921 (Unpublished)
Order on the Confidential Report of the Superintendent of Police, Tripura, No. 680/1-16 dated 20th June, 1921 (Unpublished)
Letter from Pandit Jawaharlal Nehru dated 9th December 1945 ;
File no. 1945 B 52/S.9A. 3 Administrative Department (Unpublished)

অনুবাদপত্রটি ১৯৭২ সালের ১৫ই আগস্ট 'দৈনিক-সংবাদ' পত্রিকার স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে।

বাংলা পুস্তক ও নথি পত্রিকা

আবুল ফজল	:	আইন-ই-আকবরি, দ্বিতীয় লহর, অনুবাদক— Jarret and Sarkar, 1942
ঊনকোটি	:	শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, ১৯৭২
চৌধুরী জয়ন্তনাথ	:	আবৃত ইতিহাস ঊনকোটি, ১৯৬৯
দত্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র	:	উদয়পুর বিবরণ, ১৯৩০
দত্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র	:	ত্রিপুরার স্মৃতি, ১৯২৭
দেববর্মা সমরেন্দ্র	:	ত্রিপুরার স্মৃতি, ১৯২৭
দেববর্মা সৌমেন্দ্রচন্দ্র	:	ত্রিপুরা সেন্সাস বিবরণ, ১৯৩১
দেব রামনারায়ণ	:	রাজমালা, ত্রিপুরা সরকার, শিক্ষা অধিকার, ১৯৬৭
বিদ্যাবিনোদ চন্দ্রোদয়	:	শিলালিপি সংগ্রহ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৭
ব্যানার্জি সুপ্রসন্ন	:	ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, ১৯৫৪
ভুঁইয়া সূর্যকুমার	:	ত্রিপুরা বুরঞ্জি, ১৯৬২
মজুমদার রমেশচন্দ্র	:	বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় লহর, ১৯৭৩
মির্জা নাথন	:	বহরোস্তান-ই-ঘায়েবি, অনুবাদক : এম. এল. বরা, দ্বিতীয় লহর, ১৯৩৬
মুখোপাধ্যায় সুখময়	:	বাংলা ইতিহাসের দু'শ বছর, ১৯৬৬
রামগঙ্গা বিশারদ	:	কৃষ্ণমালা (পাণ্ডুলিপি)
রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা	:	শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, ১৯৭৬

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা : ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী কমিটি ১৩৬৮ বাং

শেখ মনোহর : গাজীনামা (পাণ্ডুলিপি)

শেখ মহাদ্দি : চম্পক বিজয় (পাণ্ডুলিপি)

সেন দীনেশচন্দ্র : বৃহৎবঙ্গ, ১৯৩৫

সেন কালীপ্রসন্ন : শ্রীরাজমালা, প্রথম লহর (১৯২৬), দ্বিতীয় লহর (১৯২৭) তৃতীয় লহর (১৯৩১), চতুর্থ লহর (অসমাপ্ত)

সেনগুপ্ত কালীপ্রসন্ন : পঞ্চমাণিক্য, ১৯৪১, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৬

সিংহ কৈলাসচন্দ্র : রাজমালা, ১৮৯৬, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৪

সিংহ অনন্ত · অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম, ১৯৬৮

মিত্র রাজ্যেশ্বর : অর্ধশতাব্দী পূর্বের আগরতলা, গোমতী, ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৪

বসাক হরিগঙ্গা : ত্রিপুরা রাজ্যে প্রজা আন্দোলনেব গোড়ার কথা, সমাজ, ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৬

বসু সতারঞ্জন : দেশাত্মবোধ ও মহারাজ রাধাকিশোর, সমাজ, ২৪শে আগস্ট, ১৯৫৭

দেববর্মা সুধন্বা : ত্রিপুরা সংঘ গঠনের ইতিবৃত্ত
জ্বালা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৪

দেব দশরথ : গণমুক্তি পরিষদের জন্মকথা,
জ্বালা, জুলাই-আগস্ট, ১৯৭৪

দেববর্মা মণিময় : ত্রিপুরার প্রজা আন্দোলন—কিছু তথ্য,
দৈনিক সংবাদ, ২৬শে মার্চ, ১৯৭৮

দত্ত বীরেন : ত্রিপুরার জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ ও নির্বাচনোত্তর ত্রিপুরা,
ত্রিপুরার কথা, শারদীয় [illegible], আশ্বিন, ১৩৫৯ বাং

দত্ত রবি : ত্রিপুরার প্রজা আন্দোলন : কিছু তথ্য (মতামত)
দৈনিক সংবাদ, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮,

দাশগুপ্ত তড়িৎমোহন : স্বাধীনতার আন্দোলন ও ত্রিপুরা, উদিতি,
কার্তিক-চৈত্র, ১৩৭৯ বাং,

গোমতী : ৪৭তম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য স্মারক সংকলন,
২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪

ত্রিপ্রা : প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ২৪শে অক্টোবর, ১৯৭২ এবং দ্বিতীয়
সংখ্যা ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭২

প্রবাসী : ফাল্গুন, ১৩৪৩ বাং

আনন্দবাজার পত্রিকা : ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৪,
২০শে আগস্ট, ১৯০৪

ড. নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরী ১৯৬৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে বীরবিক্রম সান্ধ্য কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৯৭১-এ তাঁর ''A Short History of Tripura'' বইটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৭ সালে আগরতলার Bureau of Research and Publication থেকে 'Tripura Through the Ages' নামক বইটি প্রকাশিত হলে ত্রিপুরার ইতিহাসের উৎসাহী পাঠক মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। ১৯৮১ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Tribal Uprising in Tripura in the Second Half of the 19th Century' এই বিষয়ের ওপর গবেষণা করে Ph D লাভ করেন। ১৯৮৩-তে 'Tripura Through the Ages' বইটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে নতুন দিল্লির স্টারলিং পাবলিশার থেকে প্রকাশিত হয়। ড রায়চৌধুরী NEHA (North East History Association)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিরও সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তাঁর ইতিহাস বিষয়ক নানা গবেষণামূলক রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।